# এখনই

রমাপদ চৌধুরী

ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৭৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ৭ই মাঘ ১৩৭৬
তৃতীয় সংস্করণ ১০ই মাঘ ১৩৭৭

প্রকাশক
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীর মৈত্র

আজকের জীবনে ছোট ছোট সুখ আছে, আনন্দ নেই। দুঃখ আছে, গভীর বিষাদ নেই। আজকের জীবন ট্র্যাজেডিও না, কমেডিও না। মিলন এবং বিচ্ছেদের এই সম্মিলিত সুর আসলে এক ধরনের অ্যাডজাস্টমেণ্ট। সুখের লোভে হারানোর ভয়ে শুধুই মানিয়ে চলা, মেনে নেওয়া। সেটাই বোধহয় এ-যুগের আসল ট্র্যাজেডি।

এই লেখকের

প্রথম প্রহর, লালবাঈ, এই পৃথিবী পান্থনিবাস

বনপলাশির পদাবলী, পিকনিক

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ, জনৈক নায়কের জন্মান্তর

গল্প-সমগ্র

যুবকদিনের স্বপ্ন আশা আদর্শকে

'আরে দূর্ দূর্, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে না। প্রাণিজগতে সবাই কথা বলতে পারে, যে যেটুকু বোঝে, যেটুকু বোঝাতে চায়। একটা কাক ডাকলে সব ক'টা কাক জলের মত বুঝতে পারে কি বলছে। মাঠের মধ্যে একবার মাইরি একটা গরুকে দেখেছিলাম, গলা উঁচিয়ে হাম্বা করলো, দূর থেকে বাছুরটা সাড়া দিলো, ছুটো ডাকই, বিশ্বাস কর, ভালবাসার মত মিষ্টি। আর মা যখন আমাকে 'অরুণ' বলে ডাকে, স্নেহ না ঘৃণা বুঝতেই পারি না।'

টিকলু হেসে উঠলো। বললে, মারা পড়বি তুই। দিনরাত সারা গায়ে শুধু কাঁটাতারের বেড়া জড়াচ্ছিস। কি দরকার বাবা, ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিস কেন, আমার মত পাঁকাল মাছটি হয়ে সুড়ুৎ করে সরে পড়লেই পারিস।

অরুণ গুম্ হয়ে রইলো, জবাব দিলো না। সারা পৃথিবীর ওপরই ঘেন্না হয়ে গেছে ওর। সকলের ওপর, নিজের ওপরও।

মনের দুঃখ টিকলুকে বলতে গেল, সেও বুঝলো না। নাঃ, জন্তুজানোয়ার সবাই কথা বলতে পারে, একা মানুষই শুধু কথা বলতে পারে না।

সুজিত নিজের হাত নিজেই দেখছিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, জীবজন্তুদের অনুভূতি কম, চাহিদা শুধু ছুটি, সে আর অন্যকে বোঝাতে পারবে না কেন!

অরুণ বিরক্তির সঙ্গে বললে, সে-কথাই তো বলছি। মানুষের হাজারো ফ্যাঁকড়া, সেসব অন্যকে বলতেও চায়, অথচ বলতে পারে না। মানুষ শুধু নিজের সঙ্গেই কথা বলতে পারে, নিজের সঙ্গেই শুধু কথা বলা যায়।

তা নয়তো কি। দিনরাত সবাই কথা বলছে। আমি নিজেও তো বলছি, অরুণ ভাবলো। কিন্তু যা বলতে চাই তা তো বলি না, বলতে পারি না। যখন বলি, কেউ বুঝতে পারে না। তা হলে? কথা তো তাহলে কতকগুলো অর্থহীন শব্দ, কতকগুলো আওয়াজ শুধু, আর কিচ্ছু নয়, কিচ্ছু না। কেউ কোন কথা বলতে পারে না, কেউ কোন কথা বুঝতে পারে না।

—আমার কি মনে হয় জানিস? আমরা বনের গাছপালার মত, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। চুপচাপ। গাছ ভিড় করে থাকলে বন, মানুষ ভিড় করে থাকলে সমাজ।

—কিন্তু মেয়েরা ভিড় করে থাকলে বিউটি প্যারেড। নিজের কথায় নিজেই হাসলো টিকলু।

অরুণ তিক্ত অধৈর্যে বললে, একটা সিরিয়াস কথা বলছি···

টিকলু বললে, তবে? তবে যে বলছিস মানুষ কথা বলতে পারে না? পারে না যদি তো দিব্যি ভ্যাজভ্যাজ করছিস কি করে!

অরুণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, ঠিকই বলেছিস। প্রত্যেকটি লোক শুধু ভ্যাজভ্যাজ করে।

সুজিত এবার ওর হাতের ফেট-লাইন থেকে চোখ তুললো। বললে, অরুণ, তুই ফিলজফি নিলে পারতিস। মনে হচ্ছে দার্শোনিক হয়ে যাবি।

—হাসিস না সুজিত। তিক্তবিরক্ত অরুণ বলে উঠলো, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? মনে হচ্ছে সারা গায়ে যেন ড্যাবা ড্যাবা আমবাত বেরিয়েছে, সারা গা চুলকোচ্ছে, কুটকুট করছে। ইচ্ছে হয় কষে এক লাথি বসিয়ে দিই পৃথিবীটাকে।

টিকলু গা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসলো। অরুণকে যখনই ও চিড়বিড় করে উঠতে দেখে তখনই এমনি ভাবে হাসে। হাসতে হাসতেই বললে, ও তুই যত কষেই পেনালটি কিক্ দে, গোলকি একজন কেউ আছেই, ঠিক লুফে নেবে। তারচে তুই বরং এক মুঠো

নিমপাতা ঘিয়ে ভেজে গপ্ করে খেয়ে নে, আমবাত ভাল হয়ে যাবে।

অরুণ চটলো না। ঘাসের ওপর পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে হাত দু'খানা পিছনে রেখে আয়েশে ডেকচেয়ার হয়ে গেল। খালি হয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের বাক্সটা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে টেনে কাছে আনলো, তারপর বাক্সর লেবেলটা তুলে ফেলার চেষ্টা করতে করতে বললে, সারা পৃথিবীর লীভার খারাপ, আমি একা নিমপাতা চিবিয়ে কি করবো!

টিকলু একটা নকল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললে, রুণু সত্যিই তোকে একেবারে···

—ধুত্তোর রুণু। বাড়ি। বাড়ি। আমার মাইরি···( অরুণের গলার স্বর কেমন কান্নার মত ভেঙে পড়লো )···সত্যি বলছি টিকলু, বাড়ি থেকে আমার পালাতে ইচ্ছে করে।

টিকলু হেসে উঠলো।—আমার ট্রাব্‌ল্ অন্য, বাড়িতে ঢুকতেই দিতে চায় না।

সুজিত হাসলো না, অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সন্ন্যাসী হবি নাকি? তোর তো বাবা শনি চন্দ্র এক ঘরে নেই, উঁহু ওসব সুবিধে হবে না।

অরুণ ফেটে পড়লো।—তুই জানিস না সুজিত, আমি সত্যিই এক একসময়···মা আর বাবা···একজন শনি, আরেকজন রাহু···আর দিদিটা? জলহস্তী, রিয়েল জলহস্তী।

বলে দু'চোখ বুজে বুকের ভিতরকার অসহ্য যন্ত্রণাটা চেপে রাখার চেষ্টা করলো। পারলো না। সমস্ত ঘটনা, আনুপূর্বিক সমস্ত দৃশ্য আবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো নিজেকে নিজে কষে কয়েক ঘা বেত মারে। সপাং সপাং সপাং। উফ্, তা হলে বোধহয় একটু শান্তি পেত।

অরুণের মনের মধ্যে একটা চাপা অভিমান, ওকে বাড়ির কেউ

বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না। ও যেন কেউ নয়, ওর যেন মন বলে কিছু থাকতে নেই। মাঝে মাঝে অভিমানটা তাই রাগ হয়ে যায়।

সুখ বলো বিলাস বলো,—একটাই আছে—ঘুম, তাও মৌজসে ভোগ করতে দেবে না। রোজ সকালে একটা না একটা ফিরিস্তি।

—ভোরসকালে হাওয়াঘুমটা দিলে মাইরি মাটি করে! কি, না হৃষিকেশবাবু চলে যাচ্ছেন, পেন্নাম করে আয়। এইসব পেন্নাম-টেন্নামের ভণ্ডামি কবে যাবে বল তো দেশ থেকে!

ভিতরের ক্ষোভ কার কাছে আর প্রকাশ করবে, টিকলু আর সুজিত ছাড়া? তাই সেদিন এসে বলেছিল ওদের।

হৃষিকেশবাবু চলে যাচ্ছেন। কৃতার্থ করেছেন। তোমাদের গুরুদেব টাইপের লোক, তোমরা যত্নআত্তি করো, লুচি ভেজে খাওয়াও, আমাকে ঘুম থেকে তুলে পেন্নাম না ঠোকালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত!

টিকলুর কাছে সবই ঠাট্টা। হেসে বলেছিল, সে তো বাওয়া চুকে গেছে সকালেই। বলেছিল, আঁচ তো নিভে গেছে, তবু এখনো উথলোচ্ছিস কেন!

কাকে বোঝাবে অরুণ। কেউ বোঝে? এই আজকের ব্যাপারটা···

খামচে মাটি থেকে পর্পর করে একমুঠো দুব্বোঘাস ছিঁড়লো অরুণ, মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলো। আর মনে মনে ভাবলে, কতলোক তো দিব্যি মনের মত যা পায়, আমার বেলাই···

—মনের মত কিছুই পেলাম না মাইরি।

সুজিত হেসে বললে, ওসব অন্যদের জন্যে। চতুর্থে ভাল গ্রহট্রহ থাকে তাদের, চতুর্থপতি স্ট্রং হয়···

টিকলু হাসলো না। বললে, তোর মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে। আসল কথাটা কি তাই বল না।

অরুণ বিরক্তিতে ঘেন্নায় মুখখানা বিতিকিচ্ছিরি করলে! —কোনটা বলবো?

—কেন, হৃষিকেশটা তো সেদিন বললি, বিদেয় হয়েছে। টিকলু হাসলো।

অরুণ নিজেই এবার বলতে গিয়ে হেসে ফেললো—আজ আবার দরজায় ধাক্কা, ঘুম ভাঙিয়ে বাজারের থলিটা হাতে ধরিয়ে দিলে: সোনার মা কাজ করতে আসে নি, বাজারে যা।···ভ্যাখ টিকলু, সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে তেতো হয়ে গেছে। আর নয়তো আমি নিজেই তেতো হয়ে গেছি। স্পষ্ট বাংলায় কথা বলছি, তুইও বুঝতে পারছিস না!

—কেন বাবা, তুই তো বলিস, প্রত্যেকটা মানুষ নাকি এক এক ভাষায় কথা বলে, কেউ কারো ভাষা বোঝে না।

—উঁহুঁ, তাও মনে হচ্ছে ঠিক নয়। আমরা আদপে কথা বলতেই পারি না। অরুণ ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবার চেষ্টা করে বললে।

—মানে আমরা সব গাছ হয়ে গেছি? টিকলু রসিকতা করলো।

অরুণ চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর হুম্ করে বলে ফেললো, তাতেও কি শান্তি আছে? 'আমি সরে থাকবো, আমি আলাদা থাকবো, আমাকে বিরক্ত ক'রো না'—এসব ভাবলেই হলো নাকি। সেখানেও দেখবি আশপাশের গাছগুলো তলায় তলায় শিকড় চালিয়ে দেবে, শিকড়ে শিকড়ে ঠোকাঠুকি, জড়াজড়ি, এ ওরটা ছিনিয়ে নিতে চাইবে···

নাঃ, পালানো যায় না। পালাবার জায়গা নেই। প্রত্যেকটা মানুষ এক একটা অদ্ভুত ল্যাংগুয়েজে কথা বলে, হ্যাঁ তাই, কেউ কারো ভাষা বোঝে না, তবু কথা বলতে হবে, কথা বলে যাও। দিনরাত শুধু জিভের এক্সারসাইজ করো। ধুত্তোর।

আসুন, এইবার আমরা ঐ বাড়িটার কাছে যাই।

বাড়িটার সামনাসামনি রাস্তার এপারে একটা মহানিমের গাছ। দু'দিন আগেও পাতা ছিল না গাছটায়, গুঁড়িটা হাত পা ছড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। গাছ, কিন্তু ওটা যে নিমগাছ বোঝার উপায় ছিল না। এখন অনেক পাতা। ডগায় কচি কচি তামাটে শিখা হয়ে দুলছে। একটা ডাল ইলেকট্রিকের তার অবধি গিয়ে পড়েছিল বলে কেটে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম দিকের ঘরখানা ছোট, তক্তপোশটা আরো ছোট। তক্তপোশটার ধারে একটা জানালা আছে, ঘুম-ভাঙা ভোরের দিকে অরুণ চোখ বুজেও জানালার ওপাশে নিমগাছটার পাতা নড়া টের পায়। ঝিরঝির ঠাণ্ডা হাওয়া আসে।

কিন্তু নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পায় না। গত বছর বাড়িওয়ালা অরুণদের কিছু না জানিয়ে নীচের তলায় একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দিল। তার পর থেকে ঘরখানা চুনের আড়ৎ। বাড়ির সদর দরজার পাশটুকু নোংরা হয়ে থাকে। চুন ছড়িয়ে থাকে শালার রাস্তা অবধি। সভ্য-ভব্য একটা লোককে বাড়ি আনা যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, ব্যাটা সকাল থেকে মাল খালাস করে, টিন পেটানোর, লরী দাঁড়ানোর আওয়াজ আসে। ভোরবেলার আমেজে বেশ বালিশ আঁকড়ে মজাসে আরেকটু ঘুমোবে তার উপায় নেই।

ফুরফুরে চমৎকার হাওয়া আসছিল। এই ভোরের হাওয়াটা দিব্যি সাবানের ফেনার মত গায়ে মুখে মেখে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল অরুণের। কিন্তু তা হ'লে তো হাত বাড়িয়ে টেব্‌ল্ ফ্যানটা বন্ধ করে দিতে হয়। 'এর মধ্যে তোর যে কেন পাখা লাগে বুঝি না'। ধেৎ।

লাগে তো লাগে, তোদের কি। ইলেকট্রিক বিলের টাকা তো আর তুই দিস্ না।

ওদের তো সব কিছুতেই অভিযোগ, অরুণ যা কিছু করে। শুনে শুনে ও নিজেও ভোঁতা মেরে গেছে, চামড়ার ভিতর অবধি আর পৌঁছয় না। তবে ঘুম ভেঙে গেলেই মান্ধাতা আমলের জং-ধরা টেব্‌ল্ ফ্যানটার ঘচাং ঘচাং আওয়াজটা বড় কানে লাগে।

পাখাটা বন্ধ করার জন্যে শুয়ে শুয়েই হাত বাড়াবে কিনা ভাবছিল অরুণ, সাহস হলো না। বিশ্বাস নেই, হঠাৎ এক একদিন এমন শক্ মারে।

ইস্, মা এমন এক-একটা কথা বলে। টিকলুর সামনেই একদিন বলে বসলো, দেখিস শট্ মারবে।

শট্ মারবে। ভেংচে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল অরুণের।

বালিশটা আরেকটু ভাল করে আঁকড়ে ধরে আরেকটু আরাম করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু উপায় আছে নাকি।

দড়াম্ দড়াম্ করে ধাক্কা পড়লো দরজায়।—অরুণ, অরুণ।

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল অরুণ।

—সোনার মা আসে নি, ওঠ্, বাজারে যেতে হবে। পাছে আপত্তি শুনতে হয়, কথাটা বলেই মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আজকের দিনটাই খারাপ যাবে। চেঁচিয়ে উঠে 'পারবো না' বলতে গিয়েও অরুণ থেমে গেল। আজ মা'র কাছ থেকে গোটাকয়েক টাকা চাইতে হবে।

শুয়ে শুয়ে একটু রুণুর কথা ভাবতে চেয়েছিল। রুণুটা একটা ইডিয়েট। অরুণ কি দারুণ ভালবাসে ওকে, অথচ মেয়েটা কেন যে বোঝে না, ভুল বোঝে! 'তোমার তো স্মার্ট মেয়েদেরই পছন্দ'। স্মার্ট কথাটার মধ্যে ঊর্মির নামটা লুকিয়ে আছে, অরুণ জানে। মেয়েরা এক একটা ক্যালকুলাসের অঙ্ক, বোঝাই যায় না। আরে, প্রথম প্রথম একটা দিনও তো ভালবাসার কথা বলতে হয় নি, তখন

তো ঠিক বিশ্বাস করতে। এখন নিত্যদিন কি ভালবাসি ভালবাসি বলা যায় নাকি। বলতে গেলে অরুণ নিজেই হেসে ফেলবে।

আচ্ছা, উর্মির ওপর ওর এত জেলাসি কেন?

চোখেমুখে জল দেবার জন্যে কলের দিকে গেল অরুণ। কলটা খুলে দেখলে জল নেই। ধুৎ। কোনো সময়ে যদি পাম্পের জল থাকে। কলটা ফিরে বন্ধ করতে ইচ্ছেও হলো না। যখন পাম্প চলবে জল বেরিয়ে যাক্ না, আমি তো কখনো···আমার শালা সেই চৌবাচ্চা। এই তো একটু আগে কে মুখ ধুচ্ছিল, আমার বেলাই শেষ। তেলের শিশি নিয়ে স্নান করতে যাও, দেখবে দু'ফোঁটা শুধু তলানি পড়ে আছে। যে যার নিজেরটি পেলেই খুশী, কেন, শেষ হয়েছে দেখে আবার ঢেলে রাখতে পারো না!

চৌবাচ্চার জল নিয়ে চোখেমুখে দিয়ে দড়িটার দিকে তাকাতেই মা তোয়ালেটা এগিয়ে দিলো। ফ্ল্যাটারি আর কাকে বলে।

দিদি হাসি হাসি মুখে চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হলো।

তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে অরুণ বললে, ঘুষ দিচ্ছিস? বলে হাসলো।

দিদির মুখেও হাসি এসেছিল, কথাটা শুনেই ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেল। মুখের হাসিটা ঝট্ করে মুখ-ঝামটা হয়ে ফিরলো।—না, অন্যদিন কেউ চা দেয় না তোকে!

অরুণ চুরুপ্ করে একটা চুমুক দিলো কাপে, তারপর বললে, দেয়, আধঘণ্টা চেঁচামেচির পর।

—সকালে উঠলেই পারিস, প্রথমবার যখন হয়।

অরুণ কথা বাড়ালে না, মুখ তেতো করে কি হবে সকাল থেকে। রুণুর সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন আজ, অথচ মন খিঁচড়ে রইলো।

পাজামা বদলে প্যাণ্ট পরবে কিনা ভাবলো একবার। উফ্, এই প্যাণ্ট করানোর জন্যে কি রাগ বাবার।

—ছেলেকে দিয়ে বাজার করালে পচা মাছই খেতে হবে।

যতটা সম্ভব বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হতে চায় না অরুণ, তবু সেদিন পাকেচক্রে একসঙ্গে খেতে বসতে হয়েছিল। বাবা তো চিরকাল টাটকা খেয়ে এসেছে, দিনকাল যে বদলে গেছে সে খবর তো রাখে না, মাছ একটু মুখে দিয়েই বললে, খারাপ হয়ে গেছে। ব্যস্, মা অমনি ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, ছেলেকে দিয়ে বাজার করালে পচা মাছই খেতে হবে, কেনার সময় মাছে হাত ঠেকান নাকি বাবুরা, হাতে যে আঁশটে গন্ধ হবে।

সময় নষ্ট করে বাজার করে আনলো অরুণ, থলি হাতে করে বয়ে আনলো, তবু যদি সন্তুষ্ট হতো এরা। এইজন্যেই তো কিছু করতে ইচ্ছে হয় না।

মাছে হাত ঠেকান নাকি বাবুরা!

কথা হচ্ছে মাছের, বাবার রাগ গিয়ে পড়লো প্যাণ্টের ওপর। তাচ্ছিল্যের স্বরে, অরুণকে শোনাবার জন্যেই বললেন, মাছ দেখতে হলে নীচু হতে হবে না? চোঙা প্যাণ্ট পরে নীচু হবে কি করে!

দেশসুদ্ধ সবাই পরছে, আমার বেলাই যত রাগ। হৃষিকেশবাবুকে পেন্নাম করাতে তো ছাড়ো না। কি, না ঠাকুর্দার গুরুদেব বংশের লোক।

বাজারে যেতে অবশ্য আপত্তি নয় তার, কিন্তু একটা দিন বললে না, ঝিঙেগুলো বেশ কচি রে। আপত্তি আছে আরেকটা—ঐ নোংরা থলেটা। হাতে নিলেই কেমন কেরানী কেরানী লাগে। বুড়োদের মত। চেনাজানা কেউ দেখলে বুঝতে পারবে বাড়িতে চাকর নেই। বিশেষ করে মেয়েদের সামনে···হোক্ না অচেনা, থলে হাতে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেও অস্বস্তি লাগে। ঊর্মি কোনদিন যদি দেখে ফেলে, এমন হাসবে।

ফিরে এসেই হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো অরুণ, বাজারের থলেটা নামিয়ে দিয়েই 'চললাম আমি'। খুচরো পয়সাগুলো আর ফেরত দিলো না।

পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট চারমিনার কিনে একটা দড়িতে ধরালো। ক'টা মাত্র কাঠি আছে দেশলাইয়ের বাক্সে, খরচ করে দরকার নেই।

সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়ে কোজি ঢুকে এসে উঁকি দিলো।

টিকলু আর সুজিত এসে গেছে অনেক আগেই।

—বাজার যেতে হয়েছিল মাইরি।

—তা হ'লে তো আর্নিং হয়েছে, চা খাওয়া। সুজিত বললে।

টিকলু হাসলো।—আহা ও বেচারীকে কেন, সাঁটুলির জন্যে ওর তো এমনিতেই খরচ বেড়ে গেছে।

খরচ, খরচ, খরচ। ঐ এক কথা এদের মুখে। জেলাসি ছাড়া আর কি। যেন মেয়েরা মেয়ে নয়, প্রেম বলে কিছু নেই। ক'টা মেয়ে দেখেছিস তোরা? খরচ করলেই যদি ভালবাসা পাওয়া যেত, জোটা না একটা। কাউকে ভালবাসা যে কি কষ্ট তোরা কি বুঝবি? ভাবিস ও শুধু পাঁচ আঙুলের মামলা।

মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা না থাক, রুণুকে তো শ্রদ্ধা করতে পারিস। তা না, এমন ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলবে যেন রুণু ভাল মেয়ে নয়, যেন রুণু ওকে সত্যি ভালবাসে না। রুণু কোথায় দু'টাকা চল্লিশে ছবি দেখতে চায় না, এক একদিন জোর করে চায়ের পয়সা দেয়, অথচ এদের মুখে শুধু খরচ আর খরচ। 'সাঁটুলি'! শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

—কি রে, সত্যি খুব কস্ট্‌লি নাকি মেয়েটা? সুজিত বিশ্রি হাসলো।

নাঃ, রুণুর কথা কিচ্ছু বলবে না এদের।

অভিমানের জ্বালাটা লুকিয়ে তবু হাসতে হলো অরুণকে।—কখনো কখনো আমি না দিলে প্রেসটিজ থাকে? বল্‌ না।

—শালা বেকার থাকতে আর ভাল লাগছে না। টিকলু হুম্‌ করে বললে।

অরুণ হেসে বললে, একটু খোঁচা দিয়ে, তোদের তো খরচ করানোর মত কেউ নেই, তোদের আর ভাবনা কি।

সুজিতের মুখ দেখে বুঝলো খোঁচাটা ঠিক জায়গায় লেগেছে। আর অমনি অরুণের মনে হলো, দেখেছো, ওকে তো আমি থাপ্পড় মারতে চাই নি, শুধু নিজের জ্বালাটা ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলাম। কি যে আমরা বলতে চাই, আর কি বলে ফেলি।

এবার তাই ঘায়ের ওপর মলম লাগানোর মত করে হেসে উঠলো অরুণ। বললে, সত্যি, মা'কে তেল দিয়ে দিয়ে আর টাকা চাওয়া যায় না মাইরি। যদ্দিন না রেজাল্ট বেরোচ্ছে কি করা যায় বল্ তো? টুইশনি?

টিকলু হাসলো।—সে তো বাবা রুণুকেই লেস্‌ন দিচ্ছো।

সুজিত দিন কয়েক টুইশনি করেছিল। বললে, ও রাস্তায় বাবা আমি নেই আর, সারা সন্ধ্যেটাই মাটি। ছাত্র নিয়ে ও সময় ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল লাগে?

—কেন ছাত্রী?

সুজিত হেসে বললে, ছাত্রীর সঙ্গে বাপটাও যে ফ্রীতে পড়া শুনবে।

তিনজনই এবার শব্দ করে হেসে উঠলো।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। অরুণ হঠাৎ বললে, টয়েনবির বইটা পড়ালি না?

টয়েনবির বইটা কিনবো কিনবো করেও কিনতে পারে নি ও। বাবার কাছে চাইবে কি, বাবার কাছে যেতেই ইচ্ছে হয় না। আগে তবু রাত্রে একসঙ্গে খেতে বসতে হতো, এখন তো আড্ডা দিয়ে দেরী করে ফেরে। ঘরে ভাত ঢাকা দিয়ে মা শুয়ে পড়ে। বাড়ি নয়, যেন হোটেলখানা। শুকনো কড়কড়ে রুটিগুলো গিলতে হয়

একা একা। পর পর ক'দিন রাত করে বাড়ি ফিরেছে বলে কি চেঁচামেচি। 'তোর জন্যে সবাই রাত জেগে বসে থাকবে নাকি?' রেগে গিয়ে অরুণ বলেছিল, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেই পারো, সোনার মা দরজা খুলে দেবে! ব্যস, মা সেই যে গুম্ হয়ে গেল, সত্যি সত্যি তারপর থেকে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে। খেলো কি খেলো না, সকালে সে-খবরও নেয় কিনা সন্দেহ।

এক এক সময় অরুণের ভীষণ অভিমান হয়। আরে বাবা, ও যে মাকে এত ভালবাসে, সেবার মা'র হঠাৎ অসুখটা বাড়াবাড়ি হলো, ও যে ছুটতে ছুটতে ডাক্তারের বাড়ি গেল, মা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো দেখে ওর যে বুকের মধ্যে কেমন করছিল, লজ্জায় কাউকে বলতে পারে নি, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে যে কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে এলো, এ-সবের কি কোন দাম নেই? মা কি কিছু বুঝতে পারে না! তবে আর মা কিসের।

আর বাবাও তেমনি। একটা ভাল কথা বলবে না। কাছে পেলেই পড়াশোনা, চাকরি, কমপিটিটিভ পরীক্ষা, আর নয় তো, 'জানিস অরুণ, সে-সব দিনই ছিল অন্য, গান্ধীর ডাকে দলে দলে সব জেলে যাচ্ছে, ফ্যাশান-ট্যাশান সব বিসর্জন দিয়েছে দেশের লোক'···

ওসব অনেক শুনেছি, মাল তো ক্যাচ হয়ে গেল কুড়ি বছরেই। ইতিহাসের সব বড় বড় লোকগুলোও ফিকশন কিনা কে জানে। দলে দলে সব জেলে যাচ্ছে! কই, তুমি তো জেল খাটো নি। তুমি কি করেছিলে। মা যা ভীতু, ফিরতে দেরী হলে আগে যা কাণ্ড করতো, মা বোধ হয় বাবাকে ও লাইনেই যেতে দেয় নি।

টয়েনবির বইটা কিনবে বলে দু' একবার ভেবেছে বাবার কাছে টাকা চাইবে অরুণ। কিন্তু কি করে চাইবে। সংসার খরচের হিসেব নিয়ে তো দিনরাতই মা আর বাবার খিচখিচ লেগেই আছে। ওর নিজেরই এক একসময় মনে হয়, এমন অশান্তির সংসার আর নেই।

তবু মিলুর বেলায় বাবা একবারও না বলে না। যখন যা চাইছে দিব্যি পেয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাই মিলুর কাছেই তো ওকে ধার নিতে হয়। যা কিপটে মিলুটা! ভাগ্যিস কিপটে, তা না হ'লে হয়তো ধার পেতই না।

—একটা বই কেনার এত ইচ্ছে, জানিস মিলু। অথচ বাবার সব সময় অভাব, অভাব।

মিলু একটা বাচ্চা মেয়ে, সবে কলেজে ঢুকেছে, সেও বিজ্ঞের মত বলেছে, অভাবই তো। ছ' পাঁচ টাকা জমিয়ে কিনলেই পারিস।

—জমিয়ে! মিলুকে আর কিছু বলতে ইচ্ছেই হয় নি অরুণের।

তারপর ধীরে ধীরে বলেছে, জানিস মিলু, তোদের মত জমিয়ে জমিয়ে কিছু করতে আমার ভালই লাগে না। আমার অনেক কিছু পেতে ইচ্ছে করে, বই, গাড়ি, ভাল বাড়ি, রেফ্রিজারেটার··· আরো কি সব যেন, কিন্তু আমার মনে হয় সব এখনই চাই, এখনই।

মিলু হেসে বলেছে, দাদা, তুই বড্ড অধৈর্য রে। সব কখনো এখনই পাওয়া যায়?

তারপর একটু চুপ করে থেকে মিলু খুব খুশী খুশী হাসিতে চোখ বুজে ফেলার মত করে বলেছে, হ্যাঁ রে দাদা, আমারও। আমারও ইচ্ছে করে সবকিছু—সব এখনই পেয়ে যাই।

প্রকাশবাবু জানেন, মূল্য না দিয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। জানেন, কোন কিছু পেতে হলেই আঁটঘাট বেঁধে এগোতে হয়। নিজেকে তৈরী করতে হয়।

চেষ্টা করেও অরুণকে কিছুতেই যেন বুঝতে পারেন না। তাই অরুণকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই ছেলেটার। এতটুকু মায়া মমতা নেই বাবা-মার ওপর, সংসারের ওপর। তুমি রোজগার করে টাকা এনে দাও, আমি আড্ডা দিয়ে বেড়াই। দুদিন পরে যে উনি রিটায়ার করবেন, সে খবর শুনে মুখে কোন ভাবনার ছাপ পড়লো না।

ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা দিয়ে আসতে বলেছিলেন, লিফটম্যানের সঙ্গে ঝগড়া করে ফিরে এলো। কি, না কিউ দিয়ে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম, লিফটম্যান সবাইকে নিয়ে আমার বেলাই বললে, হবে না। কেন, আমি কি ফালতু নাকি?

—তোর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না। সে তো নিয়ম মেনে লোক নেবে। ঝগড়া করে লাভ কি হলো, সেই মনিঅর্ডার করে পাঠাতে হবে, রসিদ কবে পাবো তার ঠিক নেই। প্রকাশবাবু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন।

আর অরুণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, ওঃ। নিয়ম মেনে লোক নেবে। কত নিয়ম মানছে সব জায়গায়।

এদের ধারণাটা কি, প্রকাশবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। নিয়ম মানছে না কেউ, সেটাই আপত্তি? না, নিয়ম জিনিসটাই খারাপ?

কিন্তু ছেলের ওপর অভিমান করেই বা লাভ কি। বেড়া দিলেই কি চারা গাছ বড় হয়? সারা সংসারটাকেই তো ইচ্ছার গণ্ডীতে

বেঁধে মনের মত করে সাজাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন কি! তাঁর চোখের সামনেই তো সকলে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

চুলোয় যাক সব, তিনি নিজের কর্তব্যটুকু করে যাবেন। ওরা তো বুঝবে না। ছোট মেয়ে মিলু তবু কাছে আসে, হেসে কথা বলে: সেও একদিন বলেছিল, বুড়ো বয়সে সিচুয়েশন ভ্যাকাণ্ট দেখছো, তোমার বাবা অদ্ভুত সব বাতিক।

বাতিক! তাই হবে হয়তো। এখন অবশ্য পরীক্ষা হয়ে গেছে, আর কিছুদিন পরেই তো ফল বের হবে। অরুণ পাশ করবে সে বিশ্বাসও আছে। ছেলে তো খারাপ নয়।

একালের ছেলেমেয়েদের এই একটা দিক বুঝতে অসুবিধে হয় প্রকাশবাবুর। তখন ভাল ছেলেরা ভাল-ছেলে ছিল, খারাপ ছেলেরা খারাপ-ছেলে।

আর এরা ভাল খারাপ সব যেন এক ছাঁচে ঢালা। সার্টিফিকেট না দেখলে চেনা যাবে না কে ভাল, কে খারাপ।

অরুণের ছোটমাসী এসেছিল বেড়াতে। সে-কথা শুনে হেসে উঠেছিল সেদিন।—জামাইবাবু, আপনার বড্ড সেকেলে ধারণা কিন্তু। ভাল ছেলে হলেই থুঁতনিতে ছাগলদাড়ি থাকবে, দাড়ি কামাবে না, জামায় ইস্ত্রি থাকবে না, কথা বলতে গেলে তোৎলামি করবে, আর শুধু বেশী বেশী নম্বর পাবে পরীক্ষায়—এই তো আপনাদের ভাল ছেলে! মাগো, আমার ভাবতেও বিশ্রী লাগে।

শুনে হেসে উঠেছিলেন প্রকাশবাবু নিজেও। তবু মনের মধ্যে একটা গোপন ইচ্ছে বোধহয় ছিল অরুণকে ঠিক সেইভাবে মানুষ করে তোলার। এখন ভাবেন, ভাগ্যিস অরুণ সে-রকম হয় নি। তা হলে এই বাজারে একটা চাকরি জোটানো যে কি মুশকিল হতো।

অরুণের চাকরিটাই অবশ্য এখন একমাত্র দুশ্চিন্তা। পড়া তো শেষ হয়ে গেল, এখন থেকেই চেষ্টা করতে দোষ কি। অরুণকেও বলেছেন সে-কথা।

আর সেজন্যেই সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছিলেন। প্রতিদিনই এ সময়টা বসে বসে চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, কোন কোনটার চারপাশে কালির দাগ টেনে রাখেন।

বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে দেখতেই তাই ডাক দিলেন, অরুণ, অরুণ।

কনকলতা ভাঁড়ার থেকে একমুঠো তেজপাতা আর তেলের বাটিটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কাকে ডাকছো? সে-বাবু বাড়িতে আছেন নাকি, বাজার নামিয়ে দিয়েই আড্ডা দিতে চলে গেছে।

বড় মেয়ে বুলু পাশের ঘরে ঝুল ঝাড়ছিল। লম্বা ঝুলঝাড়াটা নিয়ে এমনিতেই ব্যতিব্যস্ত, তার ওপর ঘাড়ে পিঠে ঘাম জ্যাবজ্যাব করছে। মা'র কথা শুনে নিজের মনে মনে বললে, আড্ডায় না কোথায়, সব জানো কিনা।

স্ত্রী টিপ্পনি কেটেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে দেখে বুলুকেই ডাকলেন এবার।

—একটা বিজ্ঞাপন টিক দিয়ে রেখেছি, অরুণকে বলিস তো বুলু দরখাস্ত করতে।

বুলু এতক্ষণ গাছকোমর বেঁধে কাজ করছিল, কোমর থেকে আঁচলটা খুলে গলার ঘাম কাঁধ মুখ মুছতে মুছতে বললে, তোমার কেন যে এই বাজে খাটুনি, ও দরখাস্ত করে নাকি। বলে, রেজাল্ট না বেরোলে ওসব করে কি লাভ।

প্রকাশবাবু হাসলেন।—করে করে, ও তোদের রাগাবার জন্যে বলে।

চাকরির চিন্তা নেই, চাকরির চেষ্টা করবে না, তা কখনো হয় নাকি।

আসলে মুখে যাই বলুন, অরুণের পোশাক-আশাক, হাঁটাচলা তাঁর চোখে খাপছাড়া লাগে বটে। কিন্তু ছেলের ওপর অগাধ বিশ্বাস। ছেলে খারাপ নয় অরুণ। কই, কোন অন্যায় তো করে নি কখনো।

ঝগড়া, মারামারি, পুলিস কেস—আজকালকার ছেলেদের নিয়ে বাপ-মাকে কম ঝামেলা পোয়াতে হয়? আপিসে নিত্যদিনই তো শুনছেন। অথচ অরুণ সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন অভিযোগ করে নি তাঁর কাছে। কনকলতারও তো ঐ একটা অভিযোগ শুধু। দিনরাত আড্ডা দেয়, বাড়ির কাজে লাগে না।

চাকরি হোক, নিজে মেয়ে দেখে একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দেবেন, তারপর দেখবো···কনকলতাকে হেসে বলেছেন, আড্ডা একআধটু আমরাও দিতাম, বুঝলে। তারপর সংসার-চিন্তায়···

ছেলের বিয়ের কথায় কনকলতার মুখেও হাসি ফুটেছে।—দাদা বলছিল, গগনবাবুর মেজ-শালীর মেয়ে বি. এ. পরীক্ষা দেবে, দেখে রাখলে দোষ কি।

—পাগল হয়েছো, এখন ওসব মাথায় ঢুকিও না। বলেছেন বটে, কিন্তু নিজেরও একটু ভাবতে ভাল লেগেছে। বেশ শিক্ষিত আর সুন্দরী মেয়ে দেখে ঘরে আনবেন, শুধু একটা ভাল চাকরি হয়ে যাক না।

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে অরুণের ছোট্ট টেবিলটার ওপর রেখে উঠে পড়লেন।

ক্ষুরটা খাপ থেকে বের করলেন, ভাঁজ খুললেন, লম্বা স্ট্র্যাপটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে ক্ষুরটা তার ওপর টেনে টেনে শান দিলেন। শান দিতে দিতে ক্ষুরের গায়ে 'শেফিল্ড' লেখাটা যেখানে প্রায় মুছে গেছে সেটার ওপর একবার চোখ ফেললেন।

—ভেবেচিন্তে লাভ নেই প্রকাশ, ওরা সব বদলে গেছে। বড় শালা অনন্ত রসিক মানুষ, একদিন হেসে হেসে বলেছিল, তোমরা ছিলে শেফিল্ডের ক্ষুর, বাইশ বছর ধরে শান দিয়ে দিয়ে রেখেছো। ওদের শেফটি রেজার, দিন কামাও আর ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।

সত্যি তাই। কোন জিনিসের ওপর এদের যত্ন নেই, মায়া নেই।

এইটুকু থাকলেই আর কোন ক্ষোভ থাকতো না তাঁর। বাপ মা সম্পর্কে একটু দরদ, একটু মায়া।

কিন্তু এত বড় একটা ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠবে অরুণ, কনকলতাও ভাবতে পারেন নি। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছেই হলো না। কিন্তু না বিশ্বাস করেই বা উপায় কি।

গলির মোড়ে ওর সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে মিলু প্রতিদিন এ সময়টা গল্প করে। মাঝে মাঝে একটু চোখ রাখেন কনকলতা। একটু আগেও বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখে গেছেন, মিলু ওদের দরজায় দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করছে।

তাই মিলু হঠাৎ হুদ্দাড় করে ছুটে আসতে আসতে 'মা, মা' বলে ডাকছে শুনেই ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।—কি হলো?

মিলুর মুখে হাসি আর ধরে না।—ছোটমাসী আসছে। এই মাত্তর দেখলাম।

—ছোটমাসী? আজ, হঠাৎ?

ছুটিছাটার দিনে কখনো কখনো কানন আসে বেড়াতে। কিন্তু এই তো সেদিন ঘুরে গেছে সে, এর মধ্যে আবার এলো যে!

কনকলতা নিজেও খুশী হয়েছিলেন ছোট বোন আসছে শুনে, তবু মিলুকে ধমক দিলেন কাননকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

ছোটমাসীর হাত ধরে মিলু ততক্ষণে নাচানাচি শুরু করেছে, ছোটমাসী, আজ তুমি এখানে থাকবে, যেতে পাবে না।

কনকলতা হেসে ফেললেন। ধমক দিয়ে বললেন, ছোটমাসীকে দেখলে সব দেখি আহ্লাদে আটখানা।

মিলু কলেজে ঢুকেছে, রাস্তায় বের হলে শাড়ি আর শরীর নিয়ে সবসময় ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু বাড়িতে কেমন একটা বালক বালক ভাব। ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করে বললে, ছোটমাসী তো তোমার মত মুখ গোমড়া করে থাকে না।

কনকলতা বড় একটা হাসেন না সত্যি। হাসবার মত সময় পান কখন ?

তবু আদরের গলায় জবাব দিলেন, ছোটমাসীই তোমাদের মাথাগুলি চিবিয়ে খাচ্ছে। বলে হেসে ফেললেন।

কানন ঠোঁট টিপে চোখে একটু রহস্য আঁকলো।—মাথা আর কারো চিবোতে হবে না মেজদি, আজকাল ওরা নিজেরাই নিজেদের মাথা চিবোচ্ছে।

কথাটা বলার মধ্যে কি যেন ছিল, হাসিটা কেমন যেন। কনকলতার কপাল কুঁচকে গেল, কিন্তু মিলুর সামনে জিজ্ঞেস করতেও পারলেন না। বুলু মিলু সম্পর্কে কিছু ? কোথাও কিছু শুনেছে কানন ? কিন্তু মিলুকে তো যতখানি সম্ভব চোখেচোখেই রাখেন। ছেলেমেয়েদের ভয় পান না, ভয় পাছে কেউ ওদের সম্পর্কে কিছু বলে বসে।

মিলু রেকর্ড-প্লেয়ারটা বাজাতে যেতেই কনকলতা ঈষৎ চাপা গলায় বললেন, মাথা চিবোনোর কথা কি বলছিলি তখন ?

—বলবো, বলবো। বলে হেসে ফেললো কানন।

তারপর ছোট্ট বারান্দাটায় যেখানে প্রকাশবাবু ক্যাম্বিসের ডেকচেয়ার পেতে চা খাচ্ছিলেন সেখানে গিয়ে হাজির হলো। বেতের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে হঠাৎ আরেক দমকা হেসে উঠে বললে, অরুণের কিন্তু পছন্দ আছে জামাইবাবু।

প্রকাশবাবু চোখ তুলে তাকালেন।

আর কনকলতা অধৈর্য হয়ে বললেন, অরুণ ?

—আবার কে। কানন যেন হাসি চাপতে পারছে না।—তাকিয়ে থাকার মত চেহারা মেজদি, লম্বা, স্লিম, জোড়া ভুরু। জোড়া ভুরু আমার ভীষণ ভাল লাগে।

কনকলতা রেগে গেলেন এবার।—ওসব ছাড় তো, আসল কথাটা বল।

কানন আবার হাসলো।—রেগে যাচ্ছিস কেন, আমি হলে তো নিজে গিয়ে ছেলের বউ করে নিয়ে আসতাম। ফোয়ারার মত, সত্যি বলছি, যেমন ফর্সা সুন্দর, তেমনি হাসিখুশি, হাঁটাচলাও বেশ।

প্রকাশবাবুর কপালে এতক্ষণে দাগ ফুটলো।—তুমিই তো দেখছি ফোয়ারা হয়ে গেছ। কথাটা শুনে তো মনে হচ্ছে হাসির তেমন কিছু নেই। খুব শান্ত গলায় থেমে থেমে বললেন।

কানন ঠোঁট চেপে বললে, আহা, আমাকে আপনি তো ফোয়ারাই দেখে আসছেন। আপনার চোখের বিচারে নয়। সত্যি ভাল মেয়ে, আর এতটুকু জড়তা নেই, হাত পা নেড়ে এমন···

কনকলতা দুশ্চিন্তায় রাগে গুম হয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন, ছাখ কানন, সব সময় হাসি ভাল লাগে না।

শেষ অবধি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললো কানন। বললে, অরুণ যে যাবে তা কি জানতাম আমরা। সেই দু'দিন আগে থেকে টিকিট কেটে রেখেছি···তা সিনেমার পর বেরিয়ে আসছি, ও হঠাৎ বললে, ছাখো ছাখো, অরুণ না? একবার ওর সঙ্গে নাকি চোখা-চোখিও হয়েছিল···কানন আবার হেসে উঠলো, বললে, ওরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

—মেয়ে? কত বয়েস? চিনিস তাকে? কনকলতা এক সঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্ন ছুঁড়লেন। বেশ বোঝা গেল একটা প্রশ্নেরও উত্তর জানতে চান না। বেশ বোঝা গেল সমস্ত ঘটনাটিকে সহজভাবে নিতে পারছেন না।

কানন নিজেও যেন বুঝতে পারলো এতক্ষণে, খবরটা এদের না জানালেই ভাল ছিল। সামান্য একটা রসিকতার ব্যাপার ভেবেই না বলেছে।

তাই শুধু বললে, এত উতলা হচ্ছিস কেন? আজকাল এটা কি কোন খবর নাকি!

এত বড় একটা খবরকে বলে কিনা খবর নয়? কাননের নিজের ছেলে হলে এভাবে হাসতে পারতো ও!

ছোট বোনকে বিদায় দিয়েই স্বামীর কাছে ফিরে আসছিলেন কনকলতা। কিছু একটা ঘটেছে, দাদাকে নিয়ে, তা বুঝতে পেরেছিল বলেই কাছে আসে নি মিলু। মাঝপথে মাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে মা?

—তুই যা তো এখন। একটা দুঃখের শ্বাসকে বুকে চেপে রাখার চেষ্টা করলেন কনকলতা।

তারপর বারান্দায় এসেই বললেন, দাদাকে বলি, গগনবাবুর সেই মেজশালীর মেয়েকে এই সপ্তাহেই দেখতে যাবো আমি।

প্রকাশবাবু কানেই তুললেন না কথাটা। শুধু বললেন, আস্কারা দিয়ে দিয়ে তোমরাই ওর মাথাটা খেয়েছো। আসুক ফিরে হারামজাদা—

এতক্ষণ কাঁধটা গরম কোট ঝোলানোর হ্যাঙার ছিল, টান টান, চোখাচোখি হতেই কাঁধটা ঝুলে পড়লো। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো অরুণের।

মেজাজ সকাল থেকেই তো বিগড়ে আছে। তার ওপর দুপুরে খেয়েদেয়ে বের হবে, মা বলে বসলো, র‍্যাশনের দোকানে এখনো কার্ড ফেরত দেয় নি সোনার মাকে, কি সব দরকার, গিয়ে আনতে বলেছে।

—তোমাদের কি রোজ একটা না একটা কাজ থাকবেই! পারবো না আমি।

মা গম্ভীর গলায় বললে, না আনতে পারিস উপোস করবি সব, এ হপ্তার র‍্যাশন তোলা হবে না।

উপোস করবি। যেন উপোস করাকে ভয় পায় ও। আর কাজেরও শেষ নেই, আজ প্রিমিয়ামটা দিয়ে আয়, আজ র‍্যাশন কার্ড, স্টোভ সারিয়ে আন্, মিস্ত্রীকে খবর দে···বেকার হয়ে বসে আছে বলে ওই যেন একমাত্র কাজের লোক। কোন রকমে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলে শান্তি। তখন বাবার মত ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারবে।

র‍্যাশন কার্ডগুলো ফেরত পেয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো অরুণ। চচ্, সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। অথচ একটার মধ্যে পৌঁছতে হবে।

ওগুলো নিয়ে তখন তখনই বাসে উঠলে দেরী হতো না। কিন্তু ছ'খানা র‍্যাশন কার্ড হাতে নিয়ে তো রুণুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যায় না।

বাড়িতে সেগুলো রেখে দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাসে উঠে আবার ঘড়ি দেখলো অরুণ। আর দেরী হয়ে গেছে দেখে সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠলো।

—আমার মাইরি কি মনে হয় জানিস টিকলু? মনে হয় শরীরে রক্ত নেই, শুধু নিমপাতার রস। শালা তেতো হয়ে গেছি।

টিকলু অসীম বিরক্তিতে মুখখানা দুমড়ে কুঁচকে বলেছিল, বিছুটি, টেরিলিন ফেরিলিন, এই প্যান্ট শার্ট সব মনে হয় বিছুটি দিয়ে বোনা।

টিকলু ঠিকই বলেছিল।

বাস থেকে যখন নামলো তখন একটা বেজে পনেরো। অথচ রুণুর সঙ্গে কথা ছিল একটা অবধি থাকবে। বাস-স্টপে। এসে ফিরে গেল? না আসেই নি এখনো?

রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাস-স্টপে এক চামচ ছায়া আছে বটে, কিন্তু লোক লোক। রোদ্দুরে দাঁড়াতে পারে নি বলে কাছে কোথাও ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায় নি তো!

রোদ্দুরের মধ্যেই বেশ খানিকটা এদিক ওদিক করে রুণুকে খুঁজলো ও। দু'চারটে দোকানে উঁকি দিয়ে দেখলো কোথাও টফি কিংবা চুলের কাঁটা কেনার নাম করে ছায়া পোয়াচ্ছে কিনা।

নাঃ। হয়তো অপেক্ষা করে করে চলে গেছে। সময়ের দাম যেন শুধু রুণুরই আছে, অরুণ যে এক একদিন আধঘণ্টা বাড়তি সময় দাঁড়িয়ে থাকে! থাকে বটে, কিন্তু রুণু এসেই এমন ভাবে বলে, ঈস্, তোমাকে খুব কষ্ট দিই আমি, না? কি করবো বলো···ব্যস্, সব রাগ জল হয়ে যায়। তখন রুণুকে এত ভাল লাগে।

অরুণ ভাবলো, রুণু এসে ফিরে গেল, অথচ আর পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলো না! করবে কি করে, মেয়েদের কোথাও পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার উপায় আছে নাকি। মাছির মত ভন্ ভন্ করবে সব। গা ঘেঁষে দাঁড়াবে, আড়ে আড়ে তাকাবে। ন্যুইসেন্স।

দেশটা অধঃপাতে যেতে বাকি নেই আর। একটা লোকও সুস্থ নেই আর, একটা লোকও না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন রুণু এলো না—ধুত্তোর, কফি হাউসেই যাই, যদি কেউ থাকে···

কেউ না থাক্, উর্মি আছে। ফিলামেণ্ট যায়-যায় হলদে হওয়া বাল্‌বটা দপ্ করে আলোয় সাদা হয়ে গেল। এতক্ষণের জমা হওয়া বিরক্তি এক নিমেষে সরে গেল মন থেকে।

উর্মির টেবিলে সেই গোঁফওলা ছেলেটা। হাতে সব সময় মোটা মোটা বই নিয়ে যে ঘোরে। শালা ইনটেলেকচুয়াল। ওকে দেখলেই হাসি পায় অরুণের।

উর্মিও বোধ হয় বাঁচলো। অরুণকে দেখতে পেয়েই ঝট্ করে স্প্রিঙের মত উঠে দাঁড়ালো সটান, টান টান হয়ে, ঢাউস সাদা ব্যাগটা তুলে নিয়ে কি যেন বললো ছেলেটাকে, তারপর হাসতে হাসতে অরুণের দিকে এগিয়ে এসে আরেকটা টেবিলে বসতে বসতে বললে, বাঁচালি।

—দিব্যি তো ওর সঙ্গে মজে গিয়েছিলি। অরুণ হাসলো।—বাংলা পড়াচ্ছিলো নাকি!

উর্মি হেসে উঠলো।—বাপ্‌স্, কি জেলাসি। বলেই হাত নেড়ে নির্ভয় করলে, ভয় নেই। একা একা বসে থাকলেই প্রেম-ট্রেম দুঃখ-টুঃখ মনে পড়ে যায় কিনা, তাই ভাবলাম যতক্ষণ তোরা কেউ না আসছিস···

—তোর আবার দুঃখ আছে নাকি।

—বানাই। বলেই হেসে উঠলো উর্মি।

অরুণ হেসে ফেললো ওর কথায়। ওরা ঠিকই বলে, উর্মির মধ্যে সত্যি কি একটা জাদু আছে। সাদা ব্যাগটার সোনালী মোনোগ্রামটার ওপর দুটো আঙুলে খেলা করছিল উর্মি। সেদিকে তাকালো অরুণ। বাঃ, বেশ সুন্দর তো আঙুলগুলো, এতদিন লক্ষ্যই

করে নি। এক একজন আছে না, ঝট্ করে এত কাছে এসে যায়, তাকে আর ভাল করে লক্ষ্য করা হয় না। উর্মি ঠিক তেমনি।

গোঁফওলা ছেলেটা আরেক কাপ কফি নিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে সিলিঙ দেখছে। উর্মির সঙ্গে আলাপ করার জন্য বহুদিন থেকে ছুকছুক করছিল। অরুণ কিংবা টিকলুর কাছে মাঝে মাঝে দেশলাই চাইতে এসেছে, সে কি সিগারেট ধরাবে বলে! ওকে দোষ দিয়ে কি হবে, কলেজে ঢুকেই তো দেখেছে সব ছেলেগুলোরই চোখ পড়েছে উর্মির ওপর। আলাপ করতে পেলে বর্তে যায়। অরুণরা নাকি, সিঁড়ি দিয়ে ভিড় করে নামছিল সব, পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলো অরুণ, আর উর্মি নিজে থেকেই হেসে কি যেন বলেছিল। কি বলেছিল এখন আর মনে নেই।

—কি এত বোঝাচ্ছিল ছেলেটা? অরুণ জিজ্ঞেস করলো।

—বোদেলেয়ার, মালার্মে, কামু, কাফকা। বলেই হেসে উঠলো উর্মি।

উর্মির লম্বা সুন্দর শরীর, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলা, হাসি—সব মিলিয়ে একটা নিটোল অশোক গাছ, ডালগুলো ঝড়ে দুলছে। দূর, অশোক গাছ তো আমি দেখিই নি।

—গাঁদা ফুলের মত এমন সুন্দর চেহারা তোর, ছেলেগুলোর আর দোষ কি। ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল অরুণ।

—যা যা, আমার মত একটা ফীগার দেখা তো তুই। থার্টিফোর, টুয়েন্টিটু, থার্টিফোর। বলেই নিজেকে নিজে ঠাট্টা করার ভঙ্গিতে হেসে উঠেছিল উর্মি।

টিকলু গম্ভীর মুখে বলেছিল, দর্জির ফিতেটা নির্ঘাত ইলাস্টিক ছিল।

শুনে দমকে দমকে হেসে উঠেছিল উর্মি।

সত্যি, উর্মি যতক্ষণ থাকে, অরুণের আর কিচ্ছু মনে পড়ে না। বিরক্তি, দুঃখ, অভাব, কিচ্ছু না।

এ-যুগটা সেই কাপালিকের মত দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে

তাকে, দিনরাত বাঁধছে, আর ঊর্মি যেন ছুরি দিয়ে বার বার দড়িটা কেটে দিতে চাইছে।

প্রথম দিন, কিংবা প্রথম আলাপের পর একদিন, এখন আর ঠিক মনে নেই, ঊর্মির কাছে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হয়েছিল, কিংবা ঊর্মিকে অহঙ্কারী।

—না না, ওসব আপনিটাপনি চলবে না, শ্রেফ 'তুই'। তুই-তুই। বলে অরুণের অপ্রতিভ মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিল ঊর্মি।

তুই। হাঁ হয়ে গিয়েছিল অরুণ। ঊর্মি সম্পর্কে তখন বুকের মধ্যে একটু একটু গুনগুনুনি শুরু হয়েছে, ঊর্মির শরীরের দিকে তাকানো চোখটা তখনো পাজি।

টিকলুকে বলেছিল, ঊর্মিলা···ঊর্মি মাইরি আজ শেক্ দি বট্‌ল্ করে দিয়েছি।

ঊর্মির যুক্তিটা শুনে আরো খারাপ লেগেছিল। হাসতে হাসতে ঊর্মি বলেছিল, আপনি থাকলেই কবে তুমি করতে চাইবি। না বাবা, ওসবের মধ্যে আমি নেই। হেসে উঠে বলেছিল, 'তুমি' একজন আছে, আছে। মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

তারপর থেকে সম্পর্কটা সত্যিই কত সহজ হয়ে গেছে। কত্ত সহজ।

দুটো কফির অর্ডার দিয়ে ঢাউস সাদা ব্যাগটা খুললো ঊর্মি। চুরুর্‌র্ চুরুর্‌র্···জীপ ফাসনার খুললো, বন্ধ করলো। বোধহয় টাকা পয়সা ঠিক ঠিক আছে কিনা দেখে নিলো।

অরুণ বললে, আছে, আমার কাছেও আছে। একটু থেমে বলল, তোর প্রেমিকের খবরটবর বল্।

ঊর্মি হাসলো।—এলে কী আর এখানে আসতাম। মাইনিং এঞ্জিনিয়ার তো, বোধহয় গভীরের সন্ধানে আছে, আমার মত হাল্কা মেয়ের কথা মনে পড়ছে না।

অকপটে নিজের প্রেমের গল্প বলতে বলতে, খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে দিতে ঊর্মির মুখখানা যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন এক একদিন অরুণের মনে হয়, ও নিজে যেন বড় বেশী তুচ্ছ হয়ে গেছে। তবু শুনতে ভালও লাগে। সে কোলকাতায় এসেছে কিনা, চিঠিতে কি লিখেছে।

ঊর্মি ওর কাছে একটা রহস্য, একটা আতঙ্ক।—চিঠি লিখিস। পরীক্ষার পর ঊর্মি একদিন বলেছিল।

ভয় পেয়েছিল অরুণ। চিঠি লিখলেই তো উত্তর আসবে। কোন মেয়ের লেখা চিঠি বাড়িতে এলে রক্ষে আছে নাকি। এমনিই তো ভয়, ঊর্মি হঠাৎ না কোনদিন বাড়িতে এসে হাজির হয়।

বাইরের পৃথিবীটা ঊর্মির মত সহজ হয়ে গেছে, অথচ…। নাঃ, শুধু চিঠি কিংবা ঊর্মির উপস্থিতিকেই ভয় নয়। ঊর্মির মত সুন্দর একটা ফুলের তোড়াকে…ঐ বিশ্রী নোংরা জঞ্জালের মত বাড়িটায়… বেমানান, বেমানান।

—কি ভাবছিস্ এত? রুণুর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নেই তো? বলে হাসলো ঊর্মি।

অন্যদিন হলে অরুণও হাসতো। কিন্তু রুণুর কথা মনে পড়িয়ে দিতেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকলো। আচ্ছা, রুণু এলো না কেন? ঊর্মির সঙ্গে সেদিন দেখে নি তো রাস্তায়? কিন্তু সেদিন তো টিকলু আর সুজিতও ছিল। স্টুপিড! ঊর্মির ওপর জেলাসি। এরা কেউ যদি জানতে পারে ঊর্মির ওপর জেলাসি আছে রুণুর, এমন ঠাট্টা শুরু করবে সব। আর ঊর্মি তো হেসে উঠে হাত-পা নেড়ে নির্ঘাত চেয়ার ভাঙবে।

—বললি না, তোদের কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা আজ? ঊর্মি ঠোঁট চেপে হাসলো।

—আরে দূর্, প্রেমট্রেম তুই সত্যি বিশ্বাস করিস্? ওসব কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। ও শুধু এই বিশ্রী গরমে এয়ারকণ্ডিশানড ঘরে বসে থাকা।

উর্মি হেসে উঠলো।—দারুণ! ব্যাগ থেকে পাঁচটা পয়সা বের করে দিলো অরুণকে, তারপর বললে, 'অন রেকর্ডে' পাঠিয়ে দে।

লুকোনো রাগ আর চাপা জ্বালা ভিতর থেকে বের করে দিয়ে বেশ ভাল লাগলো অরুণের। আরো খুশী হলো চটকদার একটা কথা বলতে পেরেছে বলে। মিথ্যে কথাগুলোর বেশ চটক আছে তো। সত্যি কথাগুলো খুব সহজ, খু-ব সহজ, অথচ বলা যায় না। রুণুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ও যে কষ্ট পাচ্ছে, সে-কথা বললে উর্মি হেসে উঠে এমন সীন ক্রিয়েট করতো—

আজ দুপুরের এই রোদ্দুরে ও পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আশায় আশায় অপেক্ষা করেছে এ-কথা কাউকে বলা যায় নাকি। তার জন্যে নিজের কাছেই তো নিজের লজ্জা করছে।

—তা হ'লে চল্, একটা ছবি দেখে আসি। উর্মি বললে।

—এয়ারকণ্ডিশানড্ ঘরে? বলে হেসে উঠলো অরুণ।—কিন্তু টাকা নেই।

—কবে থাকে? কথাটা মিথ্যে বলেই উর্মি ঠাট্টা করতে পারলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কলার ধরে টানলো।—ওঠ, ওঠ, সুজিত আসবে না।

কি করবে অরুণ? বলবে, না না, যাবো না তোর সঙ্গে?

—আমাদের আসল ট্রাব্‌ল্ কি জানিস সুজিত? বাইরের সঙ্গে ভেতরটা মিলছে না।

সুজিতকে একদিন বলেছিল অরুণ। কিন্তু কি ভেবে বলেছিল ও নিজেও জানে না। হঠাৎ দুম্ করে বলে ফেলেছিল, তারপর মনে হয়েছিল নিশ্চয় কথাটার কোন মানে আছে।

ঠাণ্ডা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে উর্মির পাশে পাশে হেঁটে কাউন্টারের দিকে যাবার সময় অরুণের গর্ব হচ্ছিল। ওর মত মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে

হাঁটার একটা অন্য গর্ব। রুণু যদি এ সময় দেখতো, খুব ভাল হতো। রুণু আসে নি বা এসেও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে নি, তার জন্যে ভিতরে ভিতরে এক একবার রেগে উঠেছিল ও। এমনি তো চোখে দেখে নি, নামই শুনেছে, দু'একটা হাল্কা গল্প, তাতেই হিংসেয় জ্বলে। হঠাৎ চুপ করে যাওয়া, গম্ভীর হওয়া, হিংসে নয়তো কি।

উর্মি কত সহজ, স্বাভাবিক। আর সিনেমা দেখতে গিয়ে রুণুর কেবল ভয়, কেবল ভয়। সব কিছুর পরও কেমন একটা অতৃপ্তি থেকে যায়।

অথচ উর্মি সারাক্ষণ ছবি দেখতে দেখতে সশব্দে হেসেছে, কানে কানে টিপ্পনি কেটেছে, আবার স্পষ্ট করে দু'একটা কথাও বলেছে। অথচ এইটুকু রুণুর কাছ থেকে পেলে, ও কত বেশী খুশী হতে পারতো।

যেখান থেকে যা পাচ্ছি, টুকরো টুকরো ভাবে পেলেই বা দোষ কি।

সিনেমা হল থেকে তখন ভিড় উপচে বের হচ্ছে। এবার তো উর্মি চলে যাবে। অরুণ আবার একা। রুণুর কথা আবার নতুন করে মনে পড়লো। যাক্ গে, 'কোজি নুক' আছে, চায়ের কাপ সামনে নিয়ে সুজিত টিকলুর মুখোমুখি বসে থাকা আছে।

অন্যমনস্ক ভাবে সিনেমা হল থেকে বের হতে গিয়ে ছোটমেসোর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ছোটমেসো? বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠলো অরুণের। কাঁধটা গরম কোট ঝোলানো হ্যাঙারের মত টানটান ছিল, ঝুলে পড়লো।

এতক্ষণ উর্মির ওপর খুশী ছিল, ঈষৎ বিরক্তি ফুটে উঠলো এবার। উর্মির সঙ্গে দূরত্ব বাড়াবার জন্যে যত সরে আসে, উর্মি ততই কাছ ঘেঁষে আসে। হাসতে হাসতে অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গেল ও, আর অরুণ অন্য দিকে তাকিয়ে এমন ভান করলো মুখের, যেন উর্মি ওর চেনা কেউ নয়।

তাড়াতাড়ি ভিড় ছাড়িয়ে ছোটমেসোর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল অরুণ। সঙ্গে কে ছিল, আর কেউ ছিল কিনা দেখার সাহসই হয় নি। ঊর্মিকে কি উনি দেখেছেন? দেখে বুঝতে পেরেছেন ওরা একসঙ্গে এসেছিল?

দুশ্চিন্তায় তখন মনের এমন অবস্থা, ঊর্মি কলকল করে কি বলছে, কুলকুল করে কেন হাসছে, কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধু তার কথার পিঠে শুকনো হুঁ আর হাঁ দিয়ে গেল!

ও শুনছে কি শুনছে না, সেদিকে দৃষ্টি নেই ঊর্মির। ও শুধু হাত নেড়ে নেড়ে অনর্গল কথা বলছে, ট্যাঙ্কে জল ফুরিয়ে যাওয়া কলের মত হঠাৎ হঠাৎ হাসছে। এমন মুশকিল, ঊর্মিকে যে বলবে ছোট-মেসোর কথা, সাবধান করে দিয়ে দূরে দূরে হাঁটবে তারও উপায় নেই। শুনে এমন হেসে উঠবে।—সে কি রে! বলে এমন অবাক হয়ে তাকাবে মুখের দিকে!

একসঙ্গে অনেকের ওপর রাগ হলো অরুণের। ঊর্মির ওপর, ছোটমেসোর ওপর, বাবা-মা-দিদি সকলের ওপর। সমস্ত বাড়িটার ওপর। আজ আবার মনে হলো ঐ বাড়িটার সঙ্গে ও যেন খাপ খায় না। বাইরের সঙ্গে ভেতরটা খাপ খায় না, কোন কিছুর সঙ্গে কোন কিছু খাপ খায় না।

বাস-স্টপে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

ফোলিওব্যাগ হাতে মধ্যবয়স্ক একটি লোক ফুটপাথ ধরে আসছিল। এমন উদাসীন অন্যমনস্ক ভাব করলো যেন ঊর্মি তার চোখেও পড়ে নি। তাই ঊর্মির কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চোখ দুটোকে সে র‍্যাডার বানিয়ে দু' মাইল দূরে কোথাও বাস আছে কিনা খুঁজলো।

—মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ করবি? ঊর্মি হেসে উঠলো।—শীগগির আসছে।

—ধুস্। তোর মেয়েবন্ধু হলে করতাম।

উর্মি হেসে উঠে বললে, আহা রে। বলেই চারপাশের লোকগুলোকে দেখিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো।

অরুণও হেসে ফেললে। সুজিত বেশ উপমাটা দিয়েছিল কিন্তু। 'গরমের দিনে ঘাম হতে দেখেছিস? ফুট্ করে একজায়গায় এক ফোঁটা ঘাম বের হলো, একটু পরে তার পাশে তিন চার ফোঁটা, তার পাশে আবার, আবার···পুনপুন পুনপুন করে চাক হয়ে যাবে একটা। তেমনি কোথাও একটা মেয়ে এসে দাঁড়াক, দু'-মিনিটে দেখবি ভীমরুলের চাক গড়ে উঠবে।'

উর্মি হেসে উঠে বললে, ঘাম।

অরুণও হেসে ফেলে এপাশ-ওপাশ দেখলো। সত্যি, ভিড় জমে গেছে। বাঃ, তা বলে লোকে বাসে উঠবে না।

না, আজ আর এখন বাড়ি ফেরা চলবে না। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, যেদিন আড্ডায় ইণ্টারভ্যাল হয়, সেদিন এ সময় বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে একেবারে 'কোজি নুকে' গিয়ে হাজির হয়। আজ তার উপায় নেই, দুর্ঘটনাকে চোখের সামনে ঘটতে দেবে না। ছোটমেসো যদি সোজা গিয়ে হাজির হয়ে থাকে।

—যত সব গাঁইয়া। নিজের মনে মনেই অস্ফুটে বলে ফেললো অরুণ।

আচ্ছা, উর্মি তো স্রেফ বন্ধু। যা সত্যি তাই বলবে। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে। হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে, একটি মেয়ে।

অসম্ভব। বললেই হলো নাকি, ঝড় বয়ে যাবে। মা দেয়ালে মাথা খুঁড়বে, বাবা চিৎকার করবে, দিদি বলবে, অরুণ তুই শেষে···

আশ্চর্য, সব কথা কেবল চেপে রাখো, লুকিয়ে রাখো।

উর্মিকে বাসে তুলে দিয়ে উল্টো দিকের বাসে উঠে একেবারে 'কোজি নুকে'র সামনে এসে নামলো। ছোট চায়ের দোকানটার নাম 'কোজি নুক'। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। খান বারো-চোদ্দ কমদামী কাঠের চেয়ার টেবিল, যেমন নোংরা টেবিল, তেমনি নোংরা ইজের-পরা বাচ্চা বয়। কিন্তু বিকেল হতে না হতে সব ক'টা চেয়ার দখল হয়ে যায়। আর কি চিৎকার, কি চিৎকার।

অরুণকে দেখতে পেয়েই তর্ক থামিয়ে টিকলু বললে, কি বস্, অ্যাটাচির সঙ্গে দেখা হলো? জাহাজ দেখালে?

—ধুত্তোর অ্যাটাচি। অরুণ বিরক্ত হলো।—দেখবি যা, সে অন্য কার সঙ্গে···

বলেই থেমে গেল ও। এক একদিন কি যে হয়, রুণু সম্পর্কে

ওরা একটু খোঁচা দিলেই রাগ গিয়ে পড়ে রুণুর ওপরই। তখন ও রুণুকেই খুব সস্তা করে দেয়।

কিংবা কথা চাপা দেয়ার জন্যেই হয়তো বললে। একটু চুপ করে থেকে মেজাজ ঠাণ্ডা করে আবার বললে, একটা নতুন ঝামেলা হলো। উর্মির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে···

সুজিত মুখ বাঁকিয়ে বললে, ফালতু সময় নষ্ট করতে তোর ভাল লাগে?

অরুণ এবার কথাটা চেপে গেল। ভাগ্যিস বলে ফেলে নি। শুনে হয়তো বলতো, ছোটমেসো দেখেছে তো কি হয়েছে, তার সঙ্গেও ভাকুয়াম ছিল কিনা দেখেছিস? কারো সম্পর্কে এদের এতটুকু ভালবাসা নেই, শ্রদ্ধা নেই। ছোটমেসো, রুণু, উর্মি, সকলকে সমান চোখে দেখে। বাবা মা তো এদের আসল চেহারা দেখে নি, দেখলে বুঝতো। চোদ্দ ইঞ্চিকেই চোঙা ভাবে। টিকলু একটা নতুন প্যাণ্ট করিয়েছে, তার গর্বেই···শালা আবার প্লেট দেয় নি।

—উর্মির সঙ্গে আমিও একদিন গিয়েছিলাম। টিকলু হাসলো। —মাইরি হলে ঢুকছি, বললে, 'অসভ্যতা করবি না কিন্তু'···মেয়েলি টান দিয়ে উর্মির মত করেই বললে।

সুজিত হেসে ফেললে।—একেবারে ঠাণ্ডা পানি?

অরুণ হাসলো না।—টিকলুকে যে বিশ্বাস নেই।

টিকলু হ্যা হ্যা করে হেসে উঠে বললে, যা যা, তোর মত তো হার ম্যাজেস্টির সার্ভেণ্ট নই। পুঁটলি বইবো চিঁড়ে খাবো না, ও বাবা ভাল লাগে না।

অরুণ ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠছিল, এবার ও আরো রেগে গেল। বললে, আফটার অল ও আমাদের বন্ধু, এতদিনের বন্ধু।

—ফ্রেণ্ড? টিকলু হেসে উঠলো।—ফ্রেণ্ড তো কি হয়েছে,

মাইনিং এঞ্জিনিয়ার ওকে জাহাজ দেখায় না? তোকেই বিশ্বাস কি, তলায় তলায়, মানে···।

এবার সুজিতও বিরক্ত হলো। খুব কড়া করে কিছু বলবে ভাবলো। বললো না। হঠাৎ অন্যমনস্কের মত হয়ে গিয়ে হাতের রেখা দেখতে দেখতে বললে, ইণ্টারভিউ তো দিয়ে এলাম···

অরুণ বেঁচে গেল। রাগটা তরতর করে নেমে গেল।—বাবা তো রোজ বিজ্ঞাপন দাগিয়ে রাখছে।

টিকলু ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে, ঠোঁটে-ধরা সিগারেটটা ধরিয়ে বললে, ইণ্টারভিউ দিয়ে চাকরি? ওসব ছেড়ে বাবা কপিকল ধর, তা না হলে কিস্যু হবে না।

সুজিত হাসলো।—যা বলেছিস। কিচ্ছু জিজ্ঞেস করলো না মাইরি। তারপর টিকলুর দিকে ফিরে বললে, তোর কি, বাপের চেয়ারে বসবি।

—নেভার। টিকলু প্রতিবাদ করলো, মা'র সঙ্গে কবে থেকে ঝগড়া চলছে। দুটো ট্রেড্‌ল মেশিন নিয়ে ঠুকুস ঠুকুস, ধুর, সারাদিন শুধু 'শুভবিবাহ' আর হ্যাণ্ডবিল ছাপা। লাখখানেক টাকা জোগাড় করে দাও, প্রেস কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি।

অরুণের ঐ সব লাখ টাকার গল্প ভাল লাগে না। তাছাড়া নিজেদের অবস্থাটার কথা যখন ভাবে, তার সঙ্গে টিকলুর মত বড় বড় স্বপ্নকে ও কিছুতেই মেলাতে পারে না। তাই খানিক চুপ করে থেকে বললে, মাস্টারি একটা ইস্কুলে পাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছে হয় না।

সুজিত চুপ করে থেকে বললে, জানিস অরুণ, আমাদের মধ্যে কোন রঙ নেই। সত্যি, আমাদের মাইরি কিচ্ছু হতে ইচ্ছে হয় না।

কেন হবে না। সুজিতটাও বাবার মত কথা বলছে। কিংবা ও ব্যাটাও হয়তো বাপের কাছে শুনে শুনে নিজেও তাই বিশ্বাস করছে। কিচ্ছু হতে ইচ্ছে হয় না। যেন ইচ্ছে হলেই কিছু হতে

পারতো ও। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলে একটা ইণ্টারভিউ মেলে না, ইণ্টারভিউ দিয়ে নাকি চাকরি হবে! কারো কাছে চিঠি লিখে দাও না বাবা, যদি মুরোদ থাকে। ছাখো, চাকরি করি কিনা। তা না, শুধু বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করো।

দরখাস্ত করার ঝামেলা কম নাকি।

পকেটে হাত দিয়ে চায়ের পয়সা দিতে গিয়ে খসখস করে কি একটা কাগজের টুকরো হাতে ঠেকলো। অমনি মনে পড়ে গেল, দুপুরে বেরোবার সময় দিদি দিয়েছিল। নখ দিয়ে দিয়ে ছেঁড়া বিজ্ঞাপনের টুকরোটা। ওটা পেয়েছিল বলেই আর টাকা চাইতে হয় নি মা'র কাছ থেকে। খুব বিরক্ত মুখে বলেছিল, দাও দুটো টাকা, আবার এক দরখাস্তের ঝামেলা দিয়ে গেছে বাবা।

মা প্রথমে একটা টাকা দিয়েছিল, তারপর অরুণ এমন অসহায় কাঁচুমাচু মুখ করে তাকিয়েছিল যে, আরেকটা না দিয়ে পারে নি।

প্রথম প্রথম অবশ্য বাবার এই বিজ্ঞাপন দাগ দিয়ে রাখা মোটেই পছন্দ হতো না অরুণের। কম হাঙ্গামা নাকি। মোড়ের মাথায় একটা দিশী ব্যাঙ্ক আছে, তার সিঁড়ির পাশে দু'টো টাইপরাইটার নিয়ে সারাদিন খটাখট খটাখট চালাচ্ছে দুটো লোক। এক একটা দরখাস্ত চার আনা, সার্টিফিকেটের ট্রু কপি সেও দু'আনা। ঝামেলা না ঝামেলা। দুটো গেজেটেড ধরে সার্টিফিকেট নিয়ে রেখেছে, তার ওপর ডিগ্রিফিগ্রির নকল আছে। তারপর লম্বা খাম কেনো, ঠিকানা টাইপ করাও, স্ট্যাম্প লাগাও পোস্ট আপিসে কিউ মেরে দাঁড়িয়ে। একটা দরখাস্ত মানে দুটো দিনের আড্ডা বন্ধ। প্রথম প্রথম তাই বিরক্ত হতো ও। এখন তাই স্রেফ মা'র কাছ থেকে একটা কি দুটো টাকা নিয়ে বলে, করেছি। শালা করলেও যা, না করলেও তাই, ইণ্টারভিউ তো আসবে না। তার চেয়ে বাপের টাকা ছেলেরই ভোগে লাগছে।

কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। বিজ্ঞাপনের টুকরোটা হাতে ঠেকতেই বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল অরুণের।

—একটা দরখাস্ত টাইপ করাতে হবে, যাবি টিকলু? হঠাৎ উঠে পড়ে অরুণ বললে।

টিকলু অবাক হয়ে তাকালো।—যাব্বাবা, ও রোগ তো ছেড়ে গিয়েছিল, দিব্যি টু-পাইস হচ্ছিল বিজনেসে।

—যাবি কিনা বল্।

দরখাস্তটা টাইপ করাতেই হবে। ছোটমেসো এর মধ্যে কি কাণ্ড করেছে কে জানে! যদি রিপোর্ট পৌঁছে গিয়ে থাকে তা হলে তো ফায়ার হয়ে আছে সব। দরখাস্তটা হাতে নিয়ে ঢুকলে, বাবাকে দেখালে তবু যদি একটু ঠাণ্ডা হয়।

টিকলু কালমেঘ-খাওয়া মুখ করে বললে, মেয়ে-টাইপিস্ট হলে একশোবার যেতাম, এক দরখাস্ত আমি সতেরো বার টাইপ করাতাম। কিন্তু দুটো বোকা বোকা টাইপের লোক বসে বসে খুটুস খুটুস করে টাইপ করবে, আমার মাইরি কোমর কন কন করে।

—সে কি রে টিকলু! সুজিত হেসে ফেললে, তোর মুখে তো জানতাম ন্যাকা-বোকা একা আসে না।

টিকলু হেসে বললে, অরুণের মত একটু পালিশ মারছি, ও নির্ঘাত পালিশ দেখিয়েই রুণুটাকে কব্জা করেছে।

অরুণ পা বাড়ালে।—আমাকে যেতেই হবে। দরখাস্তটা না করালে···

—অ্যাটাচি বিয়ে করতে বলছে বুঝি? চাকরি জোগাড় করতে হবে? টিকলু হাসলো।

সুজিত সিগারেটের তলানিটা দু'আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছটাক করে দূরের ফুটপাথের দিকে টিপ্ করে ছুঁড়ে দিলো। দিয়ে বললে, ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করলো না রে।

অরুণ বিরক্তির সঙ্গে বললে, আরে ধেস্, চাকুরির কথা কে

ভাবছে। বাড়ি এতক্ষণ ফুজিয়ামা হয়ে গেছে হয়তো, ধোঁয়া উগরোচ্ছে।

দরখাস্ত টাইপ করিয়ে একটু তাড়াতাড়িই ফিরলো অরুণ। বুকে তখন বেশ খানিকটা বেপরোয়া ভাব এসেছে, যা হবে হয়ে যাক্। না হয় রেগে গিয়ে বাপকে সেলাম করে দেবে, 'গুডবাই'য়ের মত মোক্ষম অস্ত্র থাকতে ভয় কিসের।

যেন কিছুই হয় নি, ছোটমেসো ওকে দেখে নি, এমন ভাব করে বাড়ি ঢুকলো। পড়ার ঘরটায় একবার উঁকি মেরে দেখলো মিলু আছে কিনা। থাকলে টেম্পারেচারটা আগে জেনে নিতো। কিন্তু না, মিলু নেই।

নিজের ঘরে যাবাব আগেই বারান্দার এক কোণে রান্নাঘর। দূর, ভয় ভয় ভাল লাগে না, যা হবাব এস্পার-ওস্পার একটা হয়ে যাক্।

অরুণ রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে চেঁচালো।—মা, টেরিফিক ক্ষিদে পেয়েছে, শীগগির খেতে দাও।

মা ফিরে না তাকিয়েই বললে, ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এলেন, বুলুকে বলগে যা জায়গা করতে। বলে এবার ফিরে তাকালো।—তোর হাতমুখ ধোয়া হতে হতে হয়ে যাবে।

আর দাঁড়ায়? চটপট নিজের ঘরটাতে এসে ঢুকলো। ঢুকেই দেখলে, দিদি ওরই টেবিলের সামনে বসে খুব এক মনে চিঠি লিখছে ওর কলম দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত হয়ে উঠলো অরুণ। এতবার বারণ করেছি। কেন বাবা, কর্তাকে চিঠি লিখছো, একটা কলম সে কিনে দিতে পারে নি! দেবে নিবটার বারোটা বাজিয়ে।

জামা ছাড়তে ছাড়তে একটু শব্দ করলো অরুণ, ইচ্ছে করেই। তারপর আড়চোখে একবার দিদির দিকে তাকালো। নাঃ, মনে

হচ্ছে পাস করে গেছে ও। মা কিছু বললো না, দিদি ঝাঁঝিয়ে উঠলো না এখনো···

তবু সাবধানের মার নেই। টাইপ করা দরখাস্তটা নিয়ে বাবার কাছে দাঁড়ালো।—ছ্যাখো তো, অ্যাপ্লিকেশনটা ঠিক আছে কিনা। এক বন্ধু বলছিল, কোন্ অফিসার ওখানে ওর চেনা আছে···

বাবা কোন কথা বললো না। দরখাস্তটা হাত থেকে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে বললে, কালকেই তা হ'লে পোস্ট করে দিস, ঠিক আছে।

অরুণ সবে এলো। বাবাব সামনে নেহাত বাধ্য না হলে ও যায় না, থাকতে ইচ্ছে হয় না হু'মিনিট।

নিজের ঘরে এসে দরখাস্তটা টেবিলের ওপর রেখে সবে খেতে বসতে যাবে, দিদি মা'র ডাক শুনে এতক্ষণে হয়তো খাবার জায়গা করতে গেছে, হঠাৎ পা টিপে টিপে মিলু ঘরে ঢুকলো ; এদিক-ওদিক দেখলো, তারপর অরুণের কাছে সরে এসে বললে, কি হয়েছে রে দাদা, ছোটমাসী ওদেব বলছিল ?

দেখতে দেখতে মহানিমের গাছটা পাতায় ভরে উঠেছে। তামাটে রঙের কচি কচি পাতাগুলো এখন ফিকে সবুজ। হাল্কা হাওয়ায় নিমের ঝালরগুলো যখন আরতির চামরের মত আস্তে আস্তে নড়ে, তখন সেদিকে ঠায় তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাড়াটা নোংরা, গলির শেষে একটা ডাস্টবিনের উপচে-পড়া আবর্জনায় গলিটা দুর্গন্ধে ভরে থাকে মাঝে মাঝে। জানালা থেকে বাইরে তাকালে কয়েকটা মরচে-পড়া টিনের শেড দেখা যায়, একটা ফ্ল্যাটের বারান্দায় ছেঁড়া নোংরা কাঁথা শুকোয়, দূরে একটা ছোট্ট মুদিখানা। চারপাশের বাড়িগুলোর গায়ে রঙ নেই, রোদে-জলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

কোথাও কোন রঙ নেই। রুণু ছাড়া কোথাও কোন রঙ নেই।

অথচ প্রেমট্রেম অরুণ আগে বিশ্বাসই করতো না। কেউ না, সুজিত টিকলু অরুণ—কেউ না।

সুজিত আজকাল বড় বেশী কুষ্ঠীতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছে আর দিনরাত শুধু ছক্ কাটছে। কোন্ ঘরে কোন্ গ্রহ মুখস্থ করে ফেলেছে। আবার মাঝে মাঝে নিজের হাত নিজেই দেখছে। শালা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে চেপে দিব্যি একটা ফেট লাইন বানিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। লাইনটা এমন স্পষ্ট যেন কেষ্টপুর ক্যানাল, একখানা গাধাবোট নামিয়ে ঠেলে দিলে স্যাটার্নে গিয়ে পৌঁছবে।

অরুণ শুনে হাসে।—আমাদের আবার ফেট।

—তুই সে-কথা বলিস না অরুণ, ফিউচার তো তোরই। সুজিত বলেছিল।

টিকলু হেসে বলেছিল, প্রেজেন্টও তোর, ফিউচারও তোর।

সব ঐ রুণুকে উদ্দেশ করে। অর্থাৎ যা পাওয়ার তা তো পেয়ে গেছিস।

সত্যি তো, এ বয়সে আর কি আকর্ষণ আছে, আর কি পেতে চায় অরুণ! সেদিক থেকে ও ভাগ্যবান। রুণুর কথা ভাবলে গর্বে ভরে ওঠে।

—তোর আবার ক্রেডিট কি রে, ক্রেডিট তোর কুষ্ঠীর। ও শালা যার ভাগ্যে যা আছে। একদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল সুজিত।

অরুণের এখন মাঝে মাঝে হাসি পায়। এদের বোঝাতে পারে না, বোঝাতে চায়ও'না যে প্রেম মানে একটা মেয়ে নয়। শরীরটরীর তার মধ্যে আছে, নানারকম ইচ্ছেটিচ্ছেও হয়, তবু অন্যরকম। ওরা এখনো সেই ষোল-সতেরো বছরের মন নিয়ে পড়ে আছে। তখন মেয়েদের দেখলেই কেমন একটু রঙিন রঙিন লাগতো। দু'একটার দিকে হাত বাড়াতেই উচ্চিংড়ের মত ছিটকে বেরিয়ে গেছে। একটা বোকা বোকা দাঁড়িয়ে থাকতো, কথা বলতো না। কিন্তু অরুণের নিজের মন ভরতো না।

—টিকলু একটা হারামি। সুজিত একবার টিকলুর ওপর রেগে গিয়ে অরুণকে বলেছিল।—ব্যাটা পিসতুতো···মাইরি সন্দেহ হয়।

অরুণ বিশ্বাস করে নি, তবু মজা পেয়েছিল।

সে-সব দিনের কথা ভেবে অরুণের নিজেরই এখন গা ঘিনঘিন করে।

সতেরো-আঠারোর জীবনটাকে এখন চ্যাংড়ামি মনে হয়। এখন ওরা একুশ। একুশ-বাইশ। এই ক'বছরে, আর কেউ না হোক, অরুণ অনেক বড় হয়ে গেছে। বদলে গেছে।

কিংবা রুণুই ওকে এখন একটু একটু করে বদলে দিচ্ছে।

—এইবার তোরটা বল্ শুনি। ঊর্মির তো সবই অদ্ভুত, একদিন নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি দুপুরে ফেরাজিনির এক কোণে গা এলিয়ে ওর নিজের প্রেমের গল্প বলেছিল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক উদাস উদাস দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ উড়ন্ত ঘুড়িটাকে ঝপাঝপ্ লাটাইয়ের কাছে গুটিয়ে এনেছিল, ভিজে ভিজে চোখের পাতাকে হাসিয়ে দিয়ে বলেছিল, ব্যস্, এই। এবার তোরটা বল্।

বাঃ রে বাঃ। এ যেন চাকরি পাওয়া। ইণ্টারভিউ হলো, কি নাম কোন্ সালে পাস করেছো, কাল থেকে আসবেন। প্রেম কি কাউকে বলার মত কাহিনী? কাউকে বোঝানোর মত?

অরুণ জানতোই না ও প্রেমে পড়ে যাবে। মনে মনে ওদের সকলেরই একটা ঘুমন্ত বাসনা ছিল একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবে, একটু ঘোরাঘুরি করবে, রেস্টুরেণ্টে বসবে। একটু ফাঁকা পেলে আদরটাদর করবে। এই অবধি।

কলেজের বিরাম ইচ্ছের সল্‌তেটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মেয়েলি মেয়েলি চেহারা ছিল তার, কলেজের সোশ্যালে একবার অভিনয় করে খুব হাততালি পেয়েছিল। স্যান্‌স্‌ক্রিট কলেজের সামনে গিয়ে বিরাম পায়চারী করতো, কোন কোন দিন সেই মেয়েটা। তখন নাম জানতো না।

ওরা ঐখানে দেখা করে এক একদিন কোথায় হারিয়ে যেত।

বিরাম লাস্ট বেঞ্চে বসে রসিয়ে রসিয়ে যা বলতো, ওরা গোগ্রাসে তাই গিলতো। আবার বিরামকে ক্ষ্যাপাতেও ছাড়তো না।

একদিন টিকলু খুব মজা করেছিল। বিরাম তখনো আসে নি, ও দেখলো মেয়েটি ফুটপাথে সাজানো পুরনো বই দেখার ভান করে অপেক্ষা করছে।

টিকলু বললে, দাঁড়া, বিরামটাকে আজ একটা কাঁচি মারবো।

বলে সটান মেয়েটির কাছে গিয়ে বললে, বিরাম আপনাকে আজ

চলে যেতে বললে, টি কে'র ক্লাশে প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

তারপর বিরামকে আধ ঘণ্টা ধরে পায়চারী করতে দেখে অরুণ, সুজিত, টিকলু দূরে দাঁড়িয়ে খুব হাসাহাসি করেছিল।

পরের দিন সব জানতে পেরে বিরাম ভীষণ রেগে গিয়েছিল।

টিকলু বলেছিল, একটা জুটিয়ে দাও না গুরু, তা হলে আর ডিস্টার্ব করবো না।

সে-সব ভাবলে নিজেকে বড় ছোট মনে হয় অরুণের। তখন প্রেম জিনিসটা কি তা সে বুঝতেই পারতো না। যে-কোন একটা ছেলের সঙ্গে কোন মেয়েকে দেখলেই হিংসে হতো। মনে হতো ছোটবেলার মত পকেটে একটা গুলতি থাকলে দূর থেকে ধাঁই করে একটা বসিয়ে দিতাম।

সুজিত বলেছিল, বিরামটা রোজ ভিক্টোরিয়ায় যায়।

টিকলু বললে, চল্ ওটাকে আজ পাংচার করে দিয়ে আসি।

ওরা তিনজনে হাসতে হাসতে মজা দেখার জন্যে বাসে লাফিয়ে উঠলো। ভিক্টোরিয়া মেমেরিয়ালে এসে জলের ধারে একজোড়াকে দেখে টিকলু বললে, মেয়েগুলো মাইরি ভারী বোকা। দ্যাখ্ দ্যাখ্, ছেলেটা হুইল গোটাচ্ছে, মেয়েটা বুঝতেই পারছে না।

অরুণ তাকিয়ে দেখে হেসে ফেললো। মেয়েটার জন্যে ওর মায়া হলো। মনে হলো ছেলেটা ঐ মেয়েটার একটুও যোগ্য নয়। ওর মনে হলো ছেলেটা গদগদ হয়ে অভিনয় করছে। তুলনায় ওর নিজেকে খুব সৎ আর ভাল মনে হলো। ভাবলো, আমি কোন মেয়েকে পেলে মিথ্যে কথার প্যাঁচ কষবো না। আমি সত্যি সত্যি ভালবাসবো।

টিকলু ওদের সকলকে বিরক্ত করতে করতে টিপ্পনি কাটতে কাটতে, কখনো অশ্লীল অট্টহাসের আওয়াজ তুলে ভিতরের জ্বালাটা জুড়োবার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ 'ইয়াল্লালা' বলে চিৎকার করে উঠে থেমে পড়লো।—শালা এক সঙ্গে ছুটো? কি লাক্ মাইরি।

সেই প্রথম। বিরাম আর নন্দিনীর সামনে হাঁটু গুটিয়ে বসে রুণু হাসছিল আর কি বলছিল।

টিকলু চিরকেলে চ্যাংড়া, ঝট্ করে বিরামদের সামনে এগিয়ে গিয়ে নন্দিনীকে বললে, ম্যাডাম, ক্ষমা চাইতে এলাম।

বলে বসে পড়লো ঘাসের ওপব।

অরুণের তখন ভীষণ লজ্জা করছিল। নিজেকে একটা রক্‌বাজ ছোকরা মনে হচ্ছিল। তাদেব সঙ্গে তফাত কোথায়? সত্যি তো, কাবো সঙ্গে কাবো তফাত নেই। সার্টিফিকেট দেখিয়ে কিংবা স্যালারি বিল দেখিয়ে সবাই ভদ্রলোক হতে চায়। ব্যবহার দিয়ে নয়।

বিরাম খুব রেগে গিয়েছিল, তবু আলাপ করিয়ে দিলো।

আর অরুণ, একা অরুণ দু'হাত এক করে বললে, নমস্কার।

সুজিত বললে, চল্, গিয়ে একটু চা খাই।

ওরা সবাই এসে রেস্টুরেন্টের একটা টেবিল ঘিবে বসলো।

সুজিত যে এত স্মার্ট কথাবার্তা বলতে পাবে মেয়েদের সঙ্গে, অরুণ জানতো না। সুজিত মজার মজার কথা বলছিল, আব নন্দিনী খুব হাসছিল। রুণু টিকলুর মুখোমুখি বসেছিল, আর অরুণের ভয় হচ্ছিল টিকলু না টেবিলের তলায় পা দিয়ে রুণুর পায়ে চাপ দেয়। ওকে কোন বিশ্বাস নেই।

অরুণ চোখ ফিরিয়ে এক একবার রুণুকে দেখছিল।

এতকাল উর্মিকে ওর খুব সুন্দর মনে হতো। কিন্তু রুণুকে ওর কেমন যেন স্বপ্নের মত মিষ্টি লাগছিল। কেমন অস্পষ্ট মৃদু কুয়াশা, গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ, শবৎকালেব রোদ্দুরের মত দূরের স্বপ্ন যেন।

রুণু কোন কথা বলছিল না, অরুণ কোন কথা বলছিল না।

কিন্তু এলোমেলো কথা বলতে বলতে সুজিত কখন গণৎকার হয়ে উঠলো। ও বিরামের হাত দেখলো, নন্দিনীর হাত দেখলো, আর ও যখন হাত দেখার নাম করে ফ্ল্যাটারি করছিল, তখন রুণু ইলেকট্রিক স্পার্কের মত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু একটু মুচকি হাসছিল।

—আমার হাতটা দেখবেন না? একটু হেসে রুণুও তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

সুজিত রুণুর হাতটা ছুঁলো, আর অমনি অরুণের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো।

তারপর সারাক্ষণ বেহালার ছড় টানার মত একটা ব্যথা ওর পাঁজরে পাঁজরে ঘুরলো।

বিরাম বললে, এবার ওঠা যাক্।

রুণু এতক্ষণ ওর মেলে ধরা হাতের দুর্বোধ্য রেখাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। এবার ওর নামানো চোখ ঈষৎ তুলে এক পলকের জন্যে অরুণের মুখের দিকে তাকালো।

নন্দিনী বললে, আহা, বসো না আর একটু।

রুণু বললে, না রে। দেরী হয়ে যাবে।

অরুণের কেবল মনে হতে লাগলো, দেরী হয়ে যাবে, দেরী হয়ে যাবে। ওর তক্ষুনি তক্ষুনি কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করছিল। ওর ভয় হচ্ছিল, সুজিত কিংবা টিকলু আগেই রুণুকে কিছু একটা বলে ফেলবে। ওরা কেউ যদি বলে ফেলে তা হলে অরুণের তারা-ঝরা আকাশটা চৌকো জানালার মত ছোট্ট হয়ে যাবে।

ওরা খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। সুজিত খুব চটকদার কথা বলছিল। নন্দিনী হাসছিল। রুণু বোধ হয় কিছু ভাবছিল। টিকলুকে চোঙা প্যান্টে বড় কুৎসিত দেখাচ্ছিল।

অরুণ হাঁটতে হাঁটতে ঘাসের ওপর হালকা নীল আর গাঢ় নীলে

মেশামেশি একটা সুন্দর পালক দেখতে পেল। খুব সুন্দর কোন পাখির খুব সুন্দর একটা পালক।

অরুণ এতক্ষণ শুধু রুণুর মুখের দিকে তাকিয়েছে। শিশিরে ধোয়া সেই মুখটার দিকে। ও এতক্ষণে লক্ষ্য করলে, রুণু একটা নীল শাড়ি পরে আছে।

অরুণ ঘাসের ওপর থেকে পালকটা তুলে নিল, তারপর একটাও কথা না বলে পালকটা রুণুর দিকে এগিয়ে দিল।

রুণুর হাতে পালকটাকে আরো সুন্দর মনে হলো। রুণু পালকটা নিয়ে অরুণের মুখের দিকে আরেকবার তাকালো।

এসপ্লানেডের একটা নিওন-আলোর বিজ্ঞাপন জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে। অরুণ শুনতে পেল ওর হৃৎপিণ্ডও কথা বলছে। ওর মুখ আশায় নিরাশায় জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে।

সমস্ত ঘটনাটা কেমন যেন আকস্মিক মনে হয়। সেদিন যখন কুড়িয়ে পাওয়া একটা রঙিন পাখির সুন্দর নীল পালক রুণুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন অন্য কোন অসম্ভব কল্পনায় খুশী হয়ে উঠতে সাহস পায় নি।

এখন সব কথা বললে টিকলুরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না। কিংবা টিকলু হয়তো রেগে গিয়ে বলবে, শালা বেইমান!

সুজিত বলবে না কিছু, কিন্তু মনে মনে ভাববে, ওর হাতের মোয়া অরুণ ছোঁ মেরে নিয়ে নিয়েছে।

টিকলুকে সুজিতকে সব কথা বলবে কিনা ভাবলো অরুণ। টিকলুকেই ভয়। ও তো একটা রিয়েল ছোটলোক। যাচ্ছেতাই চেঁচামেচি করবে, কলেজসুদ্ধ সকলকে বলে বেড়াবে। ওকে কোন বিশ্বাস নেই। ইউনিয়নের ইলেকশনের সময় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে রীতিমতো মারপিট শুরু করে দিয়েছিল। অথচ পলিটিক্সের তুই কি বুঝিস? দলের পাণ্ডারা কেউ একটু ওর কাঁধে হাত দিয়ে তোয়াজ করলেই হলো, অমনি পার্টি পাল্টে ফেলবে।

এমন একটা আনন্দের খবর না বলেও তো শান্তি নেই। অরুণের ইচ্ছে হলো লাফাতে লাফাতে গিয়ে বলে, সুজিত কংগ্রাচুলেট কর, মেরে দিয়েছি।

কিন্তু সুজিতের সঙ্গে দেখা হতেই ওসব কিছুই বললো না, শুধু

সুখ-সুখ একটা হাসি ওর মুখে ছড়িয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে বললে, রুণুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলে হাসলো অরুণ।

কোথায়, কখন, কিভাবে—অনেকগুলো প্রশ্ন দেখা দিল সুজিতের চোখে।

—চল, চল, উর্মিকে বলতে হবে। সুজিত টেনে নিয়ে গেল।

—অনেকক্ষণ আমরা একা একা গল্প করলাম। অরুণ খুশীটা যেন চাপতে পারছে না এমন গলায় বললে।

সুজিত সশব্দে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলো অরুণের পিঠে। —সাবাস। উর্মির কাছে এবার আমাদের প্রেস্টিজ বেড়ে গেল। ও তো ভাবে আমরা জোটাতে পারি না।

কফি হাউসে এসে দেখলে উর্মির সঙ্গে সেই শুকনো কালো মেয়েটা—সোমা চ্যাটার্জি, হিস্ট্রির। আর টিকলু। সোমাকে ডেকে আনলেই সুজিতের সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে যায়। এক টেবিলে বসতে ইচ্ছে হয় না। 'নিজে প্রমিনেণ্ট হওয়ার জন্যে একটা দিন মাইরি উর্মি একটা সুন্দর চেহারার কাউকে আনলো না।'

সুজিত চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বসেই বললে, টিকলু, তুই ফর নাথিং স্বপ্ন দেখছিস, এদিকে অরুণ লটকে নিয়েছে, রুণুকে।

অরুণ কোন কথা বললো না, ওর মুখের হাসিটাও মিলিয়ে গেল। দু'চোখ বন্ধ করতে ইচ্ছে হলো অস্বস্তিতে। 'লটকে নিয়েছে।' যেন এর চেয়ে ভাল কোন কথা নেই।

অরুণের হঠাৎ মনে হলো, রুণুকে এরা অপবিত্র করে দিলো। অথচ মনে মনে ও রুণুকে একটা বিশুদ্ধতা দিতে চাইছিল।

উর্মি বাঁ হাতে ধরা স্যাণ্ডুইচে সবে একটা কামড় বসিয়েছিল, না চিবিয়েই ঢক করে খানিকটা জলের সঙ্গে সেটা গিলে ফেলে বললো, রুণু কে?

—আউটসাইডার।

—দেখতে কেমন?

সুজিত পাখির ডানার মত করে বাঁ চোখের ভুরু কাঁপালো। বললে, টপ।

উর্মি মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, ঈস্ অরুণ, আমার চেয়েও?

সুজিত বললে, তোর আজ ডিভ্যালুয়েশন হয়ে গেছে।

অরুণ একটু মুচকি হাসলো।—কি যে করিস না তোরা। আলাপ হয়েছে, ব্যস। সে তো সুজিত টিকলুর সঙ্গেও হয়েছে।

আসলে অরুণের একটু ভয় ভয় করছিল। এই হইচই, এই আলোচনা যদি বিরামের কানে যায়, যদি রুণুকে বিরাম ক্ষ্যাপাতে শুরু করে, কিংবা বলে, অরুণ তোমাকে নিয়ে সকলের সামনে চ্যাংড়ামি করেছে, তা হলে হয়তো···

টিকলু এতক্ষণ একটাও কথা বলে নি, অন্য দিকে তাকিয়েছিল।

উর্মি হঠাৎ হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে টিকলুর চিবুক ছুঁলো।—আহা, দ্যাখ দ্যাখ জিৎ, বেচারী একেবারে মনমরা হয়ে গেছে।

টিকলু হেসে ফেললো।—ও ব্যাটা রুণুকে জাহাজ দেখাবে, আর আমি বুঝি ফুর্তিতে টুইস্ট নাচবো?

—এই অসভ্য! উর্মি চোখের ইশারায় সোমার দিকে দেখালো। অর্থাৎ ওর সামনে এসব কথায় ওর আপত্তি।

টিকলু হেসে উঠলো।—তোরা মেয়েরা সব জিনিসে এত অসভ্যতা খুঁজে পাস। জাহাজ দেখানো খারাপ কিছু?

—নয়? উর্মি হেসে উঠলো।—কি, মানে কি?

সুজিত হেসে বললে, তোর ঐ কলেজ পালিয়ে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়তে যাওয়া।

উর্মি এমনভাবে হেসে উঠলো যেন কেউ ওকে কাতুকুতু দিয়েছে। হাসতে হাসতে বললে, বাপস্, ও বেচারার ওপরও জেলাসি? হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, আমি যেখানেই যাই আমি পবিত্র, আমি বিশুদ্ধ।

সোমা কালো আর শুকনো মুখ নিয়ে ফিকফিক করে হাসছিল

চোখ নামিয়ে। ওর আঙুলের প্রবালের আংটিটাই যেন বলে দিচ্ছিল ও প্রাণ খুলে হাসতে পারে না।

আমি পবিত্র, আমি বিশুদ্ধ।

সোমা উর্মির কথা শুনে এতক্ষণে আস্তে আস্তে বললে, ভেজাল প্রমাণে এক হাজার এক টাকা পুরস্কার, তাই না?

টিকলু সুযোগ খুঁজছিল। বললে, সে তো এস কে এম ছাড়া আর কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না।

উর্মি হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেই।

উর্মি হাসতে হাসতে বললে, আফটার অল একজন প্রফেসর। তার যদি একটু স্নেহটেহ, একটু বাৎসল্য···

সুজিত বললে, ঠিকই তো, একজিবিশনে যদি ঘাড়ে হাত রেখে একটু ছবি বোঝায়···

চাপা স্বভাব সরিয়ে সোমাও হেসে উঠলো।—বাৎসল্যই তো। ঝুপুরঝুপ বৃষ্টি, ছুটি চাইলাম সকলে, 'কি উর্মিলা, ক্লাস করবে, না ছুটি দিয়ে দেবো?' যেন উর্মিই ক্লাস।

উর্মি হেসে ফেলেই অসহায়ের মত ভান করলো।—অরুণ, তুই একটু ডিফেণ্ড কর আমাকে।

—অ্যাঁ? অরুণ একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। চমকে উঠলো।—কি বলছিলি? শুনি নি আমি।

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো ওকে অপ্রতিভ হতে দেখে।

সুজিত শুধু বললে, তোর বারোটা বেজে গেছে।

টিকলু বললে, অরুণটা লাকি। ওর এখন আর সময় কাটানোর প্রবলেম নেই।

অরুণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলে ভীষণ লজ্জা পেল। লজ্জা কাটানোর জন্যে বললে, যাঃ, অন্য কথা ভাবছিলাম।

—উড়ছিলি বল্, ফুরুর ফুরুর করে উড়ছিলি। সুজিত আবার ঠাট্টা করলে।

কুড়িয়ে পাওয়া সেই নীল পালকের মত, সেই নীল পালকের পাখির মত অরুণ এতক্ষণ সত্যিই মেঘে বাতাসে অল্প রোদ্দুরের আকাশে ফুরুর ফুরুর করে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

সবুজ ঘাস, গাছগাছালি, পুকুব, ঘুঘুব ডাক ইত্যাদি অনেক কিছু মেখে মোলায়েম হওয়া এক ধরনের শান্ত শ্রী আছে রুণুর মুখেচোখে, শরীবে। কিংবা অরুণই তা আবিষ্কাব কবেছে।

রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। রুণু মৃদু হেসে থেমে পড়লো, বললে, কলেজ থেকে। লাইব্রেরীয়ানশিপ পড়ছি।

—চলুন চলুন, কোথাও একটু বসা যাক্। যেন একটা সুযোগ এক্ষুনি হাত ছাড়া হয়ে যেতে পাবে এমনি তটস্থভাবে ও বললে।

আজকেই ধোপদুরস্ত শার্ট প্যাণ্ট ভাঙবে ভেবেছিল। বড় বোকামি হয়ে গেছে। নিজেব ক্রীজ নষ্ট হওয়া পোশাকের দিকে তাকিয়ে অরুণ ভাবলো।

রুণু হাতের ঘড়ি দেখলো।—পনেরো মিনিট, কেমন? হাসলো ও; বললে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

অরুণ একটু আহত বোধ করলো। মনে হলো, রুণু যেন ওকে উপেক্ষা করতে গিয়ে নেহাত নির্দয় হতে পারছে না।

একবার ইচ্ছে হলো বলে ওঠে, তা হলে থাক।

পারলো না। সেই প্রথম দেখা হওয়াব পর মাঝে মাঝেই ওর রুণুর কথা মনে পড়েছে। এক একবার বিরামের ওপর রাগ হয়েছে। কে জানে, ওই আড়াল করে রাখছে কিনা।

এমন কি বিরামকে সন্দেহও হয়েছে ওর। কে জানে বিরাম তলায় তলায় রুণুর সঙ্গেও খেলছে কিনা।

—বাইরেই বসি। রেস্টুরেন্টের খোলামেলা জায়গাটায়

খানকয়েক চেয়ার টেবিল। সেখানেই বসলো রুণু। কেবিন দেখিয়ে বললে, ওখানে দম বন্ধ হয়ে যায়।

অরুণের মনে হলো রুণু যেন ওকে বার বার অপমান করতে চাইছে। ওকে বিশ্বাস করছে না। রুণুর চোখে অরুণও যেন আরেকজন টিকলু।

কিন্তু তারপর গল্প করতে করতে, গল্প করতে করতে, গল্প করতে করতে ওরা দু'জনেরই—দু'জনের মন—কখন কাছে এসে গেল। অরুণ বুঝতে পারছিল পনেরো মিনিটের মেয়াদ অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। তবু পাছে সে-কথা রুণুর মনে পড়ে যায় সে-জন্যে ওর ভয় হচ্ছিল।

রুণু শুধু নিজের কথাই বলছিল।···বাঃ, ইচ্ছে তো আমারও হয়। কি করে আসবো বলুন, একটু দেরী হলে মামীমা এত ভাবেন, মামাতো বোনটা পড়তে বসে না···

নিজের সংসারের সমস্ত কথা রুণু অনর্গল বলে যাচ্ছিল। বাবা কি-ভাবে মফঃস্বলে থেকে সংসার চালায়। কাকারা আমার কলেজে পড়াই পছন্দ করে না, মামাবাবু ডাক্তারি করেন, নিয়ে এসে রেখেছেন। আমি একটা চাকরি পেলে সংসারের তবু কিছুটা···

রুণুকে খুব সহজ আর সরল মনে হচ্ছিল।

—আমি খুব হাসছিলাম বলে সেদিন আমাকে খুব খারাপ ভেবেছেন, তাই না?

রুণু হঠাৎ লাজুক হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো।

অরুণ বললে, রাগ হয়েছিল, সুজিত আপনার হাত ছুঁয়েছিল বলে।

—হিংসুটে!

অরুণ হেসে উঠলো।—আপনি অন্যের কথায় হাসলে আমার হিংসে হয়, সে কি আমার দোষ!

রুণু এবার আর হাসলো না।—আপনার দেয়া পালকটা আমি সকলকে দেখিয়েছি। খুব সুন্দর।

সকলকে দেখিয়েছি, সকলকে দেখিয়েছি। সকলকে দেখানোর জন্যে তো অরুণ কিছু দিতে যায় নি, কিছু বলতে যায় নি। ও অনেক খুশী হতো যদি রুণু বলতো, ওটা আমি কাউকে দেখাই নি।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবার অরুণের সঙ্গে রুণুর শরীরের ঈষৎ ছোঁয়া লাগলো। অরুণের ভাবতে ভালো লাগলো, প্রতিবারই ছোঁয়াটুকু অনিচ্ছাকৃত বা আকস্মিক নয়। ভাবতে ভাল লাগলো, রুণুর একটুখানি প্রশ্রয় আছে।

অরুণের আবার মনে হলো, আমি এখনই কিছু বলে ফেলি, এখনই কিছু বলে ফেলি। আমাদের সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই, কোন পারম্পর্য নেই। চোখের সামনে কিছু পড়ে থাকলে তখনি তখনি কুড়িয়ে নিতে হবে। তা না হলে এই তাড়াহুড়োর মধ্যে এই ভিড়ের মধ্যে সব হারিয়ে যাবে।

ছাড়াছাড়ির আগে অরুণ বললে, কেন জানি না, আপনার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতে বেশ ভাল লাগে। এতক্ষণ বসেছিলাম একসঙ্গে, ভীষণ ভাল লাগলো।

রুণু একটু লাজুক হয়ে চোখ নামালো।

অরুণ বুঝতে পারলো না ওর এই পাগলের উচ্ছ্বাস শুনে রুণু ভিতরে ভিতরে রেগে গেছে কিনা। নাকি মুখ নীচু করে হাসি চাপছে।

ও তাই তাড়াতাড়ি বললে, ওর গলাটা হয়তো অভিমানে ভারী হয়ে গিয়েছিল, বললে, আপত্তি থাকলে অবশ্য···

রুণু কোন কথা বললে না, রুণু অরুণের মুখের দিকে ফিরে তাকালো না, শুধু অস্ফুটে বললে, কাল। এ সময়েই।

বলে বাসের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ব্যস আর কিছু না। 'কাল, এ সময়েই।'

গলি থেকে দেখা আকাশী রঙের ফিতেটা বিরাট একটা আকাশ হয়ে গেল। সুজিত বলেছিল, আমাদের কোথাও কোন রঙ নেই।

সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। অরুণ রঙের মধ্যে ডুবে গেল। মহানিমের গাছটা সুন্দর হয়ে উঠলো, চোখ ঠাণ্ডা করার মত আরো সবুজ, আরো সবুজ। ট্রামের আওয়াজটা বেশ মিষ্টি লাগলো। দূরে কোথায় দু' দুটো দমকল ছুটে গেল ঘন্টি বাজিয়ে। শব্দটা যেন ওর শরীরের মধ্যের উত্তেজনার প্রতিধ্বনি হয়ে উঠলো। ও নিজেও যেন একটা দমকল হয়ে গেছে, ছুটছে ছুটছে।

অথচ সুজিত আর টিকলু কিছু বুঝতে পারছে না। ওরা ভাবছে, প্রেম একটা ঠাট্টার জিনিস।

আশ্চর্য, অরুণ নিজেও কিছু বোঝাতে পারছে না। বলতে ইচ্ছেও হচ্ছে না। সহজ আর সুন্দর কথাগুলো বলতে ইচ্ছে হয় না। গোপন করতে ইচ্ছে করে। কিংবা সব কথা হয়তো বলা যায় না।

সেই সময়ে রুণুর সঙ্গে যদি ওকে দেখতে পেত ছোটমেসো ? অরুণ কেয়ারই করতো না। ও তখন একদম বেপরোয়া। বাড়ির লোক দেখে দেখবে, কি আছে তাতে।

আসলে রুণুর ভয় ভাঙাতে গিয়েই ও নিজে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

—আরে পাগল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বললাম, কি বড়জোর চায়েব দোকানে বসলাম, কেউ দেখলে তবু অজুহাত দেয়া যায়। রুণু ওর পাগলামি দেখে হেসেছিল।—পার্কেটার্কে ওসব দিকে দেখলে কি বলবো শুনি ?

ভয় না দুষ্টুমি, অরুণ বুঝতে পারতো না।

অথচ মজা দ্যাখো, রুণুব সঙ্গে তো সিনেমা দেখেছে, কিন্তু কারো চোখে পড়ে নি। চোখ পড়লো কিনা ঊর্মির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে।

—বেঁচে আছি না বেঁচে আছি, জুতোব মধ্যে বালি ঢুকলে মাইরি হাঁটতে ভাল লাগে ? টিকলু একদিন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে এসে মুখ তেতো করে বলেছিল।

মিথ্যে বলে নি। কিচকিচ কিচকিচ করে লাগছে চামড়ায়, পা ফেলতে গেলেই। সমস্ত বাড়িটার চোখে ও যেন এখন অপরাধী হয়ে গেছে। একটা ক্রিমিন্যাল। বাবা যদি ধমক দিতো, মা চেঁচামেচি করতো, তা হলে বরং শান্তি ছিল। দুটো কথা বলতে পারতো। তা নয়, সব চুপচাপ। যেন কিছুই হয়নি, ছোটমাসী এসে কিছুই শুনিয়ে যায় নি।

আর ঐ দিদিটা। চার বছরের বড়, অথচ ভাব দেখায় ও যেন মা'র সমবয়সী। সব সময় লম্বা লম্বা উপদেশ।

—মা কত দুঃখ করছিল। জ্বর হচ্ছে আবার, মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ছে, তুই একটু খোঁজখবর নিতে তো পারিস।

অরুণের ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে মাকে। পাছে মা ভাবে ছোটমেসোর কাছে ধরা পড়েছে বলে ও ফ্ল্যাটারি করতে এসেছে, তাই জিজ্ঞেস করতে পারে নি। কিন্তু দিদির কাছে কথাটা শুনে ক্ষেপে গেল।—যা যা, তোকে আর অ্যাডভাইস দিতে হবে না।

ওর যে জলহস্তী নাম দিয়েছে, একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। দিনরাত শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। দিব্যি খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে আর ফুলছে। ঘুমোনোর সময় আবার ঘঙর ঘং করে নাক ডাকায়। চেহারায় কথাবার্তায় কোথাও একটু শ্রীছাঁদ নেই। গেঁয়ো বউ যেন রথের মেলায় চাকি বেলুনি কিনতে এসেছে। রাবিশ। অক্ষয়দা আবার ওকে নাকি দেখতে এসে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। ভাবলে হাসি পায় অরুণের, অক্ষয়দা ওর মধ্যে কি যে দেখেছিল ঈশ্বর জানেন। কিংবা টাকাটাই দেখেছিল হয়তো, নেহাত কম খসায় নি তো বিয়েতে। কন্যাদায় কিন্তু রয়েই গেছে। অক্ষয়দার বদলির চাকরি, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বাসাটাসা ঠিক করার আগে দু'চার মাস ঠেলে দেবে এখানে। বসার ঘরখানা তখন দিদির এক্তিয়ারে, একটা বন্ধুবান্ধব এলে বসতে বলার উপায় নেই এমন নোংরা করে রাখবে। অবশ্য তার জন্যে বাবাও দায়ী। নিজে তখন মফঃস্বলে থাকে, কম মাইনে, কলেজ ছিল না, মেয়েকে দূরে পাঠানোয় আপত্তি ছিল। ছোটবেলাতেই ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে বাবা।

আর ঐ এক চীজ তৈরি হচ্ছে—মিলু। আদরে আদরে মাথাটি খেয়ে বসে আছে সব। আরে উর্মিকে যা মানায় তোকেও তাই মানাবে নাকি। তুই একটা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আঠারো বছর বয়েস, স্লীভলেস ব্লাউজ পরছে, পেটের কাছে এক বিঘৎ বে-আব্রু। সুজিত কিংবা টিকলু এলে ওর নিজেরই লজ্জা করে। ওরা কি বলাবলি করে কে জানে। তবে মিলু দিদির মত যে হয় নি সেও ভাল।

মিলু অবশ্য বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে শিখেছে। মনটাও বেশ খোলামেলা। সব কথা অরুণকে বলে। ফাজিল তো কম নয়।

একদিন ওর কলেজের বন্ধু ক'টা মেয়ে এসেছিল। টানতে টানতে অরুণকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলো।—আমার দাদা। দাদা কিন্তু, জানিস টুলু, আমার বন্ধু। ওকে আমি স—ব বলি। বলেই মিলু হেসে উঠলো।

—সেই কথা বলেছিস? চোখের ঈশারায় টুলু মেয়েটা কি যেন বললো।

আর মিলু হেসে গড়িয়ে পড়লো।—এই দাদা, বলা হয় নি তোকে। আমরা না খুব একটা মজা করেছি সেদিন।

ওদের কাণ্ড দেখে অরুণও হেসে ফেলেছিল।—কি করেছিস?

—দুপুর বেলায় ওদের বাড়ি গিয়ে, কি করি কি করি, টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে না···হেসে গড়িয়ে পড়লো মিলু।

—হেসেই অস্থির। টুলুও হেসে ফেললো, তারপর।—আমি বলছি, আমি বলছি। এক একটা নাম দেখে না আমরা ফোন করি, নাম নম্বর তো সত্যি সত্যি জানাই না, গল্প করি তাদের সঙ্গে। আর নাম ঠিকানা জানার জন্যে, দেখা করার জন্যে সে যে কি আকুল হয়ে পড়ে বুড়ো বুড়ো লোকগুলো···

বোঝো ব্যাপার। তখন ওর বন্ধুদের সামনে না হেসেও পারে নি ও। কিন্তু মিলুর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে ভিতরে ভিতরে। ওর এ সবের মধ্যে থাকার কি দরকার। যত সব নোংরা কাণ্ডকারখানা, যদি কেউ কোনদিন জানতে পারে।

তবু কড়া করে কিছু বলতেও পারে নি। বাড়িসুদ্ধ সবাই তো অরুণের বিরুদ্ধে। ওকে কেউ বুঝতে চায় না, বুঝতে চেষ্টা করে না। শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। মিলুটাই ওকে একটু একটু বোঝে, ওর জন্যে একটু মায়ামমতা একমাত্র মিলুরই তো আছে। ওকে চটিয়ে

রাখলে তো জানতেই পারতো না ছোটমাসী এসেছিল, কি সব বলে গেছে ওর সম্পর্কে।

কি বলে গেছে তা বুঝতেই পারছে, কিন্তু তারপর মা-বাবা কিছু আর এ ক'দিনে বলাবলি করেছে কিনা কে জানে।

মিলুকে জিজ্ঞেস করার জন্যেই ওর পড়ার ঘরে ঢুকেছিল অরুণ। কিন্তু ওর পায়েব শব্দ পেয়েই মিলু ঝট্ করে কি লুকিয়ে ফেললো। কিছু লিখছিল বোধ হয়। প্রেমপত্রটত্র নয় তো?

কাগজটা লুকিয়ে ফেলেই মিলু উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে মুখ ঘোরালো।—এই দাদা। একটু চাপা গলায় বললে, তোর গিলোটিন হয়ে গেছে।

—মানে? ভয়ে আঁতকে উঠলো অরুণ।

—হেভী দায়িত্ব পড়েছে তোব কাঁধে।

এ বাড়িতে দায়িত্ব ঘাড়ে নেবাব জন্যেই অরুণ জন্মেছে। অধিকার নেই এতটুকু, শুধু দায়িত্ব! বাবা মা'র মন জুগিয়ে চলো, তাদের হুকুম মেনে চলো। নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে স্পষ্ট করে বলতে পাবে না। আমরা কি বড় হই নি নাকি। যেন কিছুই বুঝি না, সব সময় ওদের ভয়, একটা ফল্‌স্ মেয়ের প্রেমে পড়ে যাবো। কণুর মত একটা মেয়ে এ বাড়িতে এলে বর্তে যাবে। ধোঁয়ায় আর ঝুলে কালো হওয়া দেওয়ালগুলো তখন দেখবে হোয়াইটওয়াস মনে হবে। আরে দূব, হোয়াইটওয়াস আর হবে নাকি। ইলেকট্রিক ওয়্যারিং সব মান্ধাতা আমলের, অনেককাল বদলানো হয়নি, একটু কিছু হলেই ফিউজ হয়ে যায়। কোথায় শর্ট আছে, ফিউজের তার বদলেও লাভ হয় না। ছোটো, শালা ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী যোগাড় করতে।

—মিস্ত্রীটিস্ত্রী হলেও কাজ হতো রে। সুজিতকে বলেছিল একদিন।—পাঁচবার ডাকলে তবে আসবে, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার ঘুরিয়ে দিয়েই ঝটাং করে ছুটো টাকা দাও।

—আর কি রোয়াব। টিকলুর রাগ তো আরো বেশী।—তুই

রুণুকে নিয়ে এক টাকা পঞ্চাশেই ফ্ল্যাট, ওরা তিন টাকার টিকিট ঝপ্ করে কেটে নেবে।

সুজিত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, যা বলেছিস। আমরা হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে মরছি।

চাকরির কথা ছাড়া সুজিতটা আর কিছু যেন বলতে জানে না। শুনলেই অরুণের নিজেকে কেমন অসহায় অসহায় লাগে। মা একদিন বলেছিল, নবনীবাবুর ছেলেটা রত্ন। যেমন ভদ্র, তেমনি ভাল, চাকরিও করছে, সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনে। মা হয়তো এমনিই বলেছিল, কিন্তু শুনে অরুণের ইচ্ছে হয়েছিল হামানদিস্তে দিয়ে নিজেকে থেঁতলে দেয়। সব ব্যাটাই রত্ন, মা যাকে যেখানে দেখে, সবাই ভাল, শুধু অরুণ একাই যেন খারাপ। ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে নিজের ওপর ঘেন্না হয়ে গেছে। হয়তো মা'র ওপরও।

সুজিতের কথা শুনে সেই রাগটা উপচে পড়লো। কেন, বিনা মাইনের চাকরি তো লেগেই আছে, বাড়ির ওয়্যারিং বদলাবো না— মিস্ত্রীর তোয়াজ করো, প্রিমিয়াম দেবো দেরীতে, লিফটম্যান থেকে কাউন্টার অবধি স্মাইল দাও।

ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এর জন্যে যত না রাগ, মিস্ত্রীদের তোয়াজ করতে হয় বলে অরুণের রাগ আরো বেশী। পার্টিগুলো আবার ওদেরই মাথায় তুলে নাচে। নাচুক, ন' মাসেই তো তোমাদের মেগার টেস্ট হয়ে গেল বাওয়া।

—ঠিক বলেছিস। টিকলু হেসেছিল।—মেগার টেস্টে সব ধরা পড়ে গেছে, লাইন বিলকুল শর্টসার্কিট।

সুজিত আপত্তি করলো।—শূলে চড়িয়ে শাস্তি দেবার জন্যে ডেকেছিলাম, তার আবার জাত জেনে কি হবে।

চুলোয় যাক্ পলিটিক্স, ওসব নিয়ে অরুণের মাথাব্যথা নেই। আসলে ঝুটঝামেলা ওর ভাল লাগে না। বাবাকে কতবার বলেছে,

ওয়্যারিং বদলে নিতে। তা নয়, বাবার সেই এক কথা।—ভাড়াটে বাড়ি, আজ আছি কাল নেই, কি হবে ওসব করে।

বাড়ি—বাড়ি, তার আবার ভাড়াটে না পৈতৃক। দেখতাম যদি জমিটমি কিনে একটা কিছু ব্যবস্থা করছো, বুঝতাম। থাকবো তো আমরাই, একটু নিশ্চিন্তে ভালভাবে থাকলে দোষ কি। মাও তেমনি। ক'টা পর্দা কেনার কথা বলেছিল অরুণ, বললে কিনা, এ বাড়িতে এত সাহেবিয়ানা করে কি হবে। বাল্‌ব্‌গুলো কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো লাগতো, ক'টা শেড্‌ কেনার কথা হলো, 'পরের বাড়িতে ওসব করে কি লাভ!'

সমস্ত গা রী রী করে ওঠে রাগে।

অসহায় ক্রোধে কান্না পেয়েছিল অরুণের।—জানিস মিলু, ওরা বাঁচতে জানে না। আরে এখনই যদি ভালভাবে না বাঁচলাম, বুড়ো হয়ে একটা বাড়ি সাজিয়ে জানালা দরজার ধুলো ঝেড়ে কি লাভ বল।

মিলু ওর কথায় সায় দিয়েছিল।—রিয়েলি। ওরা তো শুধু প্যাণ্ডোরাজ বক্স খুলছে। কি পাবে শেষ অবধি? হোপ। তার চেয়ে এখনই যদি একটু কিছু পাই, মন্দ কি।

অরুণের তাই মনে হয়। একটু একটু যদি পাই। টুকরো টুকরো করে যদি পাই। যেটুকু পেলাম সেটুকুই তো তৃপ্তি। রুণুকে তো ও একটু একটু পাচ্ছে, এখনই পাচ্ছে।

কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু অতৃপ্তি থেকে যায়।

রুণুর কথাগুলো মনে পড়ে গেল মিলুর কাছ থেকে দায়িত্বের আভাস পেয়েই।

রুণুর ঐ এক অদ্ভুত স্বভাব। দেখা করতে আসবে, কিন্তু এসে দু'দণ্ড কোথায় নিরিবিলিতে বসে গল্প করবে, তা না, কেবলই হাতের ঘড়িতে সময় দেখবে। ও যেন অরুণের কাছে আসে, চলে যাবার জন্যেই।

—ঘড়িটাই দেখছি আমার রাইভ্যাল। অরুণ হেসে বলেছিল, আমার দিকে একবারও তাকাও না, ওর মুখের দিকে মিনিটে মিনিটে।

রুণু হেসে ফেলেছিল—ঈস্, কি রাগ রে! আমার বুঝি বাড়িঘর নেই, ফিরতে হবে না?

অরুণ কি আর করবে, একটু অভিমান দেখিয়েছিল। আর রুণু চোখের পাতায় কি এক সহানুভূতির স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়ে বলেছিল, এই শোনো। পরশুদিন আমি অনেকক্ষণ থাকবো, দেখো, অনেকক্ষণ থাকবো।

সেই পরশুদিনের উজ্জ্বল সন্ধ্যাটাকে মা এভাবে পুরোনো ছেঁড়া পর্দাকে বিদেয় করার মত এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দেবে, অরুণ ভাবতেও পারে নি।

মিলুর কাছে সব খবর শুনে ভিতরে ভিতরে ও রাগে গরগর করছিল। ঠিক যে মুহূর্তে ওর জীবনের একটা দিন স্মরণীয় হয়ে উঠতে চাইছিল, সেই সময়েই কি বাধা না পড়লে চলতো না। দিদিটা একটা ন্যুইসেন্স। একটা ন্যুইসেন্স। যেন পাঁচদিন পরে গেলে চলবে না।

'হেভী দায়িত্ব' কথাটায় রাগের মধ্যেও হেসে ফেললো অরুণ। জলহস্তীকে কাঁধে নিয়ে যেতে হবে, হেভীই তো।

নিজের ঘরে ঢুকে ও সবে প্যাণ্ট ছেড়ে পাজামায় পা গলিয়েছে, মা এসে হাসি হাসি মুখে দাঁড়ালো। মা'র হাসি দেখে কিন্তু সারা শরীর জ্বলে উঠলো অরুণের।

সেদিকে না তাকিয়েও অরুণ লক্ষ্য করলো মা কপাল টিপছে বাঁ-হাত দিয়ে। অন্য সময় ও হয়তো বলতো, তোমার মাথার যন্ত্রণাটা আবার বেড়েছে নাকি? চলো তা হলে একদিন পি জি-তে—

কিন্তু না, সেরকম কিচ্ছু বলতে ইচ্ছে হলো না।

মা একটু অপেক্ষা করেই বললে, তোকে তো পরশু পাটনা যেতে হচ্ছে।

—কেন? সব জেনেও অরুণ প্রায় ক্ষ্যাপা কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠলো।

মা বললে, অক্ষয় ছুটি পায় নি, লিখেছে তোর সঙ্গে বুলুকে পাঠিয়ে দিতে। ও না গেলে···

—আমি পারবো না।

—সে কি রে! তুই ওকে না নিয়ে গেলে ও যাবে কার সঙ্গে? মা'র গলার স্বরে যেন অনুনয় ঢলে পড়লো।

অরুণ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, আমি পারবো না, পারবো না, পারবো না। আমার কোথাও যাওয়া চলবে না।

মা থমকে চুপ করে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। অবাক হয়ে তাকালো অরুণের মুখের দিকে। তারপর একটু একটু করে তিক্ত-বিরক্ত একটা ভাব ফুটে উঠলো মুখে।

অরুণ যতখানি চেঁচিয়ে বলেছিল কথাগুলো, তার চেয়েও জোরে চিৎকার করে উঠলো মা।—আমি জানতাম, তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস, একেবারে গোল্লায় গেছিস।

অরুণের কান্না পেল। উর্মির সঙ্গে একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছে বলে ও একেবারে গোল্লায় গেছে! স্পষ্ট করে তা বললেও তো পারতো মা, ও তা হলে জবাব দিতে পারতো একটা।

অক্ষয়কে নিয়ে এই এক ফ্যাসাদ। বদলির চাকরি তার, আজ এখানে কাল সেখানে। হুটপাট করে চলে যেতে হয় নতুন জায়গায়, যদ্দিন না বাসা যোগাড় হচ্ছে বুলুকে এখানেই পাঠিয়ে দেয়। কিংবা বুলু নিজেই হয়তো শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চায় না।

কনকলতা অবশ্য খুশী হন। তবু তো বড় মেয়ে মাঝে মাঝে এসে থাকতে পায় তাঁর কাছে। শুধু পরের ঘরে চলে গেছে বলেই এই অতিরিক্ত আদর নয়। কনকলতা দেখেছেন, তেমন ভাল বিয়ে দিতে না পারা সত্ত্বেও বুলুর কোন অভিযোগ নেই। বরং বাবা-মা'র ওপর একা বুলুরই খুব মায়া।

দিনকের দিন কনকলতার শরীর আরো খারাপ হচ্ছে। মাথায় একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা হয়, সন্ধ্যের দিকে একটু জ্বর-জ্বর। কাজকর্ম করেন বটে, রান্নাও নিজেই সামলান, কিন্তু বড় ক্লান্ত লাগে। ছেলেকে দোষ দিয়ে কি হবে, স্বামীও অর্ধেক সময় খবর নেয় না।

—রোগ চেপে রাখা তোমার স্বভাব। প্রকাশবাবু একদিন বলেছিলেন।

কনকলতা কোন উত্তর দেন নি। অভিমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল। রোগ চেপে রাখা তোমার স্বভাব। চেপে না রেখে কি করবেন, পাঁচ বছরের পোষা রোগ। প্রথম প্রথম তো ভেবেছিলেন চোখ খারাপ হয়েছে। চোখের ডাক্তারকে দেখানোও হয়েছিল। ওষুধপত্তরও খেয়ে দেখেছেন। কিছুতেই কিছু হয় নি। এর পর আর কি করবেন, প্রতিদিন শুধু নিজের রোগের কথা বলবেন? মানুষটা খেটেখুটে আসে, পাঁচরকম ঝঞ্ঝাট রয়েছে, তাকে দু'বেলা নিজের শরীরের কথা শোনাতে ভাল লাগে। না, তারই শুনতে ভাল

লাগবে। ইচ্ছে থাকলে নিজেই তো বড় ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করতো। বলতে হবে কেন।

বরং বুলুই মাঝে মাঝে বলেছে অরুণকে।—হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার দেখিয়ে আন না মাকে।

বুলু যে-ক'দিন থাকে, কনকলতার কাজকর্ম আদ্দেক কেড়ে নেয়। অনেক রাত্তির অবধি বসে বসে মাথা টিপে দেয়। দুপুরে মাদুর বিছিয়ে পাশে শুয়ে গল্প করে। বুলু না থাকলে তো কনকলতার নিজেকে মনে হয় সংসারের বাইরের লোক।

ঝামেলা শুধু বুলুকে পাঠানো নিয়ে। কখনো কখনো অক্ষয় নিজেই এসে নিয়ে যায়, বাসা ঠিক হলেই। পুরোনো বাসা থেকে মালপত্র নিয়ে নতুন জায়গায় নতুন বাসায় আবার সাজিয়েগুছিয়ে বসতে হয়। তখন বুলুর না গেলেও চলে না।

চিঠি পড়ে প্রকাশবাবু বলেছিলেন, তা হলে অরুণই ওকে নিয়ে যাক্। পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন তবু কাজ নেই। এরপর ইণ্টারভিউ-টিণ্টারভিউ যদি এসে পড়ে···

কনকলতা সেজন্যেই বলতে গিয়েছিলেন অরুণকে। দু'পাঁচদিন পরে পাঠানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অক্ষয় একেবারে দিনক্ষণ লিখে দিয়েছে, স্টেশনে থাকবে জানিয়েছে। তা ছাড়া জামাইকে একটু ভয়ও পান কনকলতা, যা রগচটা মানুষ!

রাগে গরগর করতে করতে ফিরে এলেন কনকলতা।—ছেলে তোমার জবাব দিয়ে দিয়েছে, যেতে পারবে না।

বুলু প্রকাশবাবুর কাছে বসেছিল। বললে, আমি জানতাম। আমাকে নিয়ে যেতে ওর যে লজ্জা করে, আমি তো আজকালকার মত ফ্যাশনদার নই।

প্রকাশবাবু কথাটায় একটু খোঁচা খেলেন। ভাবলেন, বড় মেয়েকে মফঃস্বলে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া বেশী দূর করাতে পারেন নি, তাই বোধ হয় বুলুর একটু বাপের বিরুদ্ধে অনুযোগ

আছে। তাই তার কথাটা কানে না তুলেই বললেন, কেন, যেতে পারবে না কেন?

—তুমিই জিজ্ঞেস করে ছ্যাখো। বলে মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় তক্তপোশের এক ধারে গিয়ে শুয়ে পড়লেন কনকলতা।

প্রকাশবাবু ডাকলেন, অরুণ!

অরুণ আসতেই বললেন, পরশুদিন বুলুকে পাটনায় পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। অক্ষয় ছুটি পাবে না এখন।

অরুণ মাথা নিচু করে বললে, দেখি।

বলেই সরে এলো তাঁর সামনে থেকে।

মুখে যদিও বললো 'দেখি', তবু মনে মনে বুঝতে পারলো এখন আর বাবার কথার নড়চড় করার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা অজুহাত দিতে পারতো তা হলেও কথা ছিল।

অরুণের নিজেকে বড় অসহায় লাগলো। অক্ষম রাগে নিজের দাঁত দিয়ে নিজেকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে হলো।

'অনেকক্ষণ থাকবো, অনেকক্ষণ থাকবো'। সেই মুহূর্তে অরুণ অহঙ্কারে টালার ট্যাঙ্কের মত উঁচু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরের দিন সকাল থেকেই একটা দুশ্চিন্তা ওর ঘাড়ে চেপে রইলো। রুণুকে খবর দেয়ারও উপায় নেই। ও আসবে, অপেক্ষা করবে, তারপর ফিরে যাবে। হয়তো ভুল বুঝবে, আর কোনদিনই দেখা করবে না অরুণের সঙ্গে। হয়তো ভাববে, অরুণ ঐ সুজিত আর টিকলুর মতই হাল্কা ধরনের ছেলে।

রুণুর ঠিকানা একবারই শুনেছিল ও, মনেও আছে। কিন্তু রুণুদের বাড়িটা কেমন? ঊর্মিদের মত কি? তাও জানে না অরুণ। জানলে একটা চিঠি অন্তত দিতে পারতো।

অরুণের একবার মনে হলো, টিকলুকে বলবে। ও তো সেই

সময়ে দেখা করে বলতে পারে অরুণ কেন যেতে পারে নি। কিন্তু না, মন চাইলো না।

টিকলু একদিন ইয়ার্কি করে বলেছিল, তু' একদিন প্রক্সি দিতে দে না মাইরি।

সুজিত হেসে বলেছিল, তা না দিস্, সঙ্গে নিয়ে যেতে তো পারিস।

অরুণ তবু এড়িয়ে গেছে।

ওদের ঐ ধরনের সস্তা ইয়ার্কি ওর ভাল লাগে না। ও চায় না রুণুকে নিয়ে কেউ কোন আলোচনা করে। রুণুকে ও ভালবেসে ফেলেছে, দারুণ ভালবেসে ফেলেছে। অরুণ তাই ওদের ইতর ঠাট্টাগুলো এখন আর সহ্য করতে পারে না।

—বিরামের ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে, ঘাবড়াস না অরুণ, তুই এগিয়ে যা। টিকলু একদিন বলেছিল।

শুনে ঠাস করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল ওর। খারাপ খারাপ, সব মেয়ে খারাপ তোদের কাছে। কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ থাকলেই, কিংবা কারো সঙ্গে দেখা গেলেই সে মেয়ে খারাপ।··· বিয়ের সময় তো সব মডার্ন মেয়ে চাইবি, তখন আর খারাপ নয়।

কে জানে, হয়তো ভিতরে ভিতরে রুণুর সম্পর্কে একটু অবিশ্বাসও আছে। মেয়েদের মন পাখির মত, এক ডাল থেকে আরেক ডালে যেতে কতক্ষণ। বিরাম না হোক, অন্য কেউ। অরুণের সব সময় ভয় হয়, রুণুকে না অন্য কারো সঙ্গে দেখে ফেলে টিকলু আর সুজিত। না, ও হিংসেয় জ্বলবে না। রুণুকে ও জেনেছে। কিন্তু ওদের কাছে ছোট হয়ে যাবে যে।

—দাদাবাবু, কে এক ভদ্দরনোক এয়েছে সঙ্গে মেয়েছেলে। সোনার মা হাজা-ধরা ভিজে হাত তার নোংরা শাড়িতে মুছতে মুছতে এসে বললে।

কে আবার এলো। ইস্কুলের বন্ধু সেই রণ্টু নাকি। হয়তো বউ নিয়ে এসেছে। এর আগেও একদিন এসেছিল। ব্যাটা গোঁফ ওঠার

আগে বিয়ে করে মোটা টাকা পেয়েছিল, দিব্যি ব্যবসা করছে পণের টাকায়। টাকা পিটছে তো, কথায় কথায় তাই অ্যাডভাইস দেয়।

হাওয়াই চটিটা খুঁজলো অরুণ, ঘরমোছার সময় কোথায় যে সরিয়ে রাখে সোনার মা! খুঁজে না পেলে এক একদিন ও চিৎকার করে ওঠে রাগে।

পায়ে চটি গলিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। তারই মধ্যে ভেবে নিলো কোথায় বসতে দেবে ওদের। জলহস্তী তো বাড়তি ঘরখানা বাজেয়াপ্ত করে বসে আসে। ও গেলেই বাঁচি। কিন্তু সুখে-স্বচ্ছন্দে যাবে নাকি, যাবার আগে একটু ট্রাব্‌ল্‌ না দিয়ে যাবে না।

—ঐ যে ভূত ছাড়ার আগে বলে না? গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে যাবে। অরুণ একবার হাসতে হাসতে মিলুকে বলেছিল।

—যাঃ, দাদা, তুই কি রে। মিলুও হেসে ফেলেছিল।—আফটার অল দিদি তো।

তা ঠিক। ওরও তো বাপ-মা। তবু, বিয়ে হয়েছে বলেই কেন যে ওকে বাইরের লোক মনে হয়। বাঃ রে, তা কেন। দিদির খটখটে কথাবার্তা, গেঁয়ো গেঁয়ো স্বভাবের জন্যেই অসহ্য লাগে। ও যদি মিলুর মত হতো, ভীষণ ভালবাসতো ও দিদিকে। কিংবা দিদি যদি ওকে ভালবাসতো। বোগাস্‌। বাবা মা'ই ভালবাসে না তো দিদি।

মিলুর পড়ার ঘরে একবার উঁকি দিলো। যাচ্চলে, বুড়ো মাস্টারটা পড়াচ্ছে মিলুকে। বি-এ পড়ছিস, এখনো মাস্টার।

বাইরের দরজার কাছে এসেই কিন্তু চমকে উঠলো অরুণ।

—একি, তোরা? ভাবতেই পারি নি।

বিরাম আর নন্দিনীকে দেখে তাই চমকে উঠলো। বোঝো এখন, মা তো জিজ্ঞেস করবে, কারা এসেছিল রে! কি বলবে? বিরামের লাভার? ওর একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

—কি খবর? চল্ চল্। বলে বেরিয়ে পড়ল অরুণ। কয়েক পা এগিয়ে গেল, ওরা পিছনে পিছনে আসছে কি না-আসছে না দেখেই। বাড়ির কাছ থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচে।

বিরাম আর নন্দিনী ভেবেছিল, ঘরে বসতে বলবে অরুণ। বাইরে এত মডার্ন, ঊর্মির সঙ্গে হইহুল্লোড় করে, তার বাড়িতে আসা যে বোকামি তা জানবে কি করে।

নন্দিনী বিশেষ করে প্রথম একটু অপ্রতিভ হয়েছিল।

গলির মোড় পার হয়ে এসে তবে মুখ খুললো অরুণ।—হঠাৎ এলি যে। চল একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।

আর কোথায় যাবে, চায়ের দোকানই তো এখন ড্রইং-রুম। বারান্দায় যদি বা বসার জায়গা থাকে তো প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। টিকলু ঠিকই বলে, পালিশ দিয়ে দিয়ে কথা সত্যি পোষায় না।

চায়ের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বিরাম বললে, চল্ কথা আছে।

গলার স্বর বা বলার ধরনটা এমনই যে অরুণ ঘাবড়ে গেল। রুণুর ব্যাপার নিয়ে নয় তো। চার্জ করতে আসে নি তো। হয়তো বলবে, তুই এত ছোটলোক অরুণ। হয়তো বলবে, রুণু আমার নিজের বোনের মত।

অরুণের বুক দুরুদুরু করছিল।

একটা কেবিনে ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসলো অরুণ।—বল্।

বলে নন্দিনীর মুখের দিকে এতক্ষণে তাকালো। নন্দিনীর মুখে-চোখে এমন একটা থমথমে ভাব ছিল যে, দেখেই অরুণের মনে হলো সাংঘাতিক কিছু।

বিরাম অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, নন্দিনী বাড়ি থেকে চলে এসেছে।

—সে কি!

একটা আতঙ্ক সরে গিয়ে আরেকটা আতঙ্ক ওর বুকে চেপে বসলো।

বিরাম আবার বললে, ফিরবে না বলছে। দু'চারদিন ওর থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

অরুণ যাকে বলে স্তম্ভিত। বিরামটা ভেবেছে কি? ওর বাড়িতে এনে রাখবে নন্দিনীকে এই তালে ছিল! পাগল নাকি! কিন্তু ওকে সাফ সাফ তো বলাও যাবে না। চটে গেলে, রুণু কি আর কিছু না বলেছে নন্দিনীকে, বাড়িতে বাবা-মাকে জানিয়ে দিতে পারে। তা অবশ্য করবে না, কিন্তু রেগে গিয়ে রুণুর কাছে ভাংচি দিতে কতক্ষণ। অরুণ একটা যাচ্ছেতাই, মদ খায়, ওসব জায়গায় যায়-টায়, কিংবা আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে—। উর্মিকেই হয়তো ওর সঙ্গে লেপটে দিলো।

সমস্ত দায়িত্ব ওর ঘাড়ে এসে পড়তে পারে যেন। নন্দিনীকে হেসে মিষ্টি করে ও বললে, কেন পাগলামি করছেন, বাড়ি ফিরে যান।

নন্দিনী এতক্ষণ হয়তো ভেবেছিল অরুণের কাছে কোন ভরসা পাবে।

—আপনাদের কাছে আমি উপদেশ চাই না। ও বাড়িতে আমি আর ফিরবো না।

বিরাম চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ বললে, তুই জানিস না অরুণ, ওর দাদা ওকে—

কথা শেষ না করে নন্দিনীর মুখের দিকে তাকালো বিরাম। বোধ হয় বলবে কিনা জানতে চাইলো।

নন্দিনীর চোখের তারায় একটা ফণা তোলা সাপের ছায়া দেখলো অরুণ। সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীর দু'চোখ জলে ভরে গেল।—দেখবেন? এই দেখুন। এক ঝটকায় শাড়ির প্রান্তটুকু কাঁধ থেকে সরিয়ে দিলো। স্লীভলেস ব্লাউজের নীচে ফর্সা ধবধবে হাতে কয়েকটা ছড়ে যাওয়া কালসিটে পড়া দাগ দেখতে পেল অরুণ, দেখতে পেয়ে শিউরে উঠলো।

—আমাকে জুতোয় করে মেরেছে দাদা। তবু আমাকে ফিরে যেতে বলেন ?

এতক্ষণ অরুণ ভাবছিল, যত বাজে ফ্যাসাদ, কাটাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু হঠাৎ ওর মনের মধ্যে, শরীরের মধ্যে কি এক ধরনের উত্তেজনা এলো। মনে হলো কিছু একটা করতেই হবে।

বিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকেই যেন বললে, প্রবলেম! কি করি বল তো।

—আমি তো কারো সমস্যা হতে চাই না। নন্দিনীর গলায় ঝাঁঝ দেখা দিলো। অরুণের মনে হলো ঝাঁঝটার মধ্যে প্রচণ্ড অভিমান রয়েছে।

বিরাম দমে গেল। অপ্রতিভভাবে বললে, না না, সে-কথা বলছি না।

ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনার কথা বললো বিরাম।—আমাদের মেলামেশার কথা ওর দাদা বোধ হয় টের পেয়েছিল, কথায় কথায় শাসন করতো নন্দিনীকে, তাড়াতাড়ি ফিরতে বলতো। কাল রাত্রে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল···সকালে উঠেই ওদের কথা কাটাকাটি হতে হতে···

—আমিও ছাড়ি নি, যা মুখে এসেছে বলেছি। নন্দিনী বেপরোয়াভাবে বললে।

অরুণ চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। কোন একটা উপায় ভেবে বের করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, আমি বলি কি, ফিরেই যান। ধরুন পুলিস কেসটেস যদি করে···

—আমি নাবালিকা নই। নন্দিনী ব্যাগ খুলে দেখালো।—সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি।

তারপর হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বললে, কিছু না পারি মরতে তো পারবো।

অরুণ এবার আরো ভয় পেল। সেটাকে লুকোবার জন্যে সশব্দে হেসে উঠে বললে, কি আজেবাজে ভাবছেন।

বিরামকে দেখে মনে হলো ও ভাবনায় ভেঙে পড়েছে।—সকাল-বেলাতেই জানিস অরুণ, হেঁটে হেঁটে আমার বাড়ি চলে এসেছে। কতখানি অপমানিত হলে···

—বাড়িতে? কথার পিঠে কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়ির কথা মনে পড়লো। 'মেয়েটা কে রে! ছেলেটা তোর সেই কলেজের বন্ধু না? কেন এসেছিল?' শালার ঝঞ্ঝাট কি একটা। রুণু আবার কোনদিন এমনি একটা কাণ্ড করে বসবে না তো। ধুত্তোর, ওসব প্রেমট্রেম করে কাজ নেই। বেফিকির ঝামেলা বাড়ানো।

—একটা হোটেলটোটেলে বরং···অরুণ কিছু একটা বলার জন্মেই যেন বললে।

—না না, ওসব জায়গায় আমার ভয় করে। নন্দিনী বলে উঠলো।

আর বিরাম উপুড় করা হাত উল্টে দিয়ে বললে, টাকা কোথায়?

অরুণ হাতের ঘড়িটা দেখলো। সিটি অফিস থেকে ট্রেনের টিকিট কেটে রাখতে হবে কালকের। দিদিকে পাটনা নিয়ে যেতে হবে। অথচ এদিকে সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছে না।

অরুণ চায়ের কাপটা সরিয়ে দিয়ে হিসেব করে পয়সা নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো।—চল্ টিকলুকে ডাকি। ওর এসব ব্যাপারে মাথা খুব সাফ।

টিকলু দাঁতে টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে এলো। খালি গা, পায়জামার দড়িটা হাঁটু অবধি ঝুলছে।

অরুণ চুম্বকে কাহিনীটুকু শুনিয়ে বললে, মোড়ের মাথায় ওরা দাঁড়িয়ে আছে, চট্ করে জামাটা গায়ে দিয়ে আয়।

এতক্ষণ তিন মাথা এক হয়েছিল, এবার চার মাথা এক হলো।

সব শুনে টিকলু হেসে উঠলো। যেন ইয়ার্কি-ঠাট্টার ব্যাপার। হাসতে হাসতে বললে, এই কথা। দারোগাবাবু ডিম খাবে, আমাকে সেজন্মে মুর্গী পুষতে হবে!

স্টুপিড। অরুণের সারা শরীর জ্বলে উঠলো। একটু আগে নন্দিনীর দু'চোখ জলে ভেসে উঠেছিল, মনে পড়লো। 'কিছু না পারি মরতে তো পারবো', কথাটা কানে বাজলো।

—টিকলু, এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার। অরুণ বললে।

আর টিকলু হেসে উঠে বললে, আরে দূর, এ তো সোডার মত সিম্পল। সই মেরে বিয়ে কর, সিঁদুর কিনে আন দু' আনার, সিঁথিতে দিয়ে বাড়ি চলে যা। গিয়ে বল্, মা তোমার জন্যে দাসী আনলাম।

ঊর্মির কাছে কথাগুলো রিপিট করলো টিকলু, আর ঊর্মি হাসিতে ফেটে পড়লো। তারপর ব্যাগ খুলল চুরুর্‌র্ চুরুর্‌র্। জীপ-ফাসনার খুলে পাঁচটা পয়সা বের করে টিকলুকে দিল। কেউ একটা চটকদার মজার কথা বললেই পাঁচ পয়সা প্রাইজ দেওয়ার রীতি ওদের।

টিকলু বললে, পাঁচ পয়সায় হবে না জি-এফ, বেশি ছাড়তে হবে।

জি-এফ, অর্থাৎ গার্ল-ফ্রেণ্ড।

শেষ অবধি টিকলু সুধাদের বাড়িতে নন্দিনীর দিনকয়েক থাকার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু।—বিয়ে না করলে মাইরি ওসব হুজ্জোত পোয়াতে রাজী হচ্ছে না।

বিরাম বললে, বাঃ বিয়ে তো আমরা করবই। কিন্তু দু'চারদিন··· মানে রেজেস্ট্রি করতে হলে নোটিশ লাগবে, টাকা লাগবে।

টিকলু হেসে বললে, নোটিশ? ও-ও শালা টাকা।

বলে পকেট থেকে প্রেসের একটা বিল্ বের করলে। তাগাদায় যাবার জন্যে বাবার কাছ থেকে নিয়েছিল। আদায় করতে পারলে দু'পাঁচ টাকা মেরে দেবে ভেবে রেখেছিল।

পারলো না আদায় করতে।

শেষে ঊর্মিকে ফোন করলো পোস্ট-আপিস থেকে।—জরুরী দরকার, চলে আয় কফি হাউসে।

সুজিত বললে, ঊর্মি নিশ্চয় টাকা জোগাড় করতে পারবে।

টিকলু বললে, লোকটা কাল বিল্-এর টাকা না দিলে, ওরই

একদিন কি আমারই একদিন। কাল পরশুর মধ্যে বিয়েটা দিয়ে দিতেই হবে।

সারাদিন ওদের ছোটাছুটি আর আতঙ্কের মধ্যে কাটলো। এদিকে পুলিসের ভয়, কে জানে থানায় নন্দিনীর দাদা ডায়েরী করেছে কিনা।

অরুণ আর টিকলু যখন নন্দিনীকে রেখে এলো সুধাদের বাড়িতে, তখন অরুণের মনে হলো সারাদিনের অনিশ্চিত ছোটাছুটি আর সারাজীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেবে নন্দিনী কেমন যেন হয়ে গেছে। ওর চোখ যেন কিছু দেখছে না, ওর মন কিচ্ছু ভাবছে না। বোকা বোকা দেখাচ্ছিল নন্দিনীকে, চিন্তাভাবনাহীন জড়পদার্থের মত।

দেখে অরুণের ভীষণ কষ্ট হলো, মায়া হলো। আহা বেচারী।

অরুণের মনে হলো, একটা দিনের ঝড়ে তেজী মেয়েটা নিস্তেজ হয়ে গেছে একেবারে। অরুণের মনে হলো যে-জন্যে এত কাণ্ড, মেয়েটার মধ্যে সেই প্রেম মরে গেছে, একেবারে মরে গেছে।

ফিরে আসার পথে টিকলু বললে, বিরামটা মাইরি লাকি, দিব্যি সাপটেছে। আমার, সত্যি বলছি, তাকিয়ে লোভ হচ্ছিল।

—তুই কি বল তো? বিরক্তি আর ঘৃণায় অরুণ বললে।

কিন্তু একা বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ ওর চোখের সামনে সকালে দেখা নন্দিনীর শরীরটা ঈষৎ লোভ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই শাড়ি সরিয়ে নন্দিনী যখন বাহুর কালসিটের দাগ দেখিয়েছিল, স্লীভলেস ব্লাউজের আঁটসাঁট শরীর, উন্মুক্ত ফর্সা মসৃণ হাত, গলার নীচের অনেকখানি মুক্তাঙ্গন, সমস্ত জুড়ে একটা অদ্ভুত ভাল লাগা লোভ অরুণের মনেও উঁকি দিলো। এতক্ষণে।

কারণ এখন আর সেই সমস্যাটা সিন্দবাদের বুড়োটার মত ঘাড়ের ওপর চেপে বসে নেই।

গলির মুখেই একটা ছেলেদের ইস্কুল। দাদের মত গোল দঙ্গল পাকিয়ে বখাটে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে থাকে পকেটে হাত গুজে। রাস্তা দিয়ে মেয়েদের যাওয়ার উপায় নেই। রুণুর ছোটভাইটা বেঁচে থাকলে ওদেরই মত বয়েস হতো। দোষ করলে রুণু নিশ্চয় তাকে শাসন করতো। কিন্তু এদের কি শাসন করার মত কেউ নেই ?

বছর বছর ফেল মেরে দু'চারটে ছেলেব বেশ বয়েস হয়ে গেছে। কামানো গালে শিরীষ কাগজের মত কড়া দাড়ি। ছোটগুলোকে ওরাই নষ্ট করছে। মেয়েদের দেখে শিস্ দেয়, টিপ্পনি কাটে, অভব্য অঙ্গভঙ্গী করে। পাড়ার লোক হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করেছে, ফল হয় নি। হবে কি করে, মাস্টারদের আবার নিজেদের মধ্যে দলাদলি, ক্লিক বজায় রাখতে গিয়ে ছেলেগুলোকে কাজে লাগায়। যেতে আসতে কখনো মুখোমুখি পড়লে, রুণু দেখেছে, দু'চারজন মাস্টারের তাকানোটা বেশ খারাপ।

ছেলেগুলো পাজির পাঝাড়া।

একবার একটা কালোকুলো ভিখিরীর বাচ্চাকে লেলিয়ে দিয়েছিল। যা না, মা যাচ্ছে, জড়িয়ে ধর গিয়ে।

বাচ্চাটা সত্যি এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরেছিল নোংরা হাতে, 'মা' 'মা' বলে ভিক্ষে চেয়েছিল। কি অস্বস্তি, কি অস্বস্তি।

ইস্কুলের ওই বখাটে ছেলেগুলোকে ধরে চাবকাতে ইচ্ছে হয়।

দ্রুতপায়ে ঐটুকু পার হয়ে এসে রুণু একবার ভাবলে, নন্দিনীর কোন খবর পাওয়া গেছে কিনা খোঁজ নিয়ে যাবে। না, থাক্। খবর পেলে পরমদা নিজেই বলে যাবে নিশ্চয়।

আশ্চর্য ব্যাপার। নন্দিনী ওর এত বন্ধু, রুণুর কাছে খুব কম কথাই চেপে রাখতো, অথচ ও হঠাৎ এভাবে যে চলে গেল, একটা খবর পর্যন্ত দিলো না রুণুকে ?

মামীমার কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জা করছে কাল থেকে। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলি ? মামীমা কি ভাবছেন কে জানে। নিশ্চয় রুণুকেও খারাপ ভাবছেন। 'তোমারই তো বন্ধু।' সত্যি, নন্দিনীর জন্য লজ্জাও হচ্ছে, নন্দিনীর ওপর রাগও হচ্ছে। আচ্ছা, নন্দিনী রাগের মাথায় কিছু একটা করে বসবে না তো ? আত্মহত্যাটত্যা ?

পরমদা মামাবাবুর সঙ্গে কাল অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলেন নন্দিনী সম্পর্কে।

হতাশায় দুঃখে বলেছিলেন, তোমাকেও একটা কিছু জানিয়ে গেল না রুণু ? না কি জানো, বলতে বারণ করে গেছে।

দুঃখের মধ্যেও এ এক জ্বালা। সবাই হয়তো ভাবছে রুণু সব জানে। এত বন্ধু যখন, কিছু কি আর না বলে গেছে। আর নন্দিনীই বা কেমন মেয়ে। মা বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে মানুষ করেছেন, নিজের দাদা, তুই দোষ করেছিস বকুনি দিয়েছেন। তার জন্যে সব ছেড়ে চলে যাবি !

—দোষ আমারই। পরমদা মামাবাবুকে বলছিলেন, রুণু শুনেছে। বলছিলেন, বড় হয়েছে, কখন কি হয়, কখন কি করে বসে, ভয় হয় না ? বলুন ? তারপর মেয়েদের মত চোখ মুছতে মুছতে বললেন, প্রায়ই দেরি করে ফিরছিল, বকাঝকা করতাম। পাঁচ ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে, সকালে উঠেই ওর বউদি বললে, কাল রাত ন'টায় ফিরেছে। মেজাজ ঠিক রইলো না, গালাগালি দিয়ে ফেললাম।

রুণুর একবার মনে হলো পরমদা কিছু অন্যায় করেন নি। আবার ভাবলে, শুধু বকুনি দিলেন আর নন্দিনী রেগে চলে গেল ! তাও কি হয়। পরমদা ঠিক কি বলেছেন, কি করেছেন তা হয়তো

এখন আর বলতে পারছেন না। গালাগালি দিয়েছেন মানে? নোংরা কিছু? ছি ছি।

কিন্তু বিরামের কথাটা বলবে কিনা রুণু ভেবে ঠিক করতে পারলো না। এখন যদি ও বলে বিরামের সঙ্গে নন্দিনীর সম্পর্কটা ও জানতো, তা হলে মামাবাবু মামীমাও ছি ছি করবে। ভাববে রুণুও ওর মতই।

তা ছাড়া…

অরুণের সঙ্গে দেখা হলেও হয়তো নন্দিনীর খোঁজ পেতো।

কিন্তু অরুণ কেন যে এলো না রুণু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সব খবর জানে বলেই কি? হয়তো নন্দিনী দেখা করতে নিষেধ করেছে, কিংবা অরুণ নিজেই ভেবেছে দেখা হলে যদি জিজ্ঞেস করে নন্দিনীর কথা! বাঃ রে, ওকে বিশ্বাস করে বলতে পারবে না? ও কি পরমদাকে বলে দেবে নাকি?

বাড়ির নীচের তলায় মামাবাবুর ডাক্তারী চেম্বার। সকালের দিকে রুগী আসে দু' চারজন, এখন কয়েকটা কল্ থাকে, সেরে আসেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রুণু মামাবাবুর গলা শুনতে পেল। তা হলে আজ আর কল্ ছিল না বিশেষ, আরো দু'জন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন বারান্দায় বসে।

—মামীমা, পাঁউরুটি আছে? ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। দোতলায় উঠেই রুণু জিজ্ঞেস করলে।

বিকেলে এ-সময় ও দু পীস পাঁউরুটি আর চা খায়। আজ ফিরে আসার কথা ছিল না বলেই ভাবলে হয়তো রুটি আনানো হয় নি।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? ফাংশন এর মধ্যে শেষ হয়ে গেল? মামীমা জিজ্ঞেস করলেন।

রুণু হেসে বললে, না। ভাল লাগলো না, একদম বাজে।

বলে নিজের ঘরটিতে চলে গেল। ভাবলে, চোখের দিকে তাকিয়ে মামীমা হয়তো মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলবেন।

রুণুর অবশ্য পৃথক কোন ঘর নেই। মামাতো বোন দুটো ছোট, তারাও ওর ঘরে পড়ে। ওর সঙ্গেই শোয়। তবে রুণুর একটা ছোট্ট টেবিল আছে, পড়ার। আর টেবিলে চাবি দিয়ে রাখার মত একটা দেরাজ আছে।

কাপড় ছেড়ে একটা আটপৌরে চেক শাড়ি পরে মুখ হাত ধুয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলটার সামনে বসলো রুণু।

না, দেরাজটা এখন খুলবে না। মামীমা হয়তো নিজেই পাঁউরুটি চা দিয়ে যাবেন। এক একদিন তো বলেন, তোমাকে চা করতে হবে না, কলেজ থেকে ক্লান্ত হয়ে এলে, আমি করে দিচ্ছি।

মামীমাকে ভীষণ ভাল লাগে ওর। সত্যি, এত ভালমানুষ।

নিজের সংসার চলে টানাটানির মধ্যে, তবু তো রুণুকে নিয়ে এসে রেখেছেন, পড়ার খরচ যুগিয়ে চলেছেন।

বিছানায় একটু গড়িয়ে নিলো রুণু চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে। আজ ওর মন একটুও ভাল নেই। বার বার কেবল অরুণের কথা মনে পড়ছে।

মাঝে মাঝে অরুণের সঙ্গে দেখা করার তীব্র ইচ্ছা কেন যে হয়। প্রেম? আহা রে! প্রেম এত সস্তা নয়। অরুণের সঙ্গে কথা বলতে ওর অবশ্য বেশ লাগে, মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। ব্যস, প্রেমট্রেম ওসব শৌখীন জিনিস ওর জন্যে নয়। কিন্তু বেচারী অরুণ, হ্যাঁ অরুণ বোধ হয়···বাঃ, তা না হলে দেখা করার জন্যে, বেশীক্ষণ থাকার জন্যে এত ছটফট করে কেন? কই, প্রথম প্রথম তো সাদা-মাঠা পোশাক ছিল, এখন শার্টের ইস্ত্রী, প্যান্টের ক্রীজে এতটুকু খুঁত থাকে না। রুণুর জন্যে আর তো কেউ কখনো এমন করে নি।

কিন্তু অরুণ এলো না কেন, কিছুতেই বুঝতে পারছে না ও।

রুণু যেচে বলেছিল, আসবো, অনেকক্ষণ থাকবো, অনেকক্ষণ, সেই জন্যে কি ওর দাম কমে গেল অরুণের চোখে? না কি ওকে খারাপ ভাবলো? অরুণ ওকে খারাপ ভাবতে পারে ভেবে বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা লাগলো। তারপরই ভাবলে, দূর, ওসব কিছু না। নিশ্চয় কোন কাজে আটকে পড়েছে।

আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, অরুণ অন্য কাউকে ভালবাসে। ওর সঙ্গে শুধু খেলা করছে। হয়তো যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে, কিংবা অন্য কিছু। সেইজন্যে রুণুর কথা ভুলে গেছে।

বেশীক্ষণ থাকার জন্যে, অরুণকে আরো একটু খুশী করার জন্যে কত আগে থেকে মিথ্যে কথাটা বলে রাখলো।—কলেজে ফাংশন আছে, ফিরতে একটু দেরী হবে মামীমা।

মিথ্যে কথাটা কোন কাজেই লাগলো না। এত পরিপাটি করে সাজলো রুণু। অরুণ এলোই না।

ফিরে আসার সময় এত বিচ্ছিরি লাগছিল। রুণু মনে মনে ভাবলো, পরে যদি হ্যাংলামি করে, এমন জব্দ করবো! নেহাত অরুণ কষ্ট পায় বলেই না অনেকক্ষণ থাকার কথা দিয়েছিল।

ঝট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো রুণু।

কি করি কি করি, উঠে ব্যাগ থেকে দেরাজের চাবিটা বের করলো।

এই একটাই লুকোনো স্বর্গ আছে ওর। এই একটাই নেশা। চাবি লাগিয়ে দেরাজটা খুললো। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মন খুশীতে ভরে উঠলো।

অরুণ আসে নি তো কি হয়েছে। এই দেরাজটার মধ্যে ওর টুকরো টুকরো আনন্দ জড়ো হয়ে আছে। একটু একটু করে পাওয়া জীবনের অসংখ্য আনন্দের মুহূর্ত।

দেরাজটা টেনে খুললো রুণু।

অসংখ্য টুকরো টুকরো কাগজ, কত কি তুচ্ছ জিনিস। অথচ তার কোনটাই রুণুর কাছে তুচ্ছ নয়।

আঃ, রুণুর মন ফুর্তিতে ভরে উঠলো। রুণুর মন ছোট্ট এতটুকু সাত-আট-ন বছর হয়ে গেল। চাবির রিং একটা। তুলে নিয়ে সেটা আংটির মত করে আঙুলে পরলো। কুড়িয়ে পেয়েছিল। বোনার কাঁটা এক জোড়া, হাতির দাঁতের মত সাদা—ইস্কুলের নিভা-দিদিমণি দিয়েছিলেন। খুব ভালবাসতেন ওকে। একটা তারের ম্যাজিক, নিজেই কিনেছিল রথের মেলায়। সব, সব জমিয়ে রেখেছে রুণু এই দেরাজের মধ্যে।

কাগজগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে পরীক্ষা পাশ করার সার্টিফিকেট পেল। সেই প্রথম দুরন্ত আনন্দের দিন ওটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

একটা একটা করে সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো রুণু।

অনুরাধার দাদার সেই চিঠিটা কই? খুঁজে খুঁজে বের করলো, পড়লো, সারা মুখে একটা খুশীর হাসি ছড়িয়ে পড়লো। অনুরাধার হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছিল। পড়ে খুব রেগে গিয়েছিল ও, উত্তর দেয় নি। কিন্তু চিঠিটা ফেলে দিতেও পারে নি। রেখে দিয়েছিল। ভাল লেগেছিল। আবার পড়লো সেই লাইনটা—বিশ্রী হাতের লেখায়—তোমার চেয়ে সুন্দরী আমি দেখি নাই। ফিক্ করে হেসে ফেললো রুণু নিজের মনেই।

রুণুর যখনই মন খারাপ হয়, ফাঁকা ফাঁকা লাগে তখনই ও এই দেরাজটা খুলে বসে একটা একটা করে সুখের স্মৃতিকে স্পর্শ করে।

হঠাৎ অরুণকে ছুঁতে ইচ্ছে হলো ওর। তন্ন তন্ন করে খুঁজলো; কোথায় গেল সেই খামটা!

একটা ভীষণ জরুরী কিছু যেন হারিয়ে গেছে এমন অধৈর্য ভাবে ও খুঁজতে শুরু করলো।

পেয়ে গেল। নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে একটা সাদা খামের মধ্যে

নীল পালকটা রেখে দিয়েছিল ও। পালকটা বের করলো, মুগ্ধভাবে সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। মুখের ওপর পালকটা খুব হাল্কা ভাবে বুলিয়ে আবার খামের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিলো।

তারপর দেরাজটা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিলো।

এসে গড়িয়ে পড়লো আবার বিছানার ওপর।

অরুণের কথা ভাবতে ভাল লাগলো।

—ও সব নোবল প্রফেশন-ফ্রফেশন শুনতেই ভাল লাগে বোস। তোমার কথা কেউ ভাবে না, না রুগী না গাভমেণ্ট, তুমি শুধু সার্ভ করো। ওসব চলে না এখন আর।

—রুদ্র, তুমিই বুদ্ধিমান। পয়সা এখন গাইনোকলোজিতে। তাই না মহীতোষ?

—সৎপথের চেয়ে অসৎপথে। ডাক্তার সেনের গলা।

মামাবাবুদের কথা শুনতে পেল রুণু, ভাসা-ভাসা কথা। ওরা হো হো করে হেসে উঠলো।

কি আলোচনা! চাপা গলায় বললেও এক একদিন কানে আসে অস্পষ্ট ভাবে। বয়েস হয়েছে, কিন্তু রকবাজদের সঙ্গে তফাত কোথায়। মামাবাবুই যা ভদ্র।

অরুণ কিন্তু চমৎকার মানুষ। ভদ্র, আর কি ভাল।

চারটের সময় একদিন দেখা করার কথা ছিল, রুণুর খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল আসতে।

ও তাই জিজ্ঞেস করেছিল, কতক্ষণ এসেছেন?

রাস্তা পার হওয়ার আগে দূর থেকে ও অরুণকে দেখতে পেয়েছিল। কি হতাশ বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তার ছায়া মেখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল অরুণ।

দেখে হেসে ফেলেছিল ও, আবার ভিতরে ভিতরে ভালও লেগেছিল। নিজেকে সেদিন খুব দামী মনে হয়েছিল।

রুণুকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক খুশী ছড়িয়ে

পড়েছিল অরুণের মুখে চোখে, কিন্তু সেটা চট্ করে লুকিয়ে ফেলে, রাগ-রাগ ভাব করলো অরুণ।

—বড্ড দেরি হয়ে গেল। কতক্ষণ এসেছেন? ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে রুণু বললে।

অরুণ রাগ-রাগ স্বরে বললে, সাড়ে তিনটে।

—বাঃ রে, অত আগে আসার কি দরকার ছিল।

অরুণ হেসে ফেললে।—তুমি দশ পনেরো মিনিট আগেই যদি এসে পড়তে? একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগতো না তোমার!

শুনে বেশ ভাল লেগেছিল। দ্যাখো, অরুণ তা হলে শুধু নিজের কথাই ভাবে না, আমার দিকটাও বোঝে।

বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে চুপটি করে সেই সব কথা ভাবতে ভাল লাগছিল রুণুর।

—এই! 'তুমি' বলবো? হঠাৎ একদিন দুম্ করে বলে ফেললো অরুণ।

চমকে উঠেছিল ও।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই ঘাসের চত্বরে ওরা মুখোমুখি বসেছিল। জলের ধাবে ঠিক যে জায়গাটিতে বিবাম আর নন্দিনীর সঙ্গে প্রথম দিন বসেছিল, যেদিন টিকলুর অভদ্রতায় ওব মাথা ঝিমঝিম কবে উঠেছিল। অরুণকে সেদিনই বেশ ভদ্র মনে হয়েছিল, টিকলুর পাশে আবো।

—এই! 'তুমি' বলবো?

চমকে উঠেছিল রুণু, পরমুহূর্তেই ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল। ও হাঁটু মুড়ে বসেছিল, হাঁটুর ফাঁকে চিবুক রেখে। তক্ষুনি চোখ নামালো ঘাসের দিকে, একটা হাতে ঘাসের শিষ ছিঁড়লো, আর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। রুণুব মনে আছে লজ্জায় ও মুখ তুলতে পারে নি।

তারপর ওরা অনেকক্ষণ গল্প করেছিল, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিল 'আপনি' বলে বলে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, 'তুমি' বলতে অরুণের খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

ফেরার সময় অরুণ হঠাৎ বললে, দূর, আপনিই ভাল ছিল। এক পক্ষ আপনি বলবে, আর আমি শুধু···

রুণু হেসে ফেলেছিল। তারপর হাল্কা ভাবে বলেছিল, বাঃ রে, আমার তো 'আপনি'ই ভাল লাগে।

—কি হলো? রুণু অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথার গলায় বলে উঠেছিল। কারণ ওর কথায় অরুণের মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিল অরুণ, কিংবা প্রচণ্ড অপমান বোধ করেছিল। যেন রুণুর কথাটা আসলে প্রত্যাখ্যান।

অরুণ কোন কথা বললো না, গুম হয়ে রইলো। রাগ জ্বালা লজ্জা অনুশোচনা। রুণুর ইচ্ছে হলো ও বলে, মুখের কথাটা কিছু নয়, কিছু নয়। ওর ইচ্ছে হলো ওর হৃৎপিণ্ডটা তক্ষুনি ছিঁড়ে বের করে এনে অরুণকে দেখিয়ে দেয়।

আর মনে মনে বলেছিল, প্রজাপতিকে কখনো দু' আঙুলে টিপে ধরতে নেই। পাখা খসে গিয়ে সেটা আবার শুঁয়োপোকা হয়ে যায়।

তিনদিক থেকে তিনটে রাস্তা। পরস্পরকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে মাঝখানে ছোট্ট একটা ট্র্যাংগল বানিয়ে দিয়েছে। রেলিং-ঘেরা জায়গাটুকুতে মরা-মরা ঘাস ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেখানে কারা একটা সুন্দর ফোয়ারা বসিয়েছে। তিনপাশে রঙবেরঙের ফুলের গাছ, লাল নীল আলো ঝরছে ফোয়ারার জলে।

ঠিক তেমনি একটা হঠাৎ-সুখে হাউই হয়ে গেছে ওরা সবাই।

টিকলু, সুজিত আর উর্মি। বিরামও খুশী খুশী। প্রথম প্রথম ও প্রাণ খুলে হাসতে পারছিল না। উর্মি সান্ত্বনা দিয়েছে, ভাবছিস কেন, চাকরি একটা জুটে যাবেই। প্রফেসর সেনকে ধরলে···

তারপর থেকে বিরামও হাসতে পেরেছে। পারে নি শুধু নন্দিনী।

নন্দিনীর চোখ দুটো সেই যে কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছিল, ঠিক তেমনি আছে। কোন আনন্দ নেই, আশা নেই। মনে হচ্ছে, ওর চোখের দৃষ্টি থেকে সব প্রেম মুছে গেছে, মরে গেছে। বিয়ে তো হয়ে গেছে, সিঁথিতে ডগডগে করে সিঁদুর টানা, কপালে বড় একটা সিঁদুরের ফোঁটা। তবু নন্দিনী যেন একটা জড়পদার্থ।

উর্মি হঠাৎ বললে, জিৎ, অরুণটা থাকলে বেশ জমতো।

সুজিত হেসে বললে, বল না মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের জন্যে মন কেমন করছে। মেয়েদের তো বিয়ের চিঠি দেখলে হার্ট পালপিটেশন ডবল হয়ে যায়।

উর্মি হাসলো।—নিশ্চয়ই।···কিন্তু অরুণ থাকলে—

টিকলু বললে, ও এখন হয়তো পাটনাই মোরব্বা খাচ্ছে।

নন্দিনীর কানে যাচ্ছে না কোন কথা। ও স্থির বিষণ্ণ পুতুলের মত বসে আছে। চোখজোড়া যেন কাচের।

তারই ফাঁকে একবার ও বিরামের দিকে তাকালো। এমন একটা দৃষ্টিতে যা অপরের সঙ্গে যোগ সৃষ্টি করে না। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকানোর মত।

টিকলুর কিন্তু চোখে পড়লো।—কি মশাই, আড়ে আড়ে খুব যে শুভদৃষ্টি সেরে নিচ্ছেন। বলে নন্দিনীকে হাসাবার চেষ্টা করলো।

কান্নার মত হাসি নিয়ে নন্দিনীর ঠোঁট কাঁপলো একটু।

আসলে নন্দিনীর এই থমকে যাওয়া চেহারাটা টিকলু সহ্য করতে পারছিল না। যে কোন উপায়ে ও নন্দিনীকে হাসাতে চাইছিল।

টিকলু বললে, এই চল্, সবাই মিলে দক্ষিণেশ্বর যাই। সুধার অর্ডার, ওখানে গিয়ে নন্দিনীদের নামে পুজো দিতে হবে।

সকলেই হই হই করে উঠে পড়লো—সেই ভালো, হুল্লোড় করা যাবে।

শুধু নন্দিনী বিরামের গা ঘেঁষে যেতে যেতে ধীরে ধীরে বললে, রুণুকে একটা ফোন করলে হতো।

নন্দিনীর দাদার ওপর বিরাম তখনো প্রচণ্ড রেগে আছে। যেন এই ফ্যাসাদের জন্যে ওর দাদাই দায়ী। তাই নন্দিনীর তরফের সকলকেই ও অগ্রাহ্য করতে চায়। রুণুকেও।

নন্দিনী আবার মুখ তুলে বিরামের দিকে তাকালো।—ফোন করলে হতো।

ভিখিরি তাড়ানোর মত করে হাত নেড়ে বিরাম বলে উঠলো, নান্না।

নন্দিনীর চোখে একটুখানি আলো এসেছিল, সেটা নিবে গেল।

মন্দিরের দরজা খুলতে তখনো অনেক দেরি দেখে ওরা নিস্তব্ধ নির্জন গঙ্গার পাড় ধরে ধরে কিছু দূর অবধি হেঁটে গেল। তারপর একটা বাঁধানো ঘাটের ওপর এসে বসলো।

কাছেই দুটো নৌকো বাঁধা ছিল, কিন্তু কোথাও কোন লোক নেই।

উর্মি সুজিতের গা ঘেঁষে বসলো।

সুজিত উর্মিকে কনুইয়ের ঘা দিয়ে ইয়ার্কি করে বললে, চল্, চল্, নৌকোয় ঘুরে আসি তোর সঙ্গে। বহুদিনের ইচ্ছে, চল্ না, এই।

উর্মি হেসে বললে, কতদিন বেড়িয়েছি, মিষ্টি মিষ্টি কথা তো সব নৌকোতে বসেই শুনিয়েছিল। কি যে হয়ে গেল, জিৎ, তোদের আর মানুষ বলে মনেই হয় না।

টিকলুটা চ্যাংড়ার একশেষ। ও বললে, আমিও শোনাবো মাইরি। স্যাকারিন মিশিয়ে দেবো।

সব্বাই হো হো করে হেসে উঠলো।

হাসলো না শুধু নন্দিনী। ও তেমনি উদাস চোখে গঙ্গার ওপারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

দূরে কোথায় একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ হলো। বিরাম বললে, বোধ হয় দরজা খুলেছে।

সুজিত বললে, না না।

বিরাম তবু উঠে পড়লো। বললে, বোস তোরা, দেখে আসি।

কেউ কোন কথা বললে না। নন্দিনী তেমনি চুপ, গম্ভীর, পাথর।

হঠাৎ জীপ-ফাসনার খোলার চুরুক করে একটা শব্দ হলো এক সময়। আর সঙ্গে সঙ্গে টিকলু ফিরে তাকিয়ে দেখলে উর্মির ব্যাগ থেকে একখানা খাম নিয়ে সুজিত ছুটে পালাচ্ছে।

উর্মি সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে পিছনে ছুটলো।—জিৎ, ভাল হচ্ছে না, চিঠি ফেরত দে বলছি। জিৎ, শোন্…

কোথায় সুজিত। তখন চিঠিটা নিয়ে সুজিত ছুটেছে, পিছনে পিছনে উর্মি।

টিকলু ভেবেছিল ওরা এখনই ফিরে আসবে। কিন্তু এলো না। ও হঠাৎ আবিষ্কার করলো ও আর নন্দিনী একা। আর কেউ কোথাও নেই। চারিদিক নির্জন নিঃশব্দ।

—চলুন, আমরাও উঠি। টিকলু বললে। কিন্তু ওর সত্যি উঠে পড়ার ইচ্ছে ছিল না। নন্দিনীর কাছে নির্জনে বসে থাকতে থাকতে টিকলুর মনের মধ্যে সেই পুরোনো লোভটা জেগে উঠতে চাইছিল। লোভে আর ভয়ে ওর শরীরটা ভিতরে ভিতরে থরথর করে কাঁপছিল।

—চলুন। নিজেকে নিজেই ভয় পাচ্ছিল টিকলু, তাই আবার বলে উঠলো।

নন্দিনী তেমনি ভাবলেশহীন মুখে উঠে দাঁড়ালো।

ওরা পাশাপাশি হেঁটে চললো। একটা বিরাট শিরীষগাছের গুঁড়ি ওদের দু'জনকে যেন আড়াল করে রেখেছে।

হঠাৎ টিকলুর কি হলো কে জানে, ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নন্দিনীর মুখোমুখি। বললে, আপনাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে।

অর্থহীন চোখ তুলে তাকালো নন্দিনী। আর সেই মুহূর্তে, টিকলুর কি হলো কে জানে, ও নন্দিনীর হাতটা ধরতে গেল।

—এই, এই। চমকে উঠে টিকলুর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সশব্দে হেসে উঠলো নন্দিনী। খিলখিল করে হাসতে হাসতে, আঁচলে হাসি চাপতে চাপতে ও মন্দিরের দিকে ছুটে যাওয়ার মত করে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো।

টিকলু হাসতে পারলো না, লজ্জা করছে, ভীষণ লজ্জা করছে।

শেষ অবধি নন্দিনীর মুখেও হাসি ফুটলো, অথচ অরুণের যে এ ক'টা দিন কিভাবে কেটেছে!

অরুণ ফিরে এলো অনেক রাত্রে। সমস্ত শরীর ট্রেন-জার্নিতে ক্লান্ত, ক্লান্ত।

স্নান করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো, কিন্তু মন ছুটে যেতে চাইলো 'কোজি নুকে'। নন্দিনীদের খবর জানতে হবে। ওরা

হয়তো ভেবেছে কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামিয়ে দেবার জন্যেই অরুণ পালিয়েছে। অথচ ক্ষমতা থাকলে অরুণ ওদের এই বিপদের সময়ে এমন কোন উপকার করতো যা দিয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুটা শোধ করা যায়। হ্যাঁ, বিরাম আর নন্দিনীর কাছে ও কৃতজ্ঞ। ওরা না থাকলে রুণুর সঙ্গে ওর আলাপ হতো কি করে।

কিন্তু রুণুর সঙ্গে ও আবার যোগাযোগ করার কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটা বিরাম আর নন্দিনীর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেই হয়েছে মুশকিল। তা না হলে নন্দিনীকে ও জিজ্ঞেস করতে পারতো। কিন্তু রুণু লুকিয়ে রেখেছেই বা কেন? অরুণের তো ইচ্ছে হয় পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত লোককে বলে বেড়ায়। মাঝে মাঝে তাই সন্দেহ হয়, রুণুর কাছে এটা শুধু একটা খেলা।

—দুপুরে বাবা যখন খেতে যায় বাড়িতে, তখন তো লাইন ক্লিয়ার দিলেই পারিস। টিকলু বলেছিল।

সুজিত হেসে বলেছিল, খবর্দার। সুযোগ পেলে কোন্‌দিন ও ব্যাটাই টেলিফোনে ফস্টিনস্টি শুরু করবে।

টিকলুদের প্রেসে একটা টেলিফোন আছে। টিকলুর বাবা দুপুরে যখন খেতে যায় সে সময় সুযোগ বুঝে রুণু তো ফোন করতে পারে। অরুণ তাহলে ঘড়ি ধরে ওদের প্রেসে অপেক্ষা করতো। কিংবা সে সময় রুণু তো টিকলুকেও বলে দিতে পারে, কোথায় কখন অপেক্ষা করবে।

অরুণকে ও-কথা না বললেও চলতো। টিকলুকে ও একটুও বিশ্বাস করে না।

কিন্তু সে সব পরের কথা। সকালে উঠেই 'কোজি নুকে' যেতে ইচ্ছে হলো। কোলকাতা শহরটা এই ক'দিন যেন অরুণকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

মিলুকে চা করতে দেখে অরুণ বললে, কি ব্যাপার রে মিলু, তুই?

—কেন, আমি কি পারি না! মিলু হাসলো।

—চার চামচ চিনি দিস্, তোর হাতের চা তো এমনিতেই তেতো হবে।

মিলু কপট রাগ দেখালো।—চিনির যা দুর্ভিক্ষ, একটা মিষ্টি হাত যোগাড় করে আন না।

তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, এবার তো আনতেই হবে। জানিস্, মা'র কি হয়েছে ?

—কি হয়েছে ?

মিলু বললে, টেরিফিক জ্বর, তার ওপর মাথার যন্ত্রণা।

এবার রহস্যটা পরিষ্কার হলো। কাল রাতে ফিরে আসার পর মা দু'চারটে প্রশ্ন করেই চুপচাপ শুয়ে রইলো। অন্যদিন হলে এত অল্পে রেহাই পেত নাকি। উকিলের জেরা শুরু হতো। ট্রেনে জায়গা পেয়েছিলি ? স্টেশনের খাবার খেয়ে বুলুর শরীর খারাপ হয় নি তো ? বাসা পেয়েছে কেমন, ক'খানা ঘর ? অক্ষয় ভাল আছে তো ? পাড়ার লোক কেমন ? সদর দরজায় খিল দিলেই নিশ্চিন্ত, নাকি মই বেয়ে ঘরে ঢোকা যায় ? যা চোর ছ্যাঁচোরের উপদ্রব আজকাল। ইত্যাদি।

উত্তর দিতে দিতে বিরক্ত হতে হয়।

অরুণ ভাবলে একবার মা'র কাছে গিয়ে কেমন আছে জিজ্ঞেস করবে কিনা। একটু পাশে গিয়ে বসতে, কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু কোনদিন তো ওসব করে নি, তাই কেমন লজ্জা লজ্জা করলো। কে জানে, মা হয়তো বলে বসবে, যা যা, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

'তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না, তুই গোল্লায় গেছিস, তুই গোল্লায় গেছিস।' কথাটা মনে পড়তেই মাথায় রক্ত উঠে গেল। গোল্লায় যখন গিয়েছি তখন আর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কি হবে। মা তো ভাববে, কিছু বাগাবার তালেই ও তোয়াজ করছে।

ন'টার সময় কোজি মুকে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে, বাবার ডাক।—অরুণ!

ও গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, তোর ছোটমেসো একবার দেখা করতে বলেছে। আজকেই যাস।

ছোটমেসো! কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। ছোট-মেসোর নাম শুনেই ও কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। আবার সেই উর্মির সঙ্গে সিনেমা অ্যাফেয়ারটাই এতদিনে অ্যাজেণ্ডায় উঠলো নাকি?

—আচ্ছা। বলে চলে আসছিল ও।

—আচ্ছা নয়, আজকেই যাবি।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলো, ওর বিছানায় শুয়ে পায়ের আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে গল্পের বই পড়ছে মিলু।

মেয়েটার যখন তখন বিছানায় পড়ে পড়ে গল্পের বই পড়া দু' চোখের বিষ অরুণের কাছে। চিচিঙ্গের মত চেহারা, এদিকে শাড়ি ঠিক রাখতে পারে না। নিমগাছটার ওদিকের ফ্ল্যাটের ছেলেটা প্রায়ই কবি-কবি চোখে কিছুই দেখছি-না দেখছি-না করে তাকায়।

মিলু তাকায় কিনা কে জানে। নাঃ, ওর টেস্ট এত বাজে নয়।

অরুণ এসে মিলুকে কাতুকুতু দিলো।

—এই দাদা! রেগে গিয়ে উঠে বসলো মিলু।

অরুণ চাপা গলায় বললে, ছোটমেসো দেখা করতে বলেছে কেন রে?

মিলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কি একটা চাকরি আছে, টেম্পোরারি।

—ও।

মিলু বললে, যাবি?

—যেতে একবার হবেই।

—তা হলে আমিও যাবো তোর সঙ্গে। ছোটমাসী সেদিন কত করে বলে গেছে। মিলু বললে।

অরুণ বেঁচে গেল। একা গেলে সেদিনের ঘটনা নিয়ে ছোটমেসো

কি বলবে কে জানে। মিলু সঙ্গে থাকলে তবু কিছুটা রেহাই পাবে।

বললে, বেশ, যাবি। সন্ধ্যেবেলায়।

তার আগে তো দুপুর। তার আগে তো কফি হাউস। কোজি নুকে অপেক্ষা করে করে কাউকে না পেয়ে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তার ওপর রুণুর জন্যে দুর্ভাবনা। খুব সহজে কাছে এসেছে বলেই হয়তো তাকে হারানোর এত ভয়। অরুণের মাঝে মাঝে মনে হয় রুণু ওকে ভুল করে ভালবেসে ফেলেছে। যে-কোনদিন তার ভুল ভেঙে যেতে পারে। যে-কোনদিন অরুণ রুণুর কাছে টিকলু হয়ে যেতে পারে।

কফি হাউসের চৌকাঠ ডিঙিয়েই সকলকে দেখতে পেল অরুণ। হলভর্তি সিগারেটের ধোঁয়া, বাতাসে কফির ঝাঁঝ, আর এই কথার হট্টগোল—কথাগুলোকে যেন কফির দানার মত পার্কোলেটারে ফেলা হচ্ছে।

তা হোক, এতক্ষণে অরুণের মনে হচ্ছে কোলকাতা ওকে ফিরিয়ে নিলো।

দূর থেকেই ওদের দিকে তাকালো ও।

উফ্, কি দারুণ সেজেছে উর্মি!

অরুণকে দেখেই চার জোড়া হাত ঝড়ের মুখে গাছের ডাল হয়ে হাতছানি দিলো।

শুধু নন্দিনী একটু ফিকে হাসি হাসলো, হাতছানি দিলো না।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই সুজিত বললে, আমাদের আজ নন্দিনীবিদায়। বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে, আজ বিরামের দিদির বাড়িতে চলে যাবে নন্দিনী। দিদি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। শুধু দাদাটা—

বিরাম বিরক্ত মুখে বললে, দাদাটা একটা ছোটলোক।

নন্দিনী ভুরু কুঁচকে আপত্তির চোখ তুলে একবার বিরামের দিকে তাকালো, কোন কথা বললো না।

অরুণ ওসব কিছু লক্ষ্য করলো না, ও তখন উর্মিকে দেখছে।

অরুণ হেসে বললে, উর্মি, আজ দারুণ সেজেছিস। তারপর দূরের টেবিলে গোঁফওলা ছেলেটার দিকে ইশারা করে বললে, তোকে দেখে ইনটেলেকচুয়ালটার বুকে এতক্ষণ ক্যান্সার হয়ে গেছে।

উর্মি হেসে বললে, তোদেরও হচ্ছে নাকি?

টিকলু হাসলো।—আলবাত হচ্ছে, বুকের মধ্যে একটা তক্ষক কুরুর কুরুর করে মাংস চিবোচ্ছে যেন।

সুজিত বললে, সত্যি। আজ সোফিয়া লোরেনকে মনে হচ্ছে তোর দিদিশাশুড়ী।

হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। বিরাম কিছু বলতে পারলো না। বলবে কি করে, আড়ালে পেলেই তো তা হলে নন্দিনী ধাঁতানি দেবে।

উর্মি সত্যিই খুব সেজেছে। চূড়ো করে পার্ক স্ট্রীট ধরনের চুল বেঁধেছে, ভুরু টেনেছে। ফর্সা ঘাড়, গাল-গলার নীচের ঢালু পুরীর সী-বীচ্। কাঁধ অবধি দুটো হাত বাকল ছাড়ানো গাছের মত মসৃণ। কিংবা নাইলনের প্যাঁচানো শাড়ির দীর্ঘ শরীরটাই যেন একটা ঋজু গাছের এখানে-ওখানে বাকল খসে পড়া কাণ্ড। দূরে বসে দেখা যায় না, ছুঁতে ইচ্ছে করে।

উর্মি হঠাৎ বললে, অরুণ, তুই কখনো ড্রিঙ্ক করেছিস?

অরুণ কিছু বলার আগেই টিকলু বললে, কতবার।

—জিৎ তুই?

সুজিত হেসে বললে, বীয়ার খেয়েছি।

টিকলু নাক সিঁটকে বললে, সোডা কিংবা বীয়ার মাইরি আমি 'র' খেতে পারি না।

ওরা কেউ কিছু বুঝতে পারলো না দেখে বললে, মানে সঙ্গে একটু হুইস্কি না হলে।

উর্মিও এবার হেসে উঠলো। তারপর বললে, আমি একদিন একটু খাবো। নিয়ে যাবি?

—আজই চল্ না। টিকলুর উৎসাহ সবচেয়ে বেশী।

উর্মির চোখ দুটো ঝকঝক্ করলো।

আজই বরং সেলিব্রেট করা যাক্, নন্দিনীবিদায় উপলক্ষে। বলে হেসে উঠলো।

নন্দিনীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল।—আমি না, আমি না।

বিরাম বললে, আমাদের বাবা দিদির বাড়ি যেতে হবে।

অরুণ বললে, আজ থাক্ না।

টিকলু রেগে গিয়ে বললে, ট্রামের দড়ি কাটার অভ্যেস তোর গেলো না।

ওরা সকলেই গুম্ হয়ে বসে রইলো। উর্মিও সেই যে 'ড্রপ ইট' বলে চুপ করে গেছে, আর কোন কথা বলছে না। একটা নতুন ফূর্তির আশায় সকলেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, অথচ সেই মুহূর্তে কেউ না কেউ বাগড়া দেবেই।

টিকলু ক্ষোভের সঙ্গে বললে, কপালটাই খারাপ আমাদের। শুয়ে ঘুমোবো কি, শালা তোষকে তুলোর চেয়ে তুলোর বীজ বেশী।

বিরাম ওর বিরক্তি দেখে হেসে ফেললে। বললে, আমরা এবার উঠবো।

ওরা সকলেই ওদের বাসে তুলে দিতে নেমে এলো।

অরুণ শুধু সুযোগ খুঁজলো নন্দিনীকে কি করে আড়ালে পাওয়া যায়, বিরামকেও এড়িয়ে কি করে রুণুকে টেলিফোন করার ব্যবস্থা করা যায়।

ওর কেমন ধারণা হলো নন্দিনী একটু-আধটু নিশ্চয় জানে। ওর আর রুণুর সম্পর্কের কথা। বিরামকে নন্দিনী কিছু বলেছে কি না ওর সন্দেহ ছিল।

বিরামের কানে গেল বোধ হয় কথাটা। বললে, নন্দিনীর খবর কিন্তু তুই কিচ্ছু জানিস না।

অরুণ হেসে ফেলে বললে, না না, সে ভয় নেই। বলবো, দেখাই হয় নি।

কোন্ সময়ে কিভাবে ফোন করা যাবে জেনে নিয়ে ও খুব খুশী হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাগ হলো রুণুর ওপর। দেখেছো কাণ্ড, কেমন পিউরিটি বার্লির মত মুখ করে রুণু সেদিন বলেছিল, বিরাম নন্দিনী কেউ কিছু জানে না। অরুণও ওদের কিছু জানাতে বারণ করেছিল। আশ্চর্য, মেয়েদের কোন বিশ্বাস নেই, ওদের একটুও বিশ্বাস করতে নেই।

টিকলু যতই ভাবছিল ততই ওর মজা লাগছিল।

—খুব তো পাম্প দিচ্ছিলি, যেন নাম্বার ওয়ান বোতল ভাদুড়ি। পকেট তো এদিকে গড়ের মাঠ। সুজিত ফেরার পথে ঠাট্টা করেছিল।

আর অরুণ বলেছিল, নন্দিনীর সামনে তোর ওসব বলা উচিত হয় নি।

টিকলু রেগে গিয়ে বললে, যা যা, উর্মি মাংসের সিঙাড়া হয়ে চোখের সামনে বসে থাকবে, আর আমি মদের কথা বললেই দোষ। একটু খাওয়াতে পারলে দেখতিস 'আমি পবিত্র আমি বিশুদ্ধ' কোথায় সব চড়ুই পাখি হয়ে ফুরুক করে উড়ে যেত।

অরুণ কোন কথা বললে না। নিমপাতা খাওয়া মুখ করে রইলো।

এই জন্যেই তো টিকলুর আজকাল সুজিত আর অরুণকে অসহ্য লাগে। ওরা সবাই একসঙ্গে আড্ডা দেয়, ফুর্তি করে, স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তারই ফাঁকে সুজিত আর অরুণ এমন ভাব করে যেন টিকলু অনেক নীচু স্তরের মানুষ। ও যেন সত্যিই একটা রকবাজ ছেলে।

কার কত কালচার জানা আছে, থাকিস তো ভাড়াটে বাড়িতে।

পার্কের পিছনে তিরিশ ফুট রাস্তাটার ওপর সব বাড়িগুলোই একে একে নতুন হয়ে গেছে। কেউ পুরোনো বাড়িটাই ভেঙেচুরে নতুন গ্রীল বসিয়ে নিয়েছে, কেউ বারান্দা বাড়িয়ে জানালা ফুটিয়ে নতুন চেহারা এনেছে। কোন কোনটা সত্যিই নতুন। শুধু তার ফাঁকে টিকলুদের বাড়িটাই ধসে পড়ার মত অবস্থায়। লোহার থামগুলোতে জং ধরেছে। এক এক সময় বাড়িটার জন্যে টিকলুর গর্ব, এক এক সময় লজ্জা। বাবার বিরুদ্ধে টিকলুর অবশ্য একটা

ক্ষোভ ছেলেবয়স থেকেই জমা হয়ে আছে। সারাজীবন ধরে বাবা তা হলে কি করলো? পৈতৃক একখানা বাড়ি পেয়েও মেজেঘষে সেটাকে একটু ভদ্রস্থ করতে পারলো না? আবার ছেলেকে উপদেশ দেয়, শাসন করতে চায়।

বাবার ওপর টিকলুর একটুও শ্রদ্ধা নেই। মা সমীহ করে না তো টিকলুই বা করবে কেন। বাবা পড়াশুনো কদ্দুর করেছিল, করেছিল কিনা, টিকলু তাও স্পষ্ট জানে না। ওর বদ্ধ ধারণা বাবা ওর কথা শুনে চললে এদ্দিন ব্যবসায় লাল হয়ে যেত। প্রেস প্রেস বলে, মাল তো বাজারের কাছে নীচের তলার দু'খানা অন্ধকার ঘরে দুটো ট্রেড্‌ল মেশিন। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে হ্যাণ্ডবিল্ কিংবা রসিদ-বই ছাপে। কখনো শ্রাদ্ধের চিঠি। প্রেসে একটা খদ্দের ঢুকলে বাবা এমন তোয়াজ করে যেন বাড়িতে বেয়াই এসেছে। সাদা টুইলের নোংরা শার্ট পরে যখন বসে থাকে, পরিচয় দিতেও লজ্জা।

মা একবার বলেছিল, বাউণ্ডুলের মত ঘুরে না বেড়িয়ে ছাপাখানার কাজটাজ একটু দেখলে তো পারিস।

টিকলু নাক সিঁটকে বলেছিল, ওটাকে আর ছাপাখানা বলে না।

মা রেগে গিয়ে বলেছিল, ঐ থেকে দু'-বেলা জুটছে। পারিস তো করে দেখা না কাকে ছাপাখানা বলে।

টিকলুর সত্যিই এক একসময় ইচ্ছে হয়, ও বিরাট একটা কিছু করে ফেলবে।

—প্ল্যানও আসে, বড়লোকের ছেলেও পাকড়াই, কিন্তু মাইরি কেন যে পাকা শোল মাছের মত সুড়ুৎ করে সরে পড়ে···

সুজিত হেসেছিল।—তোর তো তাল শুধু পরের টাকায় ম্যানেজারি···

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বসবে, স্টেনো থাকবে পাশে···অরুণও ঠাট্টা করেছিল।

এ জন্যেই সুজিত আর অরুণকেও আজকাল অসহ্য লাগে।

বড় কিছু একটা ওরা ভাবতেই পারে না। শুধু দেড়শো দু'শো টাকার চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। চাকরি একটা পেলেই বা কি হবে, ডালহৌসীতে দুপুরে বেরিয়ে তো চানাচুর চিবোবি।

মাও বোঝে না।—আড্ডা দিয়ে না বেড়িয়ে, কিছু একটা করলেও তো পারিস।

আড্ডার ওপর সবাই দেখি জলবিছুটি হয়ে আছে। অথচ আড্ডা না থাকলে সময় কাটাতো কি করে। একটা দিন আড্ডা না দিলে মনে হয় কি যেন হলো না, কি যেন হলো না।

—বল্‌ সুজিত, তাই কিনা? বুড়োরা মাইরি বোঝে না। আরে আড্ডা না থাকলে এদ্দিন তো বখে যেতাম।

সুজিত হেসে বললে, অরুণটা লাকি। সময় কাটানোর প্রবলেম ওর আর নেই।

অরুণ কোন উত্তর দিলো না। লাকি। প্রেম করেছিস কখনো, প্রেম কি তা জানিস? যন্ত্রণা রে, স্রেফ যন্তরনা। 'সময় কাটানোর প্রবলেম নেই।' রুণুর সঙ্গে একটু মন খুলে কথা বলার পর থেকে মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টা ও কাছে কাছে থাকুক। দু' তিনদিন অন্তর দেখা হয়, অথচ সময় কাটাবে কি, মনে হয় ঘড়ির কাঁটা যেন পোলিওতে ভুগছে।

—কদ্দূর এগিয়েছিস্ বল। টিকলু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

—প্রেম কি এগোবার বা পিছোবার জিনিস! অরুণের পিঠে কেউ যেন আল্‌পিন বিঁধিয়েছে এমনভাবে বিরক্ত হয়ে ও বললে, তুই বুঝিস না টিকলু, তুই বুঝিস না।

সুজিত হাসলো।—এগোয়নি পিছোয়নি? তাহ'লে কি স্ট্যাটিক নাকি। মেয়েটাকে দেখে তো মনে হয়েছিল দিব্যি চালু।

অরুণ অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করলো। কিন্তু টিকলু হ্যা হ্যা করে হেসে শোধ তুলতে চাইলো।

মেয়েটা চালু, মেয়েটা খারাপ, মেয়েটা তোকে স্রেফ নাচাচ্ছে।

শুনতে শুনতে কান গরম হয়ে ওঠে অরুণের। অথচ কিছু প্রকাশ করে বলতেও পারে না। ওদের মধ্যে যা গোপন তা হাটের মধ্যে প্রকাশ করবে কেন। গোপন বলেই তো এত সুন্দর।

টিকলুর মনের মধ্যে তখনো বাজছে 'তুই বুঝিস না টিকলু, তুই বুঝিস না।' টিকলু বোঝে না, যত বোঝে অরুণ। কি, না রুণুর সঙ্গে একা একা দেখা করে একটু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে, রেস্টুরেণ্টে বসে পকেট সাফ করেছে, মাঠে বসে গরুর মত ঘাস চিবিয়েছে। ছটো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে, ব্যস্। টিকলু যে তোর চেয়ে অনেক বেশী জানে, বোঝে, তার তো খবর রাখিস না। নেহাত বলার উপায় নেই, শুনলে হয়তো ছি ছি করবে।

কে জানে, পাপটাপ হচ্ছে কিনা টিকলু নিজেও জানে না। কিন্তু মা বাবাকে ভয় শুধু ঐ একটা কারণে। কখন সন্দেহ করে বসে, কখন বুঝতে পারে। ভয় না লজ্জা কে জানে। শুনলে সুজিত আর অরুণ হাসবে, না ছি ছি করবে তাও জানে না।

কিন্তু ভালবাসা কি, প্রেম কি, তা ও জানে। আলবত জানে। বিরাম কিংবা অরুণের সঙ্গে টিকলুর তফাত কোথায়? ও কি কম ছটফট করে? কম যন্ত্রণা ওর? শরীরের জন্যে শরীর কি কম কষ্ট পায়? শরীর দিয়ে শরীরকে আদর করা যায় না? তা হলে এত জ্বালা কিসের।

নানারকম রঙিন রঙিন ইচ্ছে টিকলুরও হয়। টিকলুরও ইচ্ছে—ও ঘুরবে, বেড়াবে, ঘাসের ওপর বসবে, সন্ধ্যেবেলার জল দেখবে, জলের মধ্যে তারা কিংবা হাওড়া ব্রীজের আলোয় গাঁথা মালা। ঘন হয়ে বসবে, মুগ্ধ হয়ে মুখের দিকে তাকাবে—সত্যি, ওর হাসিটা ফাইন—পাঁচজনের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে যেতে ইচ্ছে করে টিকলুর।

অরুণ ঠিকই বলে। আমরা কথা বলতে জানি না, কথা বলতে পারি না। রিয়েলি, দিনরাত বুকের মধ্যে খই ফুটছে, সরা চাপা দিয়ে রাখো। কি, না, সমাজ, 'ছি ছি'।

কতবার ওর ইচ্ছে হয়েছে, একটু একটু আভাস দেবে অরুণ আর সুজিতকে। পারে নি। অথচ সব ব্যাটাই হয়তো···

—তোমার কি একটু গল্প করতেও ভাল লাগে না?

যাব্বাবা, টিকলু যে ওর জন্যে ছটফট করে, সেটা কিছু না। বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জ্বালা জুড়োতে চায়, সেটাই অন্যায়? কে জানে, প্রেম অন্য কিছু হতেও পারে। টিকলু ঠিক বুঝতে পারে না। কিংবা ওর প্রেম চার দেয়ালের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে আছে বলেই হয়তো অন্য রকম মনে হয়।

প্রেমট্রেম বোঝে না টিকলু। যেখান থেকে যেটুকু পাওয়া যায়। এর বেশী আর কিছু পাবে না বলে। আরেকটা রঙিন ইচ্ছেও জাগে। রুণুকে দেখে জেগেছিল। এমন কি নন্দিনীকে দেখেও। ওর তো কোথাও কিছু প্রাপ্য নেই। বাইশ বছর বয়স অবধি কেউ তো কিছু হাত বাড়িয়ে দিলে না ওকে। শুধু যেটুকু যেখান থেকে পারো ছিনিয়ে নাও। ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে গেল। ভাবলে, আমি, আমি বোধহয় একটা স্কাউণ্ড্রেল।

সত্যি, ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না, কেন ও হঠাৎ এমন বিশ্রী কাণ্ডটা করলো। অথচ ও সত্যি এসব কিছু ভাবে নি আগে থেকে। মুখে যা আসে তাই বলে, কিন্তু ওসব কি মনের কথা নাকি। বরং বিরাম আর নন্দিনীকে দেখে ওর খুব ভাল লেগেছিল। ফুল দিয়ে সাজানো ফুলদানির মত সুন্দর। আমি তো শালা সুখের মুখ দেখবো না, ওরা অন্তত সুখী হোক্, মনে মনে ভেবেছিল। অথচ হঠাৎ—

মদটদ খাওয়া বাজে কথা। দু'চার দিন টেস্ট নিয়েছে এই পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ ওর ইচ্ছে হয়েছিল নিজের চেহারাটা কালো করে দিই। নন্দিনী তো আমাকে খারাপ ভেবেছে, আরো খারাপ ভাবুক। সকলেই তো ওকে খারাপ ভাবে, ভাখ তোরা, আমি আরো কত খারাপ।

কে জানে, নন্দিনী বিরামের কাছে কি রিপোর্ট দিয়েছে। বিরামকে ও সারাক্ষণ স্টাডি করেছে। কিন্তু বুঝতে পারে নি। যদি জেনে থাকে, এই ভয়ে, ভেবেছিল বেহেড হয়ে নিজেকে আরো কালি মাখাবে।

কিংবা ভেতরের অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই হয়তো ও মাতাল হতে চেয়েছিল। মদটদ খেয়ে···নন্দিনীর কাছে ক্ষমা তো চাওয়া যায় না···নিজেকে বেধড়ক চাবকানো যেত···আমি মাইরি একটা শুয়োরের বাচ্চা, শালা কখন যে কি করে ফেলি···

কিন্তু টিকলুর হঠাৎ মনে হলো, আমি তো ভাল, আমি সৎ···তবু বাইরের পোশাক দেখেই লোকে কেন যে খারাপ ভাবে। হঠাৎ ওর একটু নন্দিনীর ওপর লোভ হয়েছিল বলেই কি ও খারাপ নাকি? এখন সব শুনলে বিরাম ভাববে সেজন্যেই ও নন্দিনীকে সুধাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কে জানে, হয়তো নন্দিনীকেও সন্দেহ করবে। ভাববে···টিকলু ভাবলো। অভিমানে দুঃখে একটু যে কাঁদবো, তাও জল আসবে না চোখে। শুকিয়ে সুপুরি হয়ে গেছি রে, আমি শালা একটু কাঁদতেও পারি না।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে অরুণ বললে, একটু আস্তে চালান, একটু আস্তে।

ওর চোখ দুটো বাস-স্টপের ভিড়ের মধ্যে রুণুকে খুঁজছিল। ভিড় ছাড়া রুণু কোথাও অপেক্ষা করতে চায় না, পাছে চেনাজানা কেউ দেখলে কিছু সন্দেহ করে। রুণু তো ভিড়ে হারিয়ে থেকেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালাদের যা মেজাজ, ভিখিরি তাড়ানোর ভঙ্গিতে প্যাসেঞ্জার হটায়। রুণুকে তাড়াতাড়ি খুঁজে না পেলে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ও যখন আসবে তখন আবার ট্যাক্সি পেলে হয়। কোথাও যদি নির্ভেজাল শান্তি থাকতো। রুণুটা এমন দেরি করে আসে, তখন বাসে-ট্রামেও জায়গা মেলে না।

ঝট করে ভিড়ের মধ্যে চোখোচোখি হলো। অরুণ জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকতে যাচ্ছিল, তার আগেই রুণু এগিয়ে এলো।

অরুণ বললে, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো।

রুণু ট্যাক্সিতে বেশ অস্বস্তির সঙ্গে উঠলো। অস্বস্তি তো হবেই, কেউ যদি দেখে, তখন আর কোন ওজর অজুহাত চলবে না। মামাবাবু বকুনিটকুনি নাও দিতে পারেন, কিন্তু নিজের তো লজ্জা। আর ট্যাক্সি জিনিসটাই তো এখন ঘেন্নার, দিনরাত চোখের সামনে যা দেখছে।

নন্দিনী চলে যাওয়ার পর থেকে রুণু নিজেও একটু ভয়ে ভয়ে আছে। নন্দিনীর দাদা লোক সত্যি ভাল, ঐ ঘটনার পর কেমন ভেঙে পড়েছেন। বিরামের ঠিকানা যদি ওর জানা থাকতো, রুণু একাই গিয়ে খবর নিয়ে আসতো। এমনই মুশকিল, নন্দিনীর দাদাকে

বিরামের নামটাও বলতে পারছে না। বললে, কলেজে খোঁজ করেও তার ঠিকানা যোগাড় করতে পারতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মামীমা ভাববেন, দেখেছো কাণ্ড, রুণু সব জানতো। ও আবার ভিতরে ভিতরে কি করছে কে জানে!

অরুণ ঘন ঘন মীটারের দিকে তাকাচ্ছিল।

রুণু বললে, কি সাহস তোমার!

অরুণ হাসলো।—কি করবো, খবরটা তো দিতে হবে।

—সেদিন কি হয়েছিল? রুণু জিজ্ঞেস করেই অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। অর্থাৎ মিথ্যে কথা বললেই যাতে ধরতে পারে।

অরুণ বললে, সে অনেক কাণ্ড। পাটনা যেতে হলো হঠাৎ।

রুণুর ভুরু কাঁপলো, বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, পাটনা কেন, আরো দূরেও তো যেতে পারতে, পেশোয়ার?

রুণুর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার গলার স্বর শুনে অরুণের ভীষণ রাগ হলো। কি আশ্চর্য, ওকে বিশ্বাস করছে না রুণু!

অরুণ জোর দিয়ে বললে, সত্যি পাটনা গিয়েছিলাম।

—কফি হাউসে যাও নি? মক্ষিরানীর আড্ডায়?

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। ছি ছি, একি সন্দেহ পুষে রেখেছে রুণু!

অরুণ কোন কথা বললো না। গভীর একটা অভিমানে ওর বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। পরক্ষণেই একটু সন্দেহ হলো, সেদিন টিকলুরা যে বিরাম আর নন্দিনীকে নিয়ে কফি হাউসে গিয়েছিল, সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর—জানে নাকি রুণু? হয়তো ভেবেছে অরুণও ছিল।

রুণু ফিরে তাকালো আবার, তারপর কৌতুকে হাসলো।

ওর হাসি দেখে অরুণও হেসে ফেললো। যাক্ বাবা, মুখে হাসি ফুটেছে এতক্ষণে। কিন্তু বিরাম আর নন্দিনীর কথা কি বলবে এখন?

তারপর যদি ওর কাছ থেকে শুনে নন্দিনীর দাদা ঝামেলা পাকায়। তখন কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। সুজিত আর টিকলু ধিক্কার দেবে, বিরাম বলবে, তুই এত ছোটলোক?

না, কিছু বলবে না ও রুণুকে। অথচ, ধুত্তোর, হুজ্জোত না হুজ্জোত, নন্দিনী যদি ইতিমধ্যে রুণুকে ফোন করে সব বলে দিয়ে থাকে। রুণু ভাববে, দেখেছো, এই লোকটাকে আমি ভাল ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম আমাকে ভালবাসে, আমার কাছে কি আর কিছু লুকিয়ে রাখবে?

অরুণ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই বললে, মামীমা কিছু বুঝতে পারেন নি তো?

রুণু হেসে ঘাড় নাড়লো। তারপর আবার বললে, কি সাহস বাবা!

অরুণও হাসলো। রুণুর হাসিটা ওর বুক ভরিয়ে দিয়েছে। ও খুশী।

বললে, তোমার মামাবাবুর নাম খুঁজে ফোন নম্বর তো বের করলাম।

—নাম বলেছিলাম আমি? রুণু অস্পষ্ট স্মৃতি হাতড়াবার চেষ্টা করলো।

অরুণ একটু অপ্রতিভ হয়েছিল, জেনেছে তো নন্দিনীর কাছে, সেটা চট্ করে ঢাকা দিলো।—হ্যাঁ বলেছিলে।

একটু থেমে হাসলো।—সকালে করেছিলাম, বোধ হয় মামাবাবু ধরেছিলেন, টক্ করে কেটে দিলাম সাড়া না দিয়ে।

রুণু চোখ কপালে তুললো।—ও মা, ও রকম করলে তো ভাববেন···

অরুণ হেসে বললে, একবার তো সকালে, তারপরই ঘণ্টাখানেক পরে আবার, তোমার গলা শুনলাম। কেউ ছিল না তো কাছে?

—না। কিন্তু কোথায় চলেছি শুনি? রুণু তাকালো অরুণের মুখের দিকে।

অরুণ ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে বললে, লাইটহাউস।

সিনেমার অন্ধকার ছাড়া আর কোথায় স্বস্তিতে পাশাপাশি বসে থাকা যায় নির্বিঘ্নে, চাপা গলায় কথা বলা যায়।

টিকিট কেটে ওরা ঢুকলো। আঃ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, অরুণের বুকের মধ্যে এতক্ষণ অনেক সংশয় অনেক অভিমান জমা হয়েছিল। সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ঢোকবার সময় তো টিকিটের আধখানা ছিঁড়ে নেয়। বাকী অর্ধেক ফিরিয়ে দিতেই অরুণ পকেটে রেখে দিলো। দেখি আজকেও চায় কিনা।

—এই, টিকিট দুটো কই? দাও? সীটে বসেই রুণু বললে।

আধখানা-ছেঁড়া টিকিট দু'খানা অন্ধকারে এগিয়ে দিলো অরুণ। রুণুর হাত ছুঁলো। টিকিট দু'খানা রুণুর হাতে দিয়ে তার হাতটা মুঠো করে দিলো। এই সামান্য একটু স্পর্শের মধ্যে অফুরন্ত একটা আনন্দ।

রুণু ছেঁড়া টিকিট দুটো নিয়ে ব্যাগের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিলো। এখন ব্যাগের মধ্যে, এর পর বাড়ি ফিরে দেরাজ খুলবে ও, দেরাজের মধ্যে যত্ন করে রেখে দেবে। কিছুই হারিয়ে যেতে দেবে না। ছোট ছোট প্রত্যেকটি আনন্দের স্মৃতিকে বুকের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেরাজটায় ঠিক যেভাবে লুকিয়ে রেখেছে, ঠিক সেইভাবে লুকিয়ে রাখবে ওর পড়ার টেবিলের দেরাজে।

অরুণ ভাবলো, আচ্ছা, চাকরির কথাটা বলবো এখন? না থাক্, হোক্ তো আগে। বলবার মত চাকরি কিনা তাই বা কে জানে।

রুণু ভাবলো নন্দিনীর চলে যাওয়ার খবরটা বলবে কিনা।—এই, জানো, নন্দিনী তার দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে।

—সে কি? কোথায়? অরুণ যেন কিছুই জানে না।

রুণু সংক্ষেপে বললে।

তারপর চুপচাপ।

অন্ধকারে রুণুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল অরুণ। ফিসফিস করে বললে, সেদিন খুব রাগ হয়েছিল, না?

ঠেলে সরিয়ে দিলো রুণু। হাসি-হাসি গলায় বললে, আরে পাগল, পিছনের লোকরা দেখছে।

দেখছে, দেখছে, দেখছে। যেখানেই যাও কোথাও কোন শান্তি নেই। পৃথিবীসুদ্ধ লোক শুধু দেখছে। বুভুক্ষুর মাঠ হয়ে আছে সব, আসলে তো দেখছে না, জ্বলছে। হিংসেয় জ্বলছে। অরুণ নিজেও তো একসময় জ্বলতো। বিরাম আর নন্দিনীকে দেখে। না, একদিন কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। কত আর বয়স হবে, দু'জনেরই আঠারো উনিশ। ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল তারা কথা বলতে বলতে। দু'জনেরই মুখের উপর এমন একটা মুগ্ধ ভাব ছিল, চারপাশে কোথায় কি ঘটছে ভ্রূক্ষেপ নেই। হাসছিল তারা। অরুণের খুব ভাল লেগেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে।

ওদের দেখেও, ওকে আর রুণুকে দেখে তেমনি ভাল লাগে না কেন সকলের?

রুণুর কথা শুনে একটু রাগ হলো অরুণের। ও সরে এলো। বয়ে গেছে রুণুর সঙ্গে কথা বলতে, কাছ ঘেঁষে বসতে।

কিন্তু হাতটা চেয়ারের হাতলেই ছিল।

অন্ধকারের মধ্যে রুণুকে সিল্যুট ছবির মত লাগছে। পর্দার দিকে তাকিয়ে ছবি দেখছে।

হঠাৎ অরুণের হাতের ওপর ঠাণ্ডা মত কি লাগলো। বাঃ, মন ভরে গেল। রুণুর আঙুলটা অরুণের হাতের পিঠে ছোঁয়া দিয়ে দিয়ে ঘুরছে, রাগ ভাঙাতে চাইছে আর কি!

ফিরে তাকালো অরুণ। কাছ ঘেঁষে গেল আবার।

রুণু বোধ হয় হাসছে। পর্দার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারায় বললে, ছবি ছাখো। কিন্তু হাতের ওপর হাতখানা আবার রাখলো।

অথচ প্রথম যেদিন রুণুর হাতটা ছুঁয়েছিল, উঃ, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন।

তখন রুণুর এত মান-অভিমান ছিল না, এত সন্দেহ ছিল না। অরুণই বরং অভিমানে অপমানে বুকের মধ্যে কাঁদতো।

কোথায় যাবে, দু' দণ্ড মুখোমুখি বসবে? কোলকাতা একটা উৎকট অভিশাপ, এখানে ভালবাসা আছে নাকি! প্রেমফ্রেম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে শরীরের সিঁথিতে সিঁদুর লেপতে চাও তো কোলকাতা তোমার দোস্ত্। স্রেফ দশ টাকার নোট একখানা এগিয়ে দিলেই নোংরা হোটেলের দরজা খুলে যাবে, ভিতর থেকে বেপরোয়া খিল্ দাও। বেরিয়ে এসে ফটক পার হও, সিপাইজী স্যালুট মারবে। কিন্তু বাইরে কোথাও একটু নিরিবিলিতে বসতে গেলে ফেউ লাগবে পিছনে।

ফাল্গুন মাস সেটা। রেডিওতে ফাগুন এসেছে-টেসেছে গান চলছে, কিন্তু আসলে তো পাঁজিতে বসন্ত। বেশ গরম। ভিক্টোরিয়ায় লোক গিজগিজ, অরুণ ভাবলে এর চেয়ে গঙ্গার ধারে···

—হ্যাঁ, সেই ভাল। ফুলের গাছটাছ নাকি লাগিয়েছে, আলো দিয়েছে। রুণু বললে।

প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে চলে গিয়েছিল। ঈস্, সেখানেও ভিড়।

জেটীর দিকে যাচ্ছিল ওরা, ওদের সামনে সামনে তিন চারটে সাজগোজ করা ফর্সা চামড়ার পাঞ্জাবী মেয়ে।

—গঙ্গায় আজকাল বেড়ে ইলিশ উঠছে রে! সাত আটটা ছেলে এর-ওর কাঁধে হাত দিয়ে বনমহোৎসবে পোঁতা চারা গাছের গোল বেড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন কে বললে, মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে, রুণুর দিকে তাকিয়ে।

—ইলিশ? এ সময়? বুঝতে না পেরে চাপা গলায় রুণু এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।

রুণুর সঙ্গে তখনো মনের দূরত্ব অনেক। স্পষ্ট করে কিছু বলতে

পারলো না অরুণ, শুধু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। তখন ওরা বিশুদ্ধ স্বপ্ন, রঙিন ছবি। কুৎসিত কৌতূহল কিংবা ময়লা কথা ওদের গায়ে নোংরা ছিটিয়ে দিতো। বৃষ্টির দিনে গাড়ি দেখে যেমন পালাতে হয়, তেমনি ওসব থেকে পালাতে চাইতো।

কিছুটা নির্জন দেখে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলো দু'জনে। অরুণের মনে হলো রুণু যেন ইচ্ছে করে এক বিঘৎ জায়গা ফাঁক রাখলো। এক বিঘৎ ঐ ফাঁকা জায়গাটা যেন অরুণের গালে একটা থাপ্পড় মেরে বলতে চাইলো, তুমি তো পুরুষ, ঐ ইলিশ-দেখা ছোকরাগুলোর মত, তোমাকেই বা বিশ্বাস কি। অথচ অরুণ তখন কিছুই চায় না, কিছুই চায় না, শুধু রুণু বলুক ও যেমন দেখা করার জন্যে, কথা বলার জন্যে, কাছে বসার জন্যে ছটফটিয়ে মরছে, রুণুর মনেও তেমনি কোন অসহ্য যন্ত্রণা।—না রে সুজিত, মেয়েরা ভালবাসে না। ওরা শুধু ভালবাসা পেতে চায়।

টিকলু হেসেছিল অরুণের কথা শুনে।—বুঝেছিস তা হলে? ও আমার জানা আছে। তুই শালা সল্‌তে হয়ে জ্বলছিস, রুণুর মুখ আলো হবে, দেখে বলবি, রুণুর হাসিটা মাইরি ফাইন। ব্যাস, ওরা খুশী।

টিকলু ঠিকই বলে। বোকামি ছাড়া আর কি।

বোকা বোকা চোখ মেলে অরুণ অন্ধকার জলের ওপর কুচি কুচি পোখরাজ দেখলো, দূরে চলন্ত মোটর-লঞ্চ দেখলো, জাহাজ দেখে মনে হলো, ওর কোথাও যেন কেউ আছে, কে আছে, সেখানেই ও চলে যেতে চায়। এখানে, এখন, ওর কেউ নেই। একটু আগে দু'জনে ফুল হয়ে গিয়েছিল, ইলিশ-খোঁজা ছেলেগুলো নোংরা ছিটিয়ে সব মাটি করে দিয়েছে।

রুণু চুপ করে বসেছিল। অন্ধকারেই ও একবার হাতের ঘড়িটা দেখলো।

অরুণ ঠাট্টা করে চাপা ক্ষোভে বললে, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

রুণু হেসে ফেললো। তারপর বললে, শুনুন, সত্যি তাড়াতাড়ি যেতে হবে। রোজ রোজ কত নতুন অজুহাত দেওয়া যায় বলুন।

অরুণের সেদিনও ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল রুণুকে ও ছোঁবে। ওকে একটুখানি ছুঁতে পারলেই যেন বুকের জ্বালাটা জুড়িয়ে যাবে। এই অসহ্য অতৃপ্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। দিনের পর দিন প্রতিটি মুহূর্ত যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, এক পলকের জন্যেও যাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না, সে সত্যি সত্যি যখন কাছে আসে, মনে হয় চলে যাবার জন্যেই যেন এসেছে। রক্তের মধ্যে যাকে অনুভব করছে, হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে পারছে না। রুণু যেন ওর হৃৎপিণ্ডের মতই। সবচেয়ে আপন, অনুভব করা যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না।

অরুণ বললে, আরেকটু। আর একটু বসি।

—না না, এবার উঠি। রুণু বললে। কিন্তু উঠলো না।

অরুণের মন সাহস পেলো। ও হাত বাড়িয়ে রুণুর হাত ছুঁলো। সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলো রুণু।

সমস্ত পথ অরুণ একটাও কথা বললো না। অপমানে, না কি হতাশায়, ওর সমস্ত মুখ কেমন যেন হয়ে গেছে। রুণুর দিকে তাকাতেও লজ্জা। ধরা পড়ে যাবার ভয়।

বাসে তুলে দিতে গিয়ে আর চুপ করে থাকতে পারলো না অরুণ। ও ছুঁতে চায় না রুণুকে, কিছুই চায় না, ভালবাসা চায় না। ও শুধু ভালবাসতে চায়।

ভালবাসাই তো ওর জীবনে এখন একটামাত্র নোঙর।

বাসের পাদানিতে পা দিয়েছে রুণু, অরুণ বলে উঠলো, শুক্কুরবার আসবে? শুক্কুরবার তো তোমার তাড়াতাড়ি ছুটি হয়।

রুণু ফিরে তাকালো, হাসলো।—অসম্ভব, শুক্কুরবারে তো দোল।

দোল। দোল। শেষ মুহূর্তের একটা ক্ষীণ আশায় পাম্প করা

হ্যাজাক বাতির মত ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রুণু তার চাবিটা নির্দয়ভাবে ঘুরিয়ে দিলো।

অরুণ একটা ক্লান্ত অবসন্ন গোল খাওয়া খেলোয়াড়ের মত টলতে টলতে ফিরে এলো।—আমি ভীষণ লাকি রে টিকলু। ভীষণ লাকি।

অসম্ভব। শুক্রবার তো দোল।

কোন্‌টা অসম্ভব? আর কোনোদিন দেখা করা? না শুক্রবার দোল, তাই দেখা করতে পারবে না রুণু। এ ক'দিন বুকের মধ্যে শুধু খাঁ খাঁ।

দূরে কোথায় কে ঢোলক বাজাচ্ছে। 'হোলি হায় হোলি হায়' চিৎকার করে উঠলো এক দঙ্গল ছেলে। সামনের রাস্তায় হাসি, চিৎকার, পিচকিরি, রঙ, আনন্দ। টিকলুরা এলেও অরুণ এবার আর দোল খেলতে বেরোবে না। অসম্ভব, অসম্ভব, দোলের মধ্যে এবার আর কোন রঙ নেই।

—হ্যাঁ রে, তোর চোখ লাল হয়েছে কেন? জ্বরটর হয় নি তো।

কনকলতা বাঁ হাতে কপাল টিপে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এলেন। অরুণের কপালে হাত দিয়ে আঁতকে উঠলেন।—এ কি রে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যে! শুয়ে থাক্, শুয়ে থাক্।

কনকলতা মাথার যন্ত্রণায় ভাল করে হাঁটতে পারছিলেন না। দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন।—শুনছো, অরুণের ভীষণ জ্বর। ডাক্তার ডাকার কেউ তো নেই, তুমিই যাও বরং।

গা পুড়ে যাচ্ছে? কই, অরুণের তো কোন কষ্ট নেই। ও তো বুঝতেও পারে নি। ওর শুধু একটাই কষ্ট।

রুণু ওকে একটুও ভালবাসে না, একটুও না। কিন্তু ভালবাসা যে ওর চাই-ই চাই। যে কেউ, যার হোক্। মনে মনে বললে, উর্মি,

তুই আমাকে একটু ভালবাসলেও তো পারিস। কিছু না, তুই তো স্মার্ট মেয়ে, তুই শুধু একটু অভিনয় করবি। মা'র মত কপালে হাত দিয়ে রুণু তো জ্বর দেখবে না, ও আমাকে ছোঁবে না, ছোঁবে না। ঊর্মি, তুই পারিস না একটু কপালে হাত দিতে? আমি কথা দিচ্ছি, তোর ওপর আমার আর কোন লোভ হবে না। আমি টিকলু নই। তুই শুধু আমার কপাল ছুঁবি। আমি তোর হাতখানা একবার মুঠো করে ধরবো।

দুশ্‌শালা! চোখে জল এসে গেল যে। বালিশটা ভিজে ভিজে লাগছে। অরুণ হেসে ফেললো।

আর মিলুর গলা শুনে তাড়াতাড়ি বালিশটা উল্টে দিলো।

—দাদা, তোর একটা চিঠি ছিল রে লেটার বক্সে। মিলু ছুটতে ছুটতে এলো।

হাত বাড়িয়ে ভারী খামটা নিলো অরুণ। ছিঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে খানিকটা আবীর ঝরে পড়লো। গোলাপী কাগজে মোড়া এক মুঠো সুগন্ধি আবীর।

নাকের কাছে নিয়ে অগুরুর গন্ধ শুকলো অরুণ।

—কে পাঠিয়েছে রে? মিলু জিজ্ঞেস করলো।

খামের ওপরে হাতের লেখাটা দেখলো অরুণ। কিন্তু দেখার দরকার ছিল নাকি। আবীরের গন্ধেই ও টের পেয়েছে। সমস্ত মন, সমস্ত শরীর মাউথ অর্গ্যান হয়ে গেছে।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো অরুণ, আবীরসুদ্ধ খামটা মাথায় উপুড় করে দিলো। চুলের ভিতরে ভিতরে আঙুলকে কাঁকুই করে ছড়িয়ে দিলো। আবীর মাখা হাতটা বুকের ওপর রাখলো।

দূর, কে বলে প্রেমের মধ্যে যন্ত্রণা আছে। প্রেম চন্দনের মত ঠাণ্ডা, চন্দনের মত।

সোনার মা চেঁচাচ্ছে। দিনরাত চেঁচাচ্ছে। এত চেষ্টা করে, এত ধমকধামক দিয়েও ওর অভ্যাস বদলানো গেল না। কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কে বলবে ভদ্দরলোকের বাড়ি। একবার রেগে গিয়ে অরুণ বলেছিল, এত চিৎকার চেঁচামেচির কি দরকার, কাজ পছন্দ না হয় ছেড়ে দিলেই পারো। আরে ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব হয়! ব্যস, তারপর দু'দিন কামাই। কনকলতাও রেগে গিয়েছিলেন অরুণের ওপর। যা, এবার লোক যোগাড় করে আন। আনলেও থাকতো নাকি সোনার মা, তাকে দুধের দোকানে দেখতে পেলে শাসাবে।

—আমরা সব, বুঝলি সুজিত, ঝি-চাকরদের চাকর হয়ে গেছি। একটা কড়া করে কিছু বলার উপায় নেই রে!

উপায় থাকবে না কেন, ঘুম থেকে উঠে ছোট্ তুই বোতল হাতে, দুধের দোকানে। বাজার করো, কলাপাতা আনতে ভুলে গেলে মার কাছ থেকে মুখ-ঝামটা খাও। সোনার মাকে তো তাড়ালি, বাসন মাজবে কে!

সব সুখ কোথাও পাবে না। তাই সোনার মার চিৎকার শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অরুণ। আজও সেই এক অভিযোগ, এত বাসন বের করে দিলে পারে কেউ। রোজ রোজ পোড়া কড়াই, এত বাড়িতে কাজ করলুম, এমন নেদ্দয় বাড়ি দেখি নি। আমার শরীলটা শরীল নয়?

আসলে ওসব কিছু না। অরুণ বুঝে গেছে সোনার মা চেঁচাবেই। পোড়া কড়াই কিংবা ঘর মোছার ন্যাতা কিংবা রান্নাঘর ধোয়ার ঝাঁটা নিয়ে। কিচ্ছু খুঁজে না পেলে অন্য বাড়ির বিরুদ্ধে গজগজ করবে।

মরুকগে, আমার সঙ্গে আর বাড়ির কি সম্পর্ক, যার যা খুশী করুক না। অরুণ ভাবলে।

মা জ্বর হয়ে মাথার যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে আছে। একজন ভাল ডাক্তার দেখানোর দরকার। দু'একবার পি. জি-তে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও হয়েছে অরুণের। কিন্তু বাবা না বললে, তারই বা কি করার আছে। কে বড়ো আর কে ছোট ডাক্তার সেই মীমাংসায় আসতেই তো আধঘণ্টা ভ্যাজ-ভ্যাজ শুনতে হবে।

—অরুণ! প্রকাশবাবু হঠাৎ ডাক দিলেন।

সোনার মা'র চিৎকার তখনো চলছে, কিন্তু কেউ কানে নেয় না। এ বাড়ির ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিক ওটা। মিলু রেডিওটা জোরে চালিয়ে দিলে তো পারে। লোকে জোরে রেডিও চালালে দু'একজন আবার কালচার ঝাড়ে। আরে বাবা, এইসব চিৎকার চেঁচামেচি ঘরোয়া ঝগড়া চাপা দেবার জন্যেই তো রেডিও। গভর্নমেণ্ট ভাবছে রেডিও খুব পপুলার।

—কিছু বলছেন? অরুণ গিয়ে দাঁড়ালো প্রকাশবাবুর সামনে।

—তোর ছোটমেসোর কাছে গিয়েছিলি? কি বললে?

আজকের সারাটা দিন তো এখন সেই ঝামেলাতেই কাটবে। লম্বা-চওড়া কথা তো বলে, কত ধানে কত চাল দেখাই যাক না।

ছোটমাসীরা থাকে গড়িয়াহাটের কাছে, একটা দোতলার ফ্ল্যাটে। মিলুকে নিয়ে গিয়েছিল।

নীচের তলায় বেতের চেয়ারে বসা খাকি হাফপ্যাণ্ট পরা বুড়োটার চেহারা মনে পড়তেই হেসে ফেললে।—কিচ্ছু করবে না, কিচ্ছু করবে না, চলে যাও গটগট করে।

বলেই বাঘের মত কুকুরটার নাম ধরে ডাকলো, জিমি! জিমি!

অচেনা লোক দেখে কিচ্ছু করবে না যদি, তো কুকুর পুষেছো কেন হে?

ছোটমেসোও তেমনি।—ভয় পেও না, ভয় পেলেই কামড়ায়।

যাব্বাবা, ভয় কি সিনেমা হলের পর্দা, সুইচ টিপে সরানো যায়? মেয়েদের কাছে প্রেমটাও তাই কিনা কে জানে। দিব্যি অন্যদের সঙ্গে হেসে খেলে আড্ডা দিয়ে কাটাবে, হিসেব করে একটা দিন দেখা করবে, তখন চোখ ছলছল, গাঢ় গলার কথা। অরুণ এদিকে চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলে মরে। রুণু ভালোটালো বাসে না, বাসে না, নেহাত দেখছে একজন কাবু হয়ে পড়েছে!

সেদিন সিনেমা দেখতে গেল, অরুণ ভাবলে সিনেমার পর কোথাও ফাঁকায় গিয়ে বসবে, যদি পাটনা যাওয়ার কথাটায় কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকে, প্রমাণ দাখিল করবে। কোথায় কি, ছবি শেষ হয় নি, অরুণ হঠাৎ লক্ষ্য করলে অন্ধকারেই রুণু মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে। সরবতের গ্লাসের স্ট্রতে বাচ্চাদের দু'বার মুখ দিতে দিয়ে 'আর খেও না' বললে যেমন লাগে, রুণু তেমনি একটা অতৃপ্তি। এসেই চলে যেতে চাইবে।

তবু অরুণ একটু আশায় আশায় ছিল। ভেবেছিল, ছবি শেষ হওয়ার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে তো বেরিয়ে পড়ে রুণু, পাছে আলো জ্বললে কেউ দেখে ফেলে, চিনে ফেলে, সেজন্যেই হয়তো ঘড়ি দেখছে। তা না, রুণু হঠাৎ বললে, এই, তুমি ছাখো। আমি চলি, দেরি হয়ে যাবে।

কি খারাপ লেগেছিল। তুমি ছাখো! আমি যেন সিনেমা দেখতেই এসেছি, টিকিটের পয়সা উস্থল না করে উঠবো না।

সে দিনটাই বরবাদ। ভেবেছিল, আর কোনদিন রুণুর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না। রুণুর কথা ভাববে না। অথচ ঘুরে ঘুরে পুরোনো দৃশ্যগুলোই চোখের সামনে ভাসে। দোলের দিনে যখন আবীর পাঠিয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই ভালবাসতো রুণু।—এখন—অয়ন হয়তো আবার ওর মন জুড়ে বসেছে। কি নাম রে বাবা—অয়ন।

তবু যা হোক, এরই ফাঁকে টিকলুদের প্রেসের ফোন নম্বরটা বলে দিয়েছে এক সময়। লিখে নিতে বলেছিল, রুণু এমনভাবে 'মনে

থাকবে রে বাবা, মনে থাকবে' বলে উঠলো যে, আর জোর করতে সাহস হয় নি। টিকলুর বাবা দুপুরে যখন খেতে যায় তখন ফোন করতে বলেছে অরুণ। করবে কিনা কে জানে।

ছোটমাসীর বাড়িতে গিয়ে টেলিফোনটা দেখে অরুণের খুব লোভ হয়েছিল। ঈস্, অরুণদের বাড়িতে যদি একটা ফোন থাকতো, কি মজাই না হতো। কথা বলতে অবশ্য পেতো না, মা ঠিক জিজ্ঞেস করতো, কে কথা বলছিল রে! কথা না-ই বা বললাম, বিরাম আর ওর আগের লাভার কেয়া যা করতো, ক্রিং ক্রিং দু'বার বাজলো, অন্য কেউ রিসিভার তুললেই কাট। মানে নির্দিষ্ট জায়গায় যাচ্ছি, তুমি চলে এসো।

প্রকাশবাবু বললেন, তা অ্যাপ্লাই করে দে, দেরি করছিস কেন। বলেছে যখন···

অরুণ বললে, হ্যাঁ, আজকেই করে দেবো।

আসলে যেখানে ওর নিজের মনেও খিঁচ লেগে গেছে সে-ব্যাপারটা আর বললো না। বাবা তো সেই আদ্যিকালের লোক, বলে বসবে, না না, চুরি জোচ্চুরি করে ও চাকরির দরকার নেই। অরুণের নিজেরও অবশ্য ভাল লাগছে না, কিন্তু না করেই বা উপায় কি। ছোটমেসোও তো একজন গাভমেণ্ট অফিসার, গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট দিতে পারে। সে যখন বলছে—

রেফ্রিজারেটার কিনেছে।

চাকর গোপেনকে ছোটমাসী বলেছিলেন, ফ্রীজ থেকে জল দিও গোপেন।

মিলু দেখে তো আহ্লাদে আটখানা—লাভলি। কি সুন্দর দেখতে রে দাদা।

অরুণ ঘাড় নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ। কত দাম ছোটমাসী?

ছোটমাসী এড়িয়ে গিয়ে বললে, কত যেন, হায়ার পারচেজে কেনা তো। অনেক বেশী লাগে।

ভাঙা টেবল্ ফ্যানটায় ঘটাং ঘটাং আওয়াজ হয়, মিলুর পড়ার ঘরের পাখা তো প্রায়ই খারাপ, কিন্তু বাবাকে বলে বোঝাতে পারলো না অরুণ, যে এক সঙ্গে যখন অত টাকা দেয়া যাবে না, তখন হায়ার পারচেজে পাখা কিনলে দোষ কি।

—তুই পাগল হলি নাকি? ও তো কাবলের সুদকেও হার মানায়। ওসব ফোতো লোকদের জন্যে। বাবা একদিন বলেছিল। —ধারদেনা করে জিনিস কেনা আমি বেঁচে থাকতে হবে না।

হায়ার-পারচেজ নাকি ধারদেনা। বাবা সেই সেকেলেই রয়ে গেল। কিছুতেই বোঝানো গেল না ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে বুড়িয়ে গিয়ে লাভ হয় না।

সুজিতও একদিন বলেছিল, এখনই যদি সব না পেলাম, বুড়ো বয়সে পেয়েই বা কি লাভ।

টিকলু সায় দিয়েছিল।—বেড়ে বলেছিস সুজিত। আরে বাবা, লাইফটাকে একটা হায়ার-পারচেজ করে নে। এখন ভোগ কর, পরে দাম দিবি। তা না, এখন চিনেবাদাম খেয়ে পেট ভরাও, শালা ফল্‌স্ টীথ দিয়ে মাংস চিবোনোর আশায়।

অরুণের নিজেরও সে কথা মনে হয়। এক এক সময় ছোট-মেসোকে মনে হয় চৌকোশ লোক, এ যুগের মানুষ। বাবার মত পাপপুণ্য, পাঁজি পুজো, হৃষিকেশবাবুকে নিয়ে বসে নেই।

অরুণ যেতেই সাফ-সাফ কথা ছোটমেসোর।—দেখো বাপু, তেল সবাই দেয়। তবু কাজ হয় না কেন জানো? তেল দিতে জানা চাই। পেট্রোলের জায়গায় পেট্রোল, মোবিলের জায়গায় মোবিল দিতে হয়। উল্টোপাল্টা হলেই ইউ নো হোয়াট উড হ্যাপ্‌ন।

তারপর বলেছিলেন, তোমার বাবা তো চাকরি চাকরি করে খেয়ে ফেললে।

অরুণের তখন অবশ্য খারাপ লেগেছিল। ডাঁট! 'তোমার বাবা কি রে, বড় ভায়রাভাই, 'দাদা' বলতে পারো না?'

তবু মোবিলের জায়গায় মোবিল দিয়েছে অরুণ, হেসে বলেছে, বাবা আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলবেন। কে আছে আর?

ছোটমেসো খুশী হয়েছেন। তোষামোদ এমনি জিনিস বাবা, ধরতে পারলেও ভাল লাগে। কি করে দরখাস্ত-টরখাস্ত করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন, শুধু গ্র্যাজুয়েট লিখবে, এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছি লিখবে না, আর এক্স্‌পিরিয়েন্স আছে বলে এমপ্লয়ার্স সার্টিফিকেট দেবে সঙ্গে।

অরুণ অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলেছে।—আমি তো চাকরিই করিনি। চাকরি পেলে আর চাকরি খুঁজবো কেন?

ছোটমেসো হা হা করে হেসে একটা নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে বলেছেন, অবিনাশবাবুর কাছে গিয়ে দেখা করো, আমি ফোনে বলে রাখবো। ওঁর একটা ফ্যাক্টরি আছে।

এ ধরনের একটা জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি! তা চাকরি হওয়া নিয়ে কথা, সুতরাং অরুণ ঘাড় নেড়ে বলেছে, তা নিয়ে আসতে পারবো।

কিন্তু ওখান থেকে চলে এসে ওর খুব খারাপ লেগেছে। এ যেন টিকলুর মত টুকে পাস করা, যোগ্যতার জন্যে চাকরি পেলাম ভাবতেও পারবো না। মরুক গে। যোগ্যতা দেখিয়ে কতই যেন চাকরি হচ্ছে।

বাবার কাছে ব্যাপারটা স্রেফ চেপে গেল অরুণ।

তারপর দুপুরে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ছোটমেসোর নাম করতেই অবিনাশবাবু বললেন, হ্যাঁ, ফোন তো আমাকেও করেছেন। কিন্তু তা কি সম্ভব নাকি?

—তা হলে? অরুণ আশা করে এসেছিল, কথা শুনেই বসে পড়লো। বসে পড়লো মানে উঠে দাঁড়াতে গেল। অফিস টাইমে ঠেলেঠুলে বাসে উঠলাম, মাঝপথে ব্রেকডাউন—যাবে না, যাবে না, নেমে পড়ুন।

অবিনাশবাবু বললেন, তবে একটা কিছু তো করতেই হবে।

তার মানে অবিনাশবাবু একটা ক্ষুদে ফ্যাক্টরির মালিক। ছোটমেসোর চেয়ে সেই বা কম কি। অতএব একটু উপেক্ষা করে, একটু সম্ভ্রম দেখিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করলেন।

বললেন, আরে ভাই, অডিট আছে, ইনকাম-ট্যাক্স আছে, স্যালারি বিল আছে, অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার আছে। লিখে দিলেই হলো নাকি।

অরুণ সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ালো।—উনি বললেন বলেই এলাম।

—দাঁড়াও হে, দাঁড়াও। অবিনাশবাবু হাসলেন।—তোমাদের একালের ছেলেদের দেখছি মাথা গরম হয়েই আছে। শোনো—

বলে কোম্পানীর লেটার হেডের প্যাড থেকে একখানা নাম ছাপা কাগজ নিয়ে এগিয়ে দিলেন।—এই নাও, যা খুশী লিখে নীচে আমার হয়ে সই করে দিও। ওসব কেউ এনকোয়ারী করে না, গাভমেণ্ট সার্ভিস তো নয়।

বাঃ, তা হলেই তো হয়। অবিনাশবাবুর সই তো আর কেউ চেনে না। একটা সার্টিফিকেট নিয়ে কথা।

ছোটমেসোর কথামত দরখাস্ত সার্টিফিকেট সব পাঠিয়ে দেওয়ার পর কিন্তু কেমন খারাপ লাগলো অরুণের। বুকের মধ্যে খিচখিচ। চাকরি পেলেও শান্তি থাকবে না, স্বস্তি থাকবে না। 'কেউ এনকোয়ারী তো করে না'। করে না ঠিকই, কিন্তু তা হলে তুমিই বা লিখে সই করে দিলে না কেন? মানে, যদি কখনো কেউ পিছনে লেগে ধরিয়ে দেয় তখন উনি স্রেফ গা বাঁচাবেন—সে কি, আমার সই তো নয়, নিশ্চয় কেউ লেটার হেড চুরি করে…

অরুণ দরখাস্ত পাঠানোর আগে অবধি খুশীতে ডগমগ করছিল, এমন কি সুজিত আর টিকলুর ওপর যে একহাত নেওয়া যাবে তাও ভেবেছিল। জলজ্যান্ত একটা চাকরি, খুশী হবে না?

কে জানে, ছোটমেসোর সাজানো ফ্ল্যাট, রেফ্রিজারেটার,

হামবড়াই ভাব—এসবের মধ্যেও হয়তো এমনি সব খিচখিচ আছে, কাঁটা বিঁধছে।

ছোটমেসোর বাড়ি থেকে সেদিন ফেরার সময় মিলু বলেছিল, বেশ মজাসে আছে ওরা, না রে দাদা ?

অরুণ তিক্তভাবে বলেছিল, ফুটানি শুধু।

পরে মনে মনে বলেছিল, আমরা সবাই বোধ হয় ছোটমেসো হতে চাই। পারবো না তো, তাই টেনে লাথি মারতে ইচ্ছে করে।

নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে গাড়ি চালাচ্ছিল যে লোকটা, বাচ্চাটাকে দেখে জোরে ব্রেক কষা সত্ত্বেও টিকলু তাকে ধাঁই করে একটা রদ্দা মেরেছিল কেন ? মেরেটেরে পরে বলেছিল, ও ব্যাটার কিন্তু দোষ ছিল না মাইরি !

আহা, রুণুর যেন ইচ্ছে করে না। অরুণের কথা শুনলে এমন হাসি পায় এক এক সময়। যেন অরুণেরই শুধু দেখা করতে ইচ্ছে করে, অনেকক্ষণ কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে করে, গল্প করতে ইচ্ছে করে। আর রুণুর বুঝি কিছু ইচ্ছে করে না?

শেষ অবধি সিনেমা দেখার কি উপায় ছিল নাকি? অরুণ হয়তো ভেবেছিল ওখান থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে একটু বসবে, গল্প করবে। রুণু তাড়াতাড়ি হল থেকে বেরিয়ে পড়াতে, অরুণ··· নিজের মনেই হেসে ফেললো রুণু···নন্দিনী থাকলে গাল ফুলিয়ে দেখাতো অরুণ কি রকম রাগ করেছে। তারপর দু'জনে মিলে খুব হাসতো। আর হাসতে হাসতে রুণুর একটু কষ্টও হতো। এখনো তো সত্যি কষ্ট হচ্ছে। শুধু তো একটু সময় চেয়েছিল বেচারা।

নন্দিনীর জন্যেও একটু কষ্ট হয়। যা বোকাসোকা মেয়ে। গিয়ে নিশ্চয় বিরামের সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু তারপর? ছেলেদের কি কোন বিশ্বাস আছে নাকি? সবাই তো আর অরুণের মত ভাল নয়। নন্দিনী ওকে প্রচণ্ড একটা অভাব দিয়ে গেছে। নন্দিনীর অভাব। দিব্যি দু'জনে মিলে মন খুলে কথা বলতে পারতো, সুখ-দুঃখের কথা, প্রচণ্ড অভিমান কিংবা প্রকাণ্ড আনন্দের কথা। বাড়ির অবস্থা তো ভাল নয়, পড়াশুনো শেষ করে হয়তো চাকরি করতেও হতে পারে রুণুকে। মামার কাছে আছে তো সেজন্যেই। বাবা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে বহরমপুর থেকে। একদিন হঠাৎ এসে হাজির, এদিকে বাস-স্টপে গিয়ে দেখা করার কথা অরুণের সঙ্গে। যেতে পারে নি, অরুণ নিশ্চয় অপেক্ষা করে করে ফিরে গেছে। পরে যখন জিজ্ঞেস করলে, 'সেদিন রাগ করেছিলেন?'

অরুণ হেসে উঠে বললে, 'না না, দিব্যি কফি হাউসে গিয়ে উর্মির সঙ্গে আড্ডা দিলাম।' মানে, বোঝাতে চাইলে, কেউ না থাক, উর্মি তো আছে। অরুণের সব ভালো, রেগে গেলে এত আঘাত দিয়ে কথা বলে। রাগটা কি জন্যে, না, রুণু নাকি ওকে ভালবাসে না। ওর একটু একটু সন্দেহ হচ্ছিল, পাটনা যাওয়ার কথা একেবারে বানানো। স্রেফ সেদিনের ব্যাপারটার শোধ নেবার জন্যে ইচ্ছে করে আসে নি। আসে নি অথচ কষ্ট পেয়েছে। অবশ্য বলা যায় না, ওসব কিছু নাও হতে পারে, উর্মির সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে ভুলেই গিয়েছিল হয়তো। সেইসব কথা, কিংবা আজকের সিনেমা হল থেকে হঠাৎ চলে আসার কথা নন্দিনীর কাছেই বলতে পারতো। মন হাল্কা হতো। অথচ এখন সব নিজের মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হচ্ছে। আরে দূর, নন্দিনী থাকলে নিজের কষ্টের কথা বলতো নাকি। শুধু অরুণ ওকে কি ভীষণ ভালবাসে সে-কথাই বলতো। দিব্যর কথা কিংবা অয়নের কথাই বা কতটুকু বলেছে। রুণুর হঠাৎ দিব্যর কথা এক ঝলক মনে পড়লো। কি ঝকঝকে চেহারা, প্রথম প্রথম খুব ভাল লেগেছিল, একটু একটু আদর পেয়েছিল। তবু, এখন আর স্পষ্ট কিছুই মনে পড়ে না। আচ্ছা, দিব্য এসেছিল, তারপর অয়ন···হ্যাঁ, অয়নকে সত্যি ভালবেসেছিল। এখন মনে পড়লেও রাগে মাথার শিরা দপ্‌দপ্‌ করে। অরুণকে একদিন একটু বলেছিল অয়নের কথা, তারপর হাসি হাসি চোখে অরুণের মুখখানা দেখে আরো হাসি পেয়েছিল।

রুণু ভাবলে, আচ্ছা, তাহলে আমি কি খারাপ? কেউ শুনলে তাই ভাববে হয়তো। বাঃ রে, ও খারাপ হবে কেন, ও তো বার বার ভুল করছে। বুঝি না বাবা, ভুল হয়েছে জেনেও তাকেই ভালবাসো, বিয়ে করো, সবাই ভাল বলবে। ভুল শুধরে নিতে গেলেই— খারাপ, খারাপ। এ-সব কথা নন্দিনীও বোঝে না।

ডাক্তার রুদ্রর কথাও এখন আর কাউকে বলার উপায় নেই।

মামার কাছে আসে, গল্প করে, বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। দারুণ স্মার্ট। কিন্তু লোকটাকে একটুও ভাল লাগে না। বিরামকেও বিশেষ ভাল লাগতো না।

ডাক্তার রুদ্রর চোখ ছুটো ঝকঝক করছে, ছটফটে স্বভাব, দিব্যি রোজগার করছে নাকি এই বয়সে। গাইনোকোলজিস্ট তো, ওদের আজকাল খুব পসার। মামাবাবু অবশ্য মামীমাকে একদিন বলছিলেন, টাকাই কামাচ্ছে, কি করে কামাচ্ছে আমার জানতে বাকী নেই। মামাবাবু ঠিকই বলেন, লোকটার চাউনি ভাল লাগে না রুণুর। ভাব দেখায় যেন সরল পুঁটি, হাঁকডাক করে রুণুর সঙ্গে কথা বলে, একদিন সিঁড়িতে মুখোমুখি পড়ে গিয়ে ভীষণ ভয় পেয়েছিল রুণু।

বাড়ি ফিরে দরজার আশেপাশে ডাক্তার রুদ্রর গাড়িটা না দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো। তরতর করে ওপরে উঠে এলো। টেলিফোন বাজছে শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠলো। সকালে অরুণ ফোন করেছিল, তারপর থেকে টেলিফোন একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। অরুণ নয়তো?

এসে দেখলে মামীমা রিসিভার তুলেছেন।

—রুণু, ছাখো তো কে, তোমাকে চাইছে।

মামীমার হাত থেকে রিসিভার নিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে গেল। আরে দূর, বলে দেবো কলেজের ছেলে, একসঙ্গে পড়ি।

—অ্যাঁ? নন্দিনী তুই?

মামীমা চলে যাচ্ছিলেন, নন্দিনীর নাম শুনে, রুণুকে চোখ বড় বড় করে কথা বলতে দেখে থেমে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনে কথা বললো রুণু। কথা বলতে বলতে ওর ভুরু কুঁচকে গেল। দেখেছো কাণ্ড, অরুণকে ও এত বিশ্বাস করে, মনে করে ওর কাছে কিছু গোপন রাখতে পারে না অরুণ, অথচ আজ এমন ভান করলে যেন নন্দিনীর সম্পর্কে কোন

খবরই রাখে না। বিরাম বলতে বারণ করেছিল বলে রুণুকেও বিশ্বাস করে বলতে পারবে না? তা হলে আর তার মুখের কথাকেই বা কি বিশ্বাস। হো হো করে প্রাণ খোলা হাসি হেসে বলেছিল, 'ঊর্মি? তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? ফ্রেণ্ড, আবার কি!' তারপর গাঢ় গলায় কৌতুক মিশিয়ে বলেছিল, বোকা মেয়ে, তার সঙ্গে প্রেমফ্রেম থাকলে তোমার জন্যে ছটফট করবো কেন?

রুণু কত সহজে বিশ্বাস করেছিল।

—কি বললে? কোথায় আছে? মামীমা জিজ্ঞেস করলেন।

সব বললে রুণু। বললে, ওর দাদাকে চিঠি দিয়েছে।

নন্দিনীর জন্যে দুশ্চিন্তায় বুকের ভেতরটা কেমন ভারী ভারী ছিল, এতদিন বুঝতেই পারে নি। এখন একেবারে হাল্কা লাগছে নিজেকে।

নানা কথা, আলোচনা, তার পর এক সময় নিজের টেবিলের সামনে এসে বসলো রুণু। চাবি বের করে দেরাজ খুললো। ওর সেই টুকরো টুকরো করে যোগাড় করা সুখের দেরাজ। একটা বড় খামের মধ্যে সিনেমার ছেঁড়া টিকিট দুটো রাখলো। অরুণের সঙ্গে যতবার সিনেমা দেখেছে টিকিটের টুকরো-দুটো চেয়ে নিয়েছে, সাজিয়ে রেখে দিয়েছে এই খামের মধ্যে। টিকিটগুলো বের করে একবার গুণলো, গুন গুন করলো মনের মধ্যে, আবার রেখে দিলো।

প্রথম যেদিন টিকিট দুটো চেয়েছিল, অরুণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। —কি হবে?

রুণু হেসে বলেছিল, আমার জানেন একটা দেরাজ আছে, তাতে সব জমিয়ে রাখি, মাঝে মাঝে বের করে দেখতে এত ভাল লাগে···

অরুণ হেসে বলেছিল, আমার বুকের মধ্যে একটা দেরাজ আছে। সেখানে আমি সব জমিয়ে রাখি, সব।

সকলের আছে, সকলের। টুকরো টুকরো সাধ, টুকরো টুকরো আনন্দ সেখানে জমা হয়ে থাকে।

নন্দিনীর সঙ্গে একবার খুব ঝগড়া হয়েছিল রুণুর। প্রায়ই হতো,

তারপর আবার মিটমাট। সেবার নন্দিনী খুব বড় একটা চিঠি লিখেছিল, নন্দিনী ওকে কত ভালবাসে সে কথা জানিয়ে। সেই চিঠিটা দেরাজ থেকে বের করে রুণু একবার পড়লো।

নন্দিনীর ওপর যত রাগ সব জল হয়ে গেল। মনে হলো নন্দিনীর চেয়ে আপন আর কেউ নেই।

প্রেম কি রুণু তা আগে জানতোই না। এখন তো মনে হয় এটাই প্রেম, আসল প্রেম। এর আগের ছুটো—ছোট্ট, একেবারে ছোট্ট। নন্দিনীকে সে গল্প সাত কাহন করে বলেও ছিল। তখন অরুণেব সঙ্গে আলাপও হয় নি। এখন ভাবলে কখনো মুখে ক্যাডবেরী খাখার মত মিষ্টি মিষ্টি লাগে, কখনো আবাব অনুরাধার দাদার সেই 'তোমার মত সুন্দর দেখি নাই' চিঠির মত হাসি পায়।

—অয়ন? খুব সুন্দর নাম তো? অরুণ বলেছিল।

রুণুব নিজের কেমন অপরাধী অপরাধী লাগতো, অয়নের কথা তাই একদিন আভাসে বলেছিল অরুণকে। যখন বলেছিল, তখন অয়ন শুধুই একটা নাম, মুছে যাওয়া সুন্দর একটি নাম।

—আমার কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল—অরুণ হেসে উঠেছিল কথা বলতে বলতে; বলেছিল, আমি ভেবেছিলাম অয়নেব কথা বলে তুমি আসলে বলতে চাইছিলে, বড্ড ভুল বাস্তায় এগোচ্ছেন সার, আর এগোবেন না।

কি কথা! রুণু কোথায় আরো আপন হতে চাইছিল! তা না···

—জানো, আমি না···একটা কাজ ভুলে গেলে আমার রাত্রে একদম ঘুম হয় না।

অরুণ হেসেছিল।—কি কাজ? নীল-ডাউন হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা?

—প্রায়। রুণু হেসে বলেছিল, শোবার আগে আমি রোজ বালিশের ওপর তোমার নাম লিখি আঙুল বুলিয়ে। না লিখে

আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। তারপর হেসে ফেলে বলেছিল, ঘুম আসেই না।

রুণুর আজ হঠাৎ মনে পড়লো, ও অনেক দিন আর বালিশে নাম লেখে নি অরুণের। মনে মনে ভাবলে, আজ রাত্রে নিশ্চয় নিশ্চয় বালিশের ওপর আঙুল বুলিয়ে অরুণের নাম লিখবে, তারপর সেই নামের ওপর মাথা রেখে ঘুমোবে।

এই সময়ে ওর এক একদিন অরুণকে ভীষণ ছুঁতে ইচ্ছে করে। অরুণটা স্রেফ পাগল, তা না হলে কেউ এমন পাগলের মত ভালবাসে? রুণুর এত হাসি পায় সেসব দিনের কথা মনে পড়লে! আরে, ছুঁতে ইচ্ছে তো ওরও হয়েছিল, প্রতিদিনই হতো প্রথম প্রথম।

—বা রে, হাত সরিয়ে না নিলে তুমি আমাকে খারাপ ভাবতে না? তা না হলে, আমার নিজেরই তো ইচ্ছে হয়েছিল তোমার হাতের ওপর হাত রাখি।

—সত্যি? অরুণ খুশী হয়েছিল শুনে। অরুণের খুশী-খুশী মুখের দিকে তাকিয়ে রুণু বলেছিল, খুব হয়েছে, আর গর্বে নাক ফোলাতে হবে না।

অরুণ হেসে ফেলেছিল।—তুমি তো আমার গর্বই। কিন্তু সেদিন সত্যি বড় কষ্ট হয়েছিল। বিরাম জ্বর জ্বর লাগছে বললে প্রথম দিন, আর তুমি তার কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখলে, অথচ আমি হাত ছুঁতে গেলাম যেদিন···

রুণু ভাবলে, আচ্ছা, অরুণ যে বলে ওর সঙ্গে দেখা না হলে বুকের মধ্যে কি রকম সব হয়-টয়, যন্ত্রণা, কষ্ট, জ্বালা···সব সত্যি? না ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বলে! আহা রে, রুণুর যেন সব ভাল। দেখতে সুন্দর, গলার স্বর ভরাট ভরাট, কথার মধ্যে জাদু আছে, আরো কত কি। উফ্, এত মন যুগিয়ে কথা বলে!

—সুন্দর তো সুন্দর, কিসের মত সুন্দর? একটু কৌতুক করে রুণু প্রশ্ন করেছিল।

অরুণ বলেছিল, স্তবের মত।

আনন্দে চোখ বুজে ফেলেছিল রুণু। তারপর হেসে উঠে বলেছিল, এর নাম কি জানো? স্তাবকতা।

অরুণকে চেনা সত্যি মুশকিল। এক এক সময় এক এক রকম। এত খেয়ালী, হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক, তখনই উচ্ছ্বাস, তখনই নির্বিকার। ওর নিশ্চয় ভিতরে কোথাও একটা গভীর দুঃখ আছে।

একদিন হঠাৎ বললে, তোমার চেয়ে সুন্দর মেয়ে তো অনেক আছে, কিন্তু তুমি সুন্দরী হয়েও অন্য রকম।

তখন তো ওরা অনেকখানি অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে, রুণু বললে, এর নাম কি জানো? স্তুতি।

অরুণ হেসে উঠে বললে, কিংবা প্রস্তুতি।

ওর ওই এক দোষ। এক একটা কথা অরুণের বুকের ভিতর থেকে, অনেক গভীর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে, মনে হয় অন্য রকম। অন্য ছেলেদের থেকে একেবারে পৃথক। আবার এক এক সময় ও এত হাল্কা, এত চটুল, যে মনে হয় রুণুর সঙ্গে খেলা করছে।

কিন্তু একদিন এমনি হাল্কা কথাকে খুব হাল্কা ভাবে যেই না নিয়েছে রুণু, অমনি অরুণের মুখ থমথম করে উঠলো। ধীরে ধীরে বললে, হাসতে হাসতে বলা সব কথাই হাসির নয়। বললে, সবচেয়ে দুঃখের কথাগুলোই আমরা হাসতে হাসতে বলি।

রুণুর ইচ্ছে করে অরুণকে বলে, তুমি আমাকে একটা চিঠি লেখো। সত্যি, সামনা-সামনি অরুণ কিই বা বলবে। যা কিছু বলতে ইচ্ছে হয়, রুণুই কি বলতে পারে? অরুণ যদি অনেক দূরে কোথাও চলে যায় তা হলে খুব ভাল হয়। তখন রোজ কলেজ থেকে ফিরে ও চিঠির বাক্স দেখবে। বাক্সে কোন চিঠি থাকবে না, থাকবে না, মনে হবে অরুণ ওকে ভুলে গেছে, তারপর ঝট করে একদিন একটা নীল রঙের খাম, নীল বা গোলাপী, কিংবা কমলা রঙ।

কমলা রঙ অরুণ পছন্দ করে। রুণু একদিন কমলা রঙের শাড়ি পরে গিয়েছিল।

—না বাবা, তোমার চিঠি খুলে আমার কাজ নেই। কলেজে পড়ছো, কি চিঠি কে জানে। বলে রসিকতা করেছিলেন মামীমা অয়নের চিঠিটা রুণুর হাতে দিয়ে।

চিঠিটা যে সরল রেখার মত, তখন অয়নের চিঠি সরল রেখা, রুণু জানতো। তাই বলেছিল, মামীমা, খুলে দেখলেই তো পারতেন।

জবাবে এই কথাই বলেছিলেন মামীমা। বলেছিলেন, আমি বাপু অত খুঁতখুঁতে নই, শুধু তোমার বাবা যেন দোষ না দেন আমাদের।

বাবার কথা, মা'র কথা, ছোট ছোট ভাই-বোনদের কথা ভাবতে গেলেই রুণুর সব ওলোটপালোট হয়ে যায়। ওর ওপর অগাধ বিশ্বাস বাবার, রুণু কোন অন্যায় করতে পারে না, রুণু বাপ-মা'র অবাধ্য হতে পারে না। রুণু চাকরি করবে, করে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে।

চাকরি করতে ওর কিন্তু একটুও ইচ্ছে করে না। যখনই বাবা কোথাও কোন বিয়ের চেষ্টা করেন, ওকে দেখতে এসে একজনের তো খুব পছন্দ হয়েছিল···তখন রুণুর ভীষণ ভাল লেগেছিল। নন্দিনীর সঙ্গে অনেক গল্প করেছিল। নাঃ, নিজের বিয়ের জন্যে বাবাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, ও নিজেই কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করবে—হয়তো অরুণকেই, কিংবা···। কে জানে, ভাল লাগে না, তবু হয়তো চাকরি করতেই হবে।

মামাবাবু একদিন বলেছিলেন, একজনের রোজগারে সংসার চলবে, রুণু, সে দিনকাল আর নেই। হেসে বলেছিলেন, চাকরি ছেলেদের কয়েদখানা, কিন্তু মেয়েদের তো ফ্রীডাম।

রুণু ফ্রীডাম চায় না।

চুনের আড়ৎদারটা বড়বাজারের গলি বানিয়ে দিয়েছে রাস্তাটাকে। দু-তিনখানা ঠ্যালাগাড়ি পড়ে থাকে সব সময়। কখনো কখনো ঝরঝরে লরী।

বাড়ি ঢুকতে যাবে, দরজার সামনে একটা পেল্লায় গাড়ি, এক্কেবারে হাল মডেলের, এস টি সি থেকে কেনা। ভোজপুরী দারোয়ানের মত দরজা আগলে বসে আছে গাড়িখানা। চুনওয়ালার কাছে কোন ব্ল্যাকের নবাব এলো নাকি। চম্পক বাজোরিয়া এমনি একটা গাড়ি করে কলেজে আসতো। ইউনিয়ন করতো সঞ্জয়, ব্যাটা বিলেত চলে গেল, নির্ঘাত সি আই এর টাকায়। টিকলু তো তাই বলে। 'পরের জন্মে মাইরি মনের মত বাবা বেছে নিতে হবে', টিকলু বলেছিল। সুজিত হেসে বলেছিল, 'নিদেনপক্ষে একটা আই-টি-ও।' গাড়ির ওপর টিকলুর বেদম রাগ। ওদের পাড়ার লাল বাড়িটায় তিন তিনটে বোন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফ্যাশান প্যারেড দেয়। একটা ছোকরা গাড়ি করে আসে, আঙুলে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে ওপরে উঠে যায়। টিকলু-অরুণ ওদের দিকে তাকালে মেয়েগুলো পানের পিক ফেলার মত করে হাসে। গা জ্বলে যায়। টিকলুর তো জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে গাড়িটাকে। একদিন চাকার হাওয়া খুলে দেবে ভেবেছিল। সাইকেলের মত নয়। কি করে হাওয়া খোলে কে জানে।

পেল্লায় বিলিতি গাড়িখানাকে দরজার সামনে দেখে সারা গা চিড়বিড় করলো। কাছে এসে দেখলে লাল ক্রশ মারা। ডাক্তার?

দুদ্দাড় করে ভেতরে ঢুকলো। ছাখো কাণ্ড। জুতো টিপে টিপে, আওয়াজ না হয়, অরুণ বাবার ঘরের দরজায় দাঁড়ালো। যা ভয়

পেয়েছিল তাই। ও কি করবে, ও কি হাত গুণতে জানে, মা'র অসুখ কখন বাড়াবাড়ি হবে!

সব্বাই চুপচাপ, হাসপাতালের মত। ডাক্তার মাকে পরীক্ষা করছে, বাবা তাকিয়ে আছে ডাক্তারের মুখের দিকে। বাবার মুখ ফ্যাকাশে। মিলুর মুখ ছমছম, এক্ষুনি বুঝি কেঁদে ফেলে। ছোট-মাসীর চোখের পাতা ভিজে ভিজে।

অরুণকে দেখে ছোটমাসী তাকালো, মিলু তাকালো, বাবা তাকালো না।

ডাক্তারের মাথা ঝুঁকে পড়েছে, ভাবছে কিছু। বাবা দশ টাকার নোটগুলো আরেকবার গুণলো, বেশী না চলে যায়। কিংবা কম দিয়ে লজ্জায় না পড়েন।

টাকাগুলো না দেখেই যন্ত্রের মত হাতে নিলো ডাক্তার, পকেটে রেখে দিলো। বাবা পিছনে পিছনে গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে গেল।

অরুণ মা'র মুখের দিকে তাকালো। মুখ টকটকে লাল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

মিলু ফিসফিস করে বললে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।··· কোথায় ছিলি এতক্ষণ, বাবা তোর ওপর ফায়ার।

তুমি গাফিলতি করে ফেলে রাখলে এতদিন, আমি ছিলাম না সেটাই দোষ। অরুণের কিন্তু নিজেকে একটু কালপ্রিট-কালপ্রিট লাগলো। ছোটমাসী আর মিলুও হয়তো তাই ভাবছে।

—মা'র বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে! নিজের মনেই মিলুকে যেন বললে অরুণ।

কিন্তু অরুণের কষ্ট হচ্ছে না কেন? বুকের মধ্যে কোন কষ্ট নেই কেন। একটু আগে মুখের ওপর উৎকণ্ঠার ছাপ পড়েছিল, কিন্তু সে তো বানানো। মাকে ও কি একটুও ভালবাসে না? কে জানে বইয়ে লেখেটেকে, লোকে মুখে বলে, কেউই হয়তো তেমন ভালবাসে

না। না কি অরুণই একটা অপদার্থ। মা প্রায়ই তাকে অপদার্থ বলতো। কিন্তু মা'র জন্যে অরুণের কিছু একটা করতে ইচ্ছে হলো। খুব শক্ত কাজ, কঠিন কিছু। গন্ধমাদন বয়ে আনার মত। দু'বছর আগেও তো মা বলতো, বাঁদর ছেলে।

রুণুর জন্যে তো কষ্ট হয় বুকের মধ্যে।

—মা কি জিনিস আরেকটু বড় হলে বুঝবি। দিদি একদিন বলেছিল। ও তো অ্যাডভাইসারি বোর্ডের চেয়ারম্যান। এখন তো মা'র এই অসুখ, আয় না তুই, সেবা করবি।

উর্মির ওপর থেকে থেকে রাগ হচ্ছে। টিকলুর ওপরও রাগ হচ্ছে।

অরুণ আর সুজিত কোজি নুকে বসে ছিল। কফি হাউসে গেলেই খরচ। পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর থেকে ফাণ্ড শর্ট। ইনকাম নেই এক পয়সা, কেবল মা'র কাছে হাত পাতো। এখন তো তাও বন্ধ। টেক্সট্ বইগুলো তো সব বিক্রমপুর করে দিয়েছে পুরোনো বইয়ের দোকানে, ভেবেছিল টয়েনবির বইটা কিনবে। পারে নি। বাবার কাছে চাইবে কি, বাবা হয়তো টয়েনবির নামই শোনে নি। সে আমলে গিবন ছাড়া কাকেই বা চিনতো। লাইব্রেরী ডিপোজিট তুলে নিলো, তাও হাওয়া।

টিকলু লাফাতে লাফাতে এলো, যেন ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কার করেছে। ছাড়ানো মুর্গীর ঠ্যাঙের মত কাঁধ দুটো উঁচু করে নাটক-নাটক গলায় বললে, 'আমি বিশুদ্ধ, আমি পবিত্র।'

তারপর চেয়ার টেনে নিয়ে ধপ করে বসলো। চেয়ারটা মচমচ করলো। বললে, উর্মি আমাদের গঙ্গাজলে ভাজা খুর্জার ঘি মাইরি।

অরুণের বিরক্তি মুখেও ফুটলো।—ও কি তোর বাবার দেখা পাত্রী, এত খুঁত খুঁজে বেড়াস কেন।

টিকলু বাধা পেয়ে চটে গেল।—তুই আর সতী ফলাস না, তুইও উর্মির সঙ্গে পিংপং খেলছিস কিনা কে জানে।

সুজিত বললে, রুণু আর উর্মি ছাড়া আর সবাই ডালডা।

টিকলু হেসে উঠলো।—হাতে হাতে প্রমাণ। উর্মিকে আজ দেখলাম নিউ মার্কেটে, এস কে এম-এর সঙ্গে। ট্যাক্সিতে উঠলো, ট্যাক্সিতে।

সুজিত আর অরুণ দু'জনেই চুপ করে গেল। দু'জনেরই ভীষণ খারাপ লাগলো।

মা'র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে চেয়ারে বসে আবার কথাটা মনে পড়ে গেল। ধুত্তোর, একটা সিগারেট ধরাবে তার উপায় নেই। বাবা, ছোটমাসী···ঘরে বসে সিগারেট খেতে না পেলে···

কিন্তু উর্মি শেষে এস কে এম-এর সঙ্গে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে? ছি ছি। বাঃ রে, তাতে কি, অরুণও দিদি কিংবা মা হয়ে গেল নাকি? ছোটমেসোর ওপর, মা বাবার ওপর, দিদির ওপর চটে গিয়েছিল ও। যত সব গেঁইয়া, একটা মেয়ের সঙ্গে একটু গল্প করলো কিংবা সিনেমায় গেল, অমনি ভেবে নিলো সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাওয়া যেন এতই সহজ।

অরুণ একদিন বলেছিল, বাবা মা মাইরি আমাদের একটুও বোঝে না। ওরা ভাবে আমরা খুব ফুর্তি করে নিচ্ছি।

টিকলু হেসেছিল।—বুড়োগুলোকে নিয়ে ঐ তো এক ঝঞ্ঝাট। উর্মির সঙ্গে আমরা যে সেদিন বসেছিলাম প্রিন্সেপে, দেখলি তো। রকবাজগুলোকে তবু বুঝি, পকেটে পয়সা না থাক্ শেয়ারে ট্যাক্সি করার সাধ। কিন্তু বুড়োগুলো? হিংসেয় সব পুলিস-কুকুর।

সুজিত হতাশ গলায় বলেছিল, আমরা এদিকে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছি, উর্মি একটু আড্ডাফাড্ডা দেয়, লোকে হিংসেয় জ্বলে, ঐ আমাদের সুখ।

টিকলু হেসেছিল।—তেলাপিয়া ভেজে মাছের গন্ধ ছড়ানো।

অরুণ হঠাৎ ভাবলে, তা হলে? উর্মিকে ওরা সকলেই খারাপ

ভাবছে কেন? এস কে এম-এর সঙ্গে একদিন দেখা গেছে বলেই সে খারাপ হয়ে গেল! তা হলে আর বাবা-মা'র দোষ কি? আমরাও ভিতরে ভিতরে খুঁতখুঁতে বুড়ো। একটুও বদলাই নি।

কফি হাউসের গোঁফওলা ছেলেটা আবার কালচার দেয়। উর্মির মগজে ফাইল ঘষতে এসেছিল: ভ্যালুজ বদলে গেছে। মূল্যবোধ-টোধ কি সব বলছিল। আগে এক সময় অরুণও ওসব কথা বিশ্বাস করতো। এখন তো বেশ বুঝতে পারছে গোঁফওলা ছেলেটার তাল ঐসব বুঝিয়ে উর্মিকে হাত করা। ভ্যালুজ বদলেছে তো নিজের বাড়ি থেকে বদলা না বাবা, বাইরে কেন! উর্মি এস কে এম-এর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছে শুনে মাথার মধ্যে চিরিক দিচ্ছে। পিন ফোটার মত। রুণু হলে কি হতো কে জানে। এই এক ভয় সদাসর্বদা। রুণু অন্য কারো সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলে বুকে লাগবে ঠিকই। কিন্তু তার চেয়ে ভয়, টিকলু কোনদিন না এসে বলে, 'আরি বাপ, রুণুকে কার সঙ্গে দেখলাম রে, ব্যাটা দাগী মিথুনলগ্ন, কূয়োয় বসা চোখ', অথচ রুণু নিজে যদি বলে, এর আগে অয়ন···মানে ওসব কিছু না, স্রেফ প্রেস্টিজ। উর্মির কাছে, টিকলুর কাছে, সুজিতের কাছে নিজের সম্মান বাঁচাতে পারলেই হলো। বলতে পারলেই হলো, ও আর নতুন খবর কি, রুণু তো বলেছে আমাকে। আমার কাছে না লুকোলেই শান্তি। বাঃ, তা হলে ভ্যালুজ বদলে যাচ্ছে তো। আগেকার দিনে এটুকুই কি সহ্য করতে পারতো?

সত্যি, ওদের কাছে শরীর ছিল ঠাকুরঘর, দিনরাত শান্তিজল ছিটিয়ে রাখো। মন কিছুই না, কিছু না। কিন্তু অরুণ জানে, শরীরটরীর আছে, শরীরে রক্ত। কখনো হাই, কখনো লো। তবে মন না পেলে কিছুই পাওয়া নয়।

ওরা আমাদের কি বুঝবে? কুড়ি বছরে বিয়ে করে ছেলের বাপ হতো, চাকরি পেতো, সেক্সটেক্স ওদের কাছে তো নোংরা ব্যাপার হবেই।

আরে দূর্, উর্মি খারাপ হতেই পারে না।  তা হলে সেদিন অত ভেঙে পড়তো না।

কি হয়েছিল কে জানে, থেকে থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। উর্মির শরীটা বেশ ছিপছিপে।  ডম্বরুর মত কোমর, মনে হয় এক হাতে তুলে ধরে বাজানো যায়।  শরীরকে সাজিয়ে গুছিয়ে আলোর মত করে জ্বালতে জানে।  তাকিয়ে দেখতে ভালই লাগে।  কিন্তু উর্মি হাসতে পারছিল না।

—কি হয়েছে তোর বল্ তো, একেবারে জিরো পাওয়ার হয়ে গেছিস।

তখনো রোদ্দুর সম্পূর্ণ পড়ে যায় নি।  ইয়া মোটা মোটা কমলারঙের থামওয়ালা প্রিন্সেপ গেটের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। খালি বেঞ্চগুলোয় খালি গায়ে মুটেমজুর ভিখিরি ঘুমোচ্ছিল।  একটা পাগল ওদের দেখে, ভয় পেয়ে কিনা কে জানে, উঠে গেল।

বেঞ্চটা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে বসলো।  রুণু ওসময় দেখলে ডাইরীর পাতা চর্র্র্ করে ছিঁড়ে ফেলে দিতো।  আগে একবার তো ছিঁড়ে ফেলেছিল।  না ফেললে অরুণ আসতো কি করে।  ছেড়ে দাও সেসব কথা।  ভালবাসে বলে কি অরুণ বিকিয়ে দিয়েছে নাকি নিজেকে।  ধুত্তোর, অত সন্দেহ সন্দেহ ভাল লাগে না।  অরুণ ভাবলে, আমি তো খাঁটি, আমি তো জ্বলছি।  সায়েন্স পড়লে এক্স-রে টাইপের কিছু বের করতাম।  বুকের ভেতরটা ফটো তুলে নাও, ত্যাখো, ব্যস্।  আর ঘ্যান ঘ্যান করো না।

ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই হেসে ফেললে অরুণ।  পাগল, তা হলে তো আরো বেশি ধরা পড়তাম। টুকরো টুকরো ভাল লাগাগুলো তো রুণু জানে না।  ওর ভয় শুধু উর্মিকে।  টানটান শালোয়ার পরা পাঞ্জাবী মেয়েটা একবার ঝিলিক দিয়েছিল।  স্লীভলেস ব্লাউজের নন্দিনীকে দেখে একটু কেমন কেমন করেছিল।  আরো কত কত ছোট্ট ছোট্ট গুনগুনুনি।  সব বুকের ফটোতে বেরিয়ে আসতো।

তখন—ঈস্, তুমি এত নোংরা! রুণুর জন্যে এই যন্ত্রণা যেন কিচ্ছু না।

পাশাপাশি বেঞ্চে বসে আছে, অরুণের মনে হলো ঊর্মি অনেক দূরে চলে গেছে। বোধ হয় ধানবাদে।

ওকি, ঊর্মির চোখের পাতা ভিজে ভিজে লাগছে কেন।

—কি হয়েছে তোর, বল্ না। অরুণ বললে।

—কিচ্ছু না। হেসে উঠলো ঊর্মি, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল টপ্ করে পড়লো; কোলের ওপর রাখা সাদা ঢাউস ব্যাগটায়।

অরুণের সমস্ত মন ব্যথায় বিস্বাদ লাগলো। আচ্ছা, ঊর্মি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারকে যেমন ভালবাসে রুণু সে-রকম ভালবাসতে পারে? অরুণকে?

অরুণের ইচ্ছে হয় পাখির মত উড়ে গিয়ে রুণুদের জানলায় উঁকি দিয়ে দেখে। রুণুর চোখ অরুণের জন্যে এমনি একটা পোখরাজ ঝরিয়ে দেয় কিনা।

—আচ্ছা অরুণ, ছেলেরা কি চায় বল্ তো? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ঊর্মি।

—কি আবার চায়। ঊর্মির প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে অরুণ বললে।

ঊর্মি হঠাৎ যেন খুব সীরিয়স হয়ে গেল।—না না, ভালবাসলে ওরা এত বদলে যায় কেন।

অরুণ হাসবার চেষ্টা করলো।—বদলে যায়?

—কি জানি। ঊর্মির মুখ সন্থ বিধবার মত বিষণ্ণ দেখালো।

অরুণ বললে, জানি না। ভালবাসা···অরুণের গলা কেঁপে গেল···আমাদের কাছে একটা প্রচণ্ড অহঙ্কার!

ঊর্মির সমস্ত মুখ রাগে ঝলসে উঠলো।—দম্ভ।

—না না ঊর্মি, গর্ব। প্রচণ্ড অহঙ্কার। পৃথিবী আমাদের কি দিতে পারে? যশ, অর্থ, সম্মান। ছ্যাখ, ওসব পেয়েও বলা যায় না

পেয়েছি, বিনয় দিয়ে লজ্জা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। ভালবাসা? রুণু আমাকে ভালবাসে, প্রাণ খুলে সব্বাইকে বলতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে হয় সমস্ত পৃথিবী জানুক।

—যে জানাতে চায় না, জানাতে ভয় পায়? উর্মির কথার মধ্যে কি একটা জ্বালা।

অরুণ চোখ বুজলো এক পলকের জন্যে। তারপর বললে, তার কষ্ট আরো বেশী। অরুণের গলার স্বর গাঢ় হলো। বললে, আমিও পারি না উর্মি, আমারও ভয় হয়। কি জানি, সকলকে বলে ফেললাম, তারপর হঠাৎ জানলাম, সব মিথ্যে, রুণু হয়তো অন্য কাউকে···আমার সঙ্গে শুধু খেলা-খেলা···

অরুণ চুপ করে গেল, কথা শেষ করতে পারলো না।

উর্মি হঠাৎ অরুণের মুখের দিকে তাকালো। কি যেন খুঁজলো। —অরুণ, তুই বোধ হয় আমার চেয়েও দুঃখী।

—কি জানি, আমি বুঝতে পারি না, বলতে পারি না। আমার কি মনে হয় জানিস উর্মি, আমরা যা বলতে চাই তা বলতে পারি না। কেমন মনে হয় ছোট হয়ে যাচ্ছি। লজ্জা করে, হাসি পায়। আঘাত পাবো এই ভয়ে আগে থেকেই আঘাত দিই।

—ঠিক বলেছিস অরুণ, তুই ঠিক বলেছিস! ধীরে ধীরে উর্মি তার ডান হাতখানা অরুণের বাঁ কাঁধে রাখলো। উর্মি কোনদিন এভাবে অরুণের কাঁধের ওপর হাত রাখে নি।

অরুণ কোনদিন বুঝি এমন সহানুভূতির স্পর্শ পায় নি। ওর বুকের মধ্যে থেকে কান্না ঠেলে উঠতে চাইলো।

উর্মি ধীরে ধীরে বললে, অরুণ, তুই রুণুর কাছ থেকে কিছু পাসনি? কিচ্ছু পাসনি?

অরুণ কোন উত্তর দিলো না। ওর শুধু কল্পনা করতে ইচ্ছে হলো ওর কাঁধের ওপর রুণু ঠিক এমনিভাবে হাত রাখবে, ওর কখনো কঠিন অসুখ হলে রুণু ওর কপাল ছুঁয়ে দেখবে, কিংবা ওর

যদি মৃত্যু হয়—মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা কপালে রুণু কোনদিন তার গাল ছোঁয়াবে।

ঊর্মি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর অস্পষ্ট সুরের মত গলায় বললে, আমার মাঝে মাঝে কি ইচ্ছে হয় জানিস অরুণ। ইচ্ছে হয় যারা ভালবাসা দিয়েও কিচ্ছু পায় না, কিচ্ছু পায় নি, নিজেকে নিঃশেষ করে তাদের জ্বালা জুড়িয়ে দিই।

টিকলু খবরের কাগজটাগজ অত পড়েও না, কখনো খেলার পাতাটা দেখে নিলো, কখনো সিনেমার বিজ্ঞাপন। কোজি স্নুকে একখানা কাগজ আড়াই ভাগ হয়ে টেবিল থেকে টেবিলে উড়ে বসে। বাড়িতে কাগজ আসে না, দরকারও হয় না। চায়ের দোকানেই কৌতূহল মিটিয়ে নেয়।

টিকলু জানতো না। অরুণ সকাল বেলাতেই এসে খবর দিলো।
—চল্ চল্, রেজাল্ট বেরিয়েছে, দেখে আসি।

—ও আর কি দেখবো, ফেল তো করেছি জানি। টিকলু হেসে বললে।

ফেল কথাটা শুনতেও ভয় হলো অরুণের। বুকের মধ্যেটা ধক করে উঠলো। ফেল! তা হলে আর বাড়ি ফিরবে না অরুণ। বাবার কাছে মুখ দেখাবে কি করে।

টিকলুদের ঘরখানার একপাশে দেয়াল ঘেঁষে একটা তক্তপোশ, তার ওপর মাদুর বিছোনো।

টিকলু সেখানে বসে চা খাচ্ছিল একটা ময়লা কাপে। টিকলুর মা অরুণের জন্যেও এক কাপ নিয়ে এলেন।

টিকলুর কথাটা কানে যেতেই।—তোর কি লজ্জা নেই, ফেল করবো বলছিস কি করে? তোর বাবা না খেয়ে তোকে পড়িয়েছে।…

টিকলু হেসে উঠলো।—আমার আবার লজ্জা!

লজ্জা তো ওর এতদূর অবধি ঝুলে ঝুলে এসেছে সেটাই। কি দরকার ছিল বাবা, তুমি নোংরা টুইলের শার্ট পরে প্রেস চালাচ্ছো, আলতুফালতু কথা বলো খদ্দেরদের সঙ্গে, বারো বছর বয়েস থেকে

কম্পোজিটার বানিয়ে দিলেই পারতে। এখন তো টিকলু দু'কান কাটা, কোন কিছুতেই লজ্জা নেই। বাড়িটা লজ্জা নয়? চারপাশে ঝকঝকে নতুন বাড়ি, ওদেরটা পলেস্তারা খসা, ইটের রঙ কালো। বাবাকে দেখলে তো লোকে মেশিনম্যান বলে ভুল করে। ক'ভাই ক'বোন জিজ্ঞেস করলে আঙুল গুনতে হয়, একটা না বাদ পড়ে যায়। মা একটা কালো সজারু, চব্বিশ ঘণ্টা কাঁটা ফুলিয়ে আছে। টিকলু নিজেও ওদের লজ্জা। মা তো কথায় কথায় বলতো, পাড়ায় তোর জন্যে লজ্জার শেষ নেই। কি না ঝগড়া করে একদিন বাঁই বাঁই দুটো ঢিল ছুঁড়ে মজুমদারদের জানলার কাঁচ ভেঙে দিয়েছিলো। কি না ইস্কুলের রাস্তায় টিটকিরি দিয়েছিল লাল বাড়ির মেয়েটাকে। মেয়ে দেখলে আওয়াজ যেন আর কেউ দেয় না। দেবে না কেন। রুণুর মত নৈর্ব্যক্তি হয়ে টিকলুর কাছে কেউ আসবে নাকি। মেয়ে বলো, চাকরি বলো, পরীক্ষায় পাশ বলো, সব ছিনতাই করে নিতে হবে। বাপ একটা ইংরিজী কথার মানে বলে দিতে পারে না, পড়তে বসে এ টি দেব ঘাঁটো, তার আবার ফেল করলে লজ্জা!

লজ্জা তো ওর সুধাও। অরুণ বুক ফুলিয়ে রুণুর কথা বলে, আর ওকে ভাব দেখাতে হয় ওসব কিচ্ছু জানে না। রেষ্টুরেণ্টে বসে গল্প করছিল, 'জানিস টিকলু, আমি গ্লাসে জল খেয়েছি, সেই জল নিজের গ্লাসে ঢেলে নিয়ে খেলো রুণু।' ফূর্তিতে ব্যাটার গায়ে পালক গজিয়েছিল বলতে বলতে। 'বললাম, আরে আমি খেয়েছি, আমি খেয়েছি ওটা।' উত্তর দিলে, 'বাঃ, তুমিই তো খেয়েছো।' যাব্বাবা, এক জলে দু'জনে ঠোঁট ঠেকিয়েই এই, ছোঁয়াছুয়ি হলে না জানি কি করতো। অরুণের পাঁজরে পা রেখে দিব্যি ভারতনাট্যম্ নাচছে মেয়েটা।

—আহা, ছাখ ছাখ, লাভলি! গলি থেকে ট্রাম-রাস্তায় এসেই অরুণ বলে উঠলো।

স্কুটারটা ফটফটিয়ে এদিক ওদিক ঢলে ঢলে ছুটে পালালো। সরু কোমরের নাঙ্গা পিঠ, ফর্সা ফুটফুটে, শাড়ির আঁচল টেনে এনে কোমরে গোঁজা। ছিপছিপে সুন্দর মেয়েটা স্কুটারের পিছনে বসে আছে এমন ভাবে, মনে হলো ছেলেটার পিঠ ছুঁয়ে আছে।

বুকের ভিতরটা শিরশির করে উঠলো। অরুণ বুঝতে পারলো না, বুকের মধ্যে থেকে এক খামচা স্বস্তি কে কেড়ে নিয়ে গেল, চটকদার মেয়ে-শরীরটা, না স্কুটারটা ?

—একটা স্কুটারের এত লোভ হয়! অরুণ ক্ষোভের সঙ্গে বললে। একটু থেমে বললে, ও মাইরি আমাদের ভাগ্যে নেই, আমাদের বেলায় বাসেট্রামে বার্বেল করো!

টিকলু হেসে বললে, ইস্কুটার ? ওসব ছেড়ে দিয়ে একটা রিকশা কেন বরং, রুণুকে বসিয়ে ঠুন ঠুন করে নিজেই টানবি।

বলে হেসে উঠলো টিকলু, কিন্তু রুণুর কথা বলতে গিয়ে সুধার কথা মনে পড়ে গেল।

টিকলু ভেবেছিল, সুধাদের বাড়ি যাবে একবার, দুপুরের দিকে। রেজাল্ট দেখে এসে ফেল করেছে জানলে আর যেতে ইচ্ছেই হবে না।

ভেবেছিল, কিন্তু একদম উল্টো। ওরা সব ক'টা পাশ করেছে। উর্মি ওপরের দিকে।

টিকলু বললে, যাক্ বাবা, ট্যাক্সির অঙ্কটা মিলে গেল।

অরুণ রেগে গেল। বললে, উর্মি আগেও ভাল রেজাল্ট করেছে, ও খুব শার্প।

—শার্প তো নিশ্চয়, জিলেটের ব্লেড, দুধারে কাটে।

সুজিত বললে, একজামিনাররা খাতা দেখে ভাবিস ?

উর্মির জন্যে ওদের কোন ক্ষোভ নয়! রাগ আসলে টিকলুর ওপর। কারণ সুজিত আর টিকলু এক হয়ে গেছে। কে জানে, টিকলু হয়তো ওদের চেয়ে নম্বর বেশী পেয়েছে। পড়েই পাশ করো

আর টুকেই পাশ করো—এক। টিকলু ফেল করলে ওদের খারাপ লাগতো। টিকলু পাশ করেছে, তাও খারাপ লাগছে।

অরুণ আর সুজিত উর্মিকে ফোন করতে গেল। টিকলু বললে, আমি চলি, কাজ আছে। কাজ আর কি, সুধা।

সুধার ব্যবহার ইদানীং ও বুঝতে পারছে না।

—তোমার কি একবারও একটু গল্প করতে ইচ্ছে হয় না! সুধা সেদিন বলেছিল।

যেন সেই অফুরন্ত সময়, সেই অফুরন্ত সুযোগ আছে। ওদের ভালবাসা, সে তো একটা অন্ধকার গোলকধাঁধার ঘর। এক ফালি আলো বিদ্যুৎ হয়ে চমকায় চার দেওয়ালের ঘরে, অন্ধকার বারান্দায়, অন্ধকার ছাদে। অন্ধকার ওদের প্রেম, টিকলুর রক্তই তো ভাষা। ওর রক্ত কথা বলে, অরুণ যত কথা জানে, যত কথা বলে রুণুকে।

কাজ থাক্ না থাক্ ঝি রতনমণি ফুকফুক করে এসে এটা ওটা বলে। ইলেকট্রিকের মীটার দেখতে এলো লোকটা, যেন আর সময় নেই আসার। সুধার মা, ইয়া সাদা হাতির মত চেহারা, খাটে বসে গল্প শুরু করলে আর উঠতে চায় না। সুধার ছোট ভাইটাকে একটু আদর করতে গিয়ে এখন 'টিকলুদা টিকলুদা', সরতে চায় না। টিকলুর মন একজনের কাছে সারাক্ষণ বাঁধা পড়ে আছে, সুধার কাছে। শিরার মধ্যে রক্ত—টগবগানো ঘোড়া। কিন্তু ছুটে গিয়েও লাভ কি! ধৈর্য থাকে না, সারা শরীর রাগের কাঁটায় বাবলা গাছ হয়ে যায়।

—তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না। সুধা একদিন বলেছিল।

—ভালবাসা নয়? অবাক হয়ে গিয়েছিল টিকলু।

ওর সারা শরীর ঝনঝন করে, বাচ্চা হোক্ বুড়ো হোক্, সামনে বসে ট্যাঁক ট্যাঁক করলে টিকলুর গা ফুঁড়ে বেরোনো বিরক্তির বাবলাকাঁটাগুলো ধারালো কুকরি হয়ে যায়। সে বুঝি এমনি? ভালবাসা নয়?

ইদানীং সুধা যেন কেমন বদলে যাচ্ছে। কেমন এড়িয়ে চলতে চায়। সেদিন ওর নন্দাই ছোকরা উঠতে চাইলো, সুধা খপ্ করে হাতটা ধরে বললে, ব'সো ব'সো। টিকলু তখন ভাবছে, ওঠে না কেন। মাঝে মাঝেই আসে কিনা কে জানে।

সুধার ওপর যত রাগ হয়, ততই নন্দিনীর কাছে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় বুকের মধ্যের এই ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা নন্দিনী যদি ভরিয়ে দিতো।

—বিরাম নাকতলায় বাসা নিয়েছে, যাবি? অরুণকে বলেছিল টিকলু।

অরুণ যাবে না ও জানতো।

সুধার সেদিনের ব্যবহারের কথা মনে পড়তেই মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভাবলে, না, যাবো না সুধাদের বাড়ি। রাগ, অভিমান, লজ্জা, হ্যাঁ লজ্জাও। আমি যেন শালা ভিখিরি। সুধার ভাল না লাগে, যাবো না। অন্য কাউকে ভালবাসতে পেলে টিকলু আর কোনদিন যাবে না। সুধা আজকাল টিকলুকে বড় তাচ্ছিল্য করে। করুক।

বরং নন্দিনী ওকে—না, ওসব ভালবাসাটাসা নয়—কিন্তু বেশ পছন্দ করে। করবে না কেন, যখন রাগ করে বাড়ি থেকে চলে এসেছিল, টিকলু না থাকলে যেতো কোথায়। নাকতলার ঘরখানা টিকলুই খুঁজে দিয়েছে। টুকটাক সাহায্য করেছে। ধার চেয়েছিল কিছু টাকা, প্রেসের বিল আদায়ের প্রায় সবটাই দিয়ে দিয়েছে।

পাশ করেছে সে খবর বাবা-মাকে জানাবে রাত্রে ফিরে। 'ফেল করবি, ফেল করবি।' ভাবুক সারাদিন বসে বসে। হোটেলফোটেলে খেয়ে নেবো বরং। তার আগে প্রেস থেকে সরানো শর্ট টাইপের দামটা আদায় করতে হবে।

গ্যারেজের ওপরে একখানা ঘর, নীচে কলঘর আর একটুখানি রান্নার বারান্দা। একটা এলেবেলে চাকরিতে এর চেয়ে বেশী আর কি হবে বিরামের।

কড়া নাড়তেই গ্যারেজের ওপরের জানলার পর্দা সরে গেল।

এসে দরজা খুলে দিলো নন্দিনী, কিন্তু হাসলো না।

—বিরাম পাশ করেছে? টিকলু জিজ্ঞেস করলো।

নন্দিনী মাথা নেড়ে জানালো, না।

টিকলু পাশ করেছে কিনা নন্দিনী জিজ্ঞেস করলো না। টিকলু নিজের থেকেই বললে, আমরা সবাই পাশ করলাম, ও বেচারা···

নন্দিনী টিকলুর মুখের দিকে তাকালো, হাসবার চেষ্টা করলো।—আমার কপালই খারাপ।

—বিরাম কোথায়?

নন্দিনী বললে, কাজে বেরিয়ে গেল।···একটু থেমে বললে, আপনি তো খেয়ে আসেন নি। আজ কিন্তু এখানে খেয়ে যাবেন।

টিকলু বললে, আরে না না, স্নানই করি নি। আসলে নন্দিনীর তো কষ্টের সংসার, তার ওপর আর একজনের খাওয়া!

নন্দিনী হাসলো।—জলের অভাব নেই। নাকি স্নান করিয়ে দেয় কেউ? নন্দিনী ঠাট্টা করলো, তারপর বললে, আমিও পারবো।

টিকলু কিছু বললে না, কিন্তু কথাটা খুব ভাল লাগলো। সত্যি যদি তাই হতো, সত্যি যদি নন্দিনী ওর বুকে পিঠে সাবান মাখিয়ে দিতো, মগে করে জল ঢেলে দিতো, তা হলে ইয়ার্কি করে এক মগ জল ও নন্দিনীর গায়ে ছুঁড়ে দিতো। সেবার দিঘায় গিয়েছিল, সবুজ শাড়ির মেয়েটা ভিজে কাপড়ে উঠে আসছিল, ও তাকাতেই, ওর তাকানো তো, ফিক করে হেসে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

টিকলু বললে, আপনার হাতের রান্না, লোভ হচ্ছে সত্যি।

নন্দিনী ট্রাঙ্ক থেকে একটা তোয়ালে বের করে কলঘরে রেখে দিলো। সাবান ছিলই। ছোট্ট কলঘর, তোয়ালেটা রেখে আসার সময় টিকলুর গা ঘেঁষে বেরিয়ে আসতে হলো। ছোঁয়াটা টিকলুর কাছে ফুলের গন্ধের মত মিষ্টি লাগলো। একবার ভাবতে চেষ্টা করলো, ইচ্ছাকৃত কিনা। আরে দূর, মেয়েদের বোঝা দায়।

টিকলুর মনে পড়লো, দক্ষিণেশ্বরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়েছিল নন্দিনী। তখন টিকলু ভয় পেয়েছিল। কিন্তু বিরামকে তো বলে নি। বলে নি, ব্যাপারটাকে তুচ্ছ ভেবেছে বলে, রসিকতা ভেবেছে বলে। আবার কি।

খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় এসে বসলো। উঠে গিয়ে জানলার পর্দাটা টেনে দিলো ভাল করে, নন্দিনী 'আসছি' বলে কাচের প্লেট গ্লাস নিয়ে চলে যেতেই।

বিরাম হঠাৎ এ-সময় ফিরে এলে কিছু ভাববে না তো। কি জানি বাবা।

চটপট নিজের খাওয়া সেরে নন্দিনী চলে এলো। খাটের পায়ে বসে বললে, নিন। বালিশটা এগিয়ে দিলো ও।

এতক্ষণে নন্দিনীর দিকে ভাল করে তাকালো টিকলু। বিরামের হাতে পড়ে নন্দিনীর অবস্থা কাহিল, টিকলু এর আগেও ভেবেছে। চেহারায় সেই চেকনাই নেই, চোখ বসে গেছে, হাসিটা গেছে হারিয়ে। সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিন নন্দিনীকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল, হাসিটা আরো সুন্দর। অমন প্রাণখোলা হাসি টিকলু দেখেই নি। আর এখন নন্দিনীর হাসিকে ঠিক হাসি বলে চেনা যায় না। বরবাদ করা টিউবওয়েল, তিনবার হটর হটর করলে চুরচুর করে জল বেরোনোর মত।

টিকলু ভাবলে, প্রেমফ্রেম সব বাজে, টাকাই সব। নাকি বাড়ি থেকে চলে এসে যখন দেখলে পায়ের তলায় মাটি নেই, বিরাম বিরক্ত, ওর ভয় দাদা না থানা-পুলিস করে, তখনই ওর প্রেম মরে গেছে। রূপসী মেয়ে রোগে ভুগে ভুগে যেমন হয় তেমনি ম্লান বিষণ্ণ।

নন্দিনী বললে, বরুণদা সকালে আসবে বলেছিল।

ধুত্তোর বরুণদা। পাড়ার দু'-তিনটি ছেলে আসে, চা খায়। কেন আসে তা বোঝে না বোকা মেয়েটা। মেয়েরা এত বোকা! তাদের সঙ্গে এত মেশামিশির কি দরকার।

প্রেমে পড়লে ছেলেরাও অন্ধ হয়ে যায়। অরুণের কাণ্ড ছ্যাখো না। চব্বিশ ঘণ্টা রুণুর নাম জপ করছে। ওর ধারণা রুণু ওকে দারুণ ভালবাসে। অথচ টিকলু এক নজরেই বুঝে নিয়েছে, রুণু দিব্যি ডুবসাঁতার জানে। উর্মিও যা, রুণুও তাই।

—আরে ওরাও বুঝে গেছে এখনই এখনই চাই। মার্বেলের অহল্যা হয়ে থাকবে, কবে কে পায়ের ছোঁয়া দিয়ে জাগাবে, ওসব কেউ বিশ্বাসই করে না। টিকলু একদিন বলেছিল।

সুজিত বলেছিল, দোষ কি ওদের, বাপ বিয়ে দিতে পারবে কিনা তাই জানে না। নন্দিনীর কথাই ভাবো না। দাদার সংসার চলে না, বিয়ে দেবে! ও তাই বিরামকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

টিকলু হেসে বলেছিল, সে-সব বাদ দে, আসল কথা 'বয়স কেটে যায় সখি'। ওদের যা আমাদেরও তা। এ বয়সে একটু ফুর্তি-ফার্তা না করলে কখন করবে।

ও ছাড়া আর কিই বা আছে, আর কিছু করবার আছে নাকি? …সব শুধু জোড়াতালি, জোড়াতালি…যা বলেছিস, শালার সোস্যাল সিসটেমের ঘাড় মটকে দিয়ে…কিস্যু হবে না, এ দেশের কিস্যু হবে না…উচ্ছন্নে গেল সব…আরে দূর, চাকরি, চাকরি পেলেই দেখবি সব …প্রেমটেম হলেও…গোলি মারো প্রেমকে, প্রেম তো শালা রুপুলি তবকে মোড়া সেক্স…মালা সিন্‌হাকে দেখেছিস…রাখ তোর মালা সিন্‌হা, এলিটে একটা অ্যাডাল্টস্ ওনলি এসেছে…আমার মাইরি এক এক সময় ইচ্ছে হয় দেশটাকে বদলে দিই…আমেরিকার তাঁবেদারদের দিয়ে…সব ক্যাপিটেলিস্টের দালাল…যা যা, ওসব অনেক শুনেছি, যত রাগ দালালের ওপর, কেন বাওয়া খোদ ক্যাপিটেলিস্টকে ধরলেই তো পারো, দালালকে কেন…ন্যাশনালাইজ না করলে…লে লে, সে তো ইনএফিসিয়েন্সি…প্রাইভেট সেক্টরের এফিসিয়েন্সি তো ঘুষে…কমিউনিজম ছাড়া সলিউশন নেই গুরু, আর সব রাবার সলিউশন, শুধু পাংচার সারানো যায়…তাই বলুক না

কমিউনিস্টরা দেড়শো টাকা মান্থলি ইনকাম না হওয়া অবধি কারো মাইনে বাড়বে না···দেড়শো কেন বস্, ষাট বলো না, মিড্ল্ ক্লাশ একেই বলে, নিজের কথাই ভাবছো···বাঃ, মিনিমাম লেভেল একটা··· মিনিমাম লেভেল কে ঠিক করবে, কোটি কোটি লোক ষাট পেলেই খুশি···তা হলেই হয়েছে, ভোট পাবে না কেরানীদের মাইনে না বাড়ালে···আমি যদি পাওয়ার পেতাম সব ব্যাটাকে বছরে তিন মাস লাঙল ঠেলতে দিতাম···সে যাই বলিস চাষীরা সুখে আছে···যা না গ্রামে, লেকচার দিচ্ছিস কেন···কি যে বলিস, খেলা দেখবো না?··· ফুটবলের স্ট্যাণ্ডার্ড কিন্তু···চুনীকে ইলেকশনে দাঁড় করিয়ে দিলে···ও সব বাদ দে তো, ভাল লাগে না···স্রেফ ফুর্তি কর বাবা, ফুর্তি কর।

—অরুণ তো দিব্যি ফুর্তি করে নিচ্ছে। টিকলু হেসে উঠে বলেছিল।

অরুণ রেগে গিয়ে বলেছিল, প্রেম কি তোরা বুঝিস না, বুঝিস না।

ওই এক কথা ওর মুখে। প্রেম যেন চাঁদ ফুল বন্লতা স্তেন্।

প্রেম এখন স্যুটকেসে ভরা থাক, দু' পয়সা রোজগারের ফিকিরে বেরোতে হবে। মা বাবা তো ভেবে রেখেছে পাস করলে দুটো ডানা গজাবে। টিকলু ভাবলে, বেশ ছিলাম, এখন আবার বেকার বলে খোঁটা খেতে হবে। পাড়ার জয়ন্তদা সেদিন জিজ্ঞেস করলো, কি টিকলু, কি করছোটরছো! এখন কলার উল্টে বলবে, বীজনেস। সব্বাই তো তাই বলে, যদ্দিন না চাকরি জুটছে। চাকরি করতে একটু ইচ্ছেও হয় না। ঝট করে বড় হতে চায় টিকলু। এন্তার টাকা, নয়তো নাম। পলিটিক্স করতে গিয়েছিল সেজন্যেই, এখন বুঝেছে বড় নোংরা ব্যাপার। সব দাদারাই চায় ও শুধু রোদে বসে হাততালি দেবে, নয়তো ফাইফরমাশ খাটবে।

আসলে টিকলু কি হতে চায় ও নিজেও জানে না। ও শুধু অবাক করে দিতে চায়। লোকে ঘেন্না করে এসেছে ওকে, ও চায়

তারা যেন ঘাড় উঁচিয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

রাত্রে খুব খুশী খুশী মুখে সুধাদের বাড়ি থেকে ফিরলো। শেষ অবধি সুধাদের বাড়িতে না গিয়ে পারে নি। পাস করেছে, এত বড় সুখবরটা না দিলে চলে ?

সুধাদের বাড়ির সব্বাই খুব অবাক হয়ে গেছে।

টিকলুর রীতিমত গর্ব হচ্ছিল। বুক ফুলিয়ে বাড়ি ঢুকলো। ধরে নিয়েছিল মা বাবা সমস্ত দিন অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করেছে। মনে মনে সে-কথা ভেবে হেসেছে। ভাবুক না, মা ভাববে হয়তো, ফেল করে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না দেখে নিজেই বললে, পাস করেছি।

মা গম্ভীর ছিল, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, পাস করলেই মানুষ হয় না।

বাবা ভাঙা চেয়ারটায় বসেছিল, উঠে দাঁড়ালো।—শুয়োর, বিল-এর টাকা আদায় হয় নি বললি, গত হপ্তাতেই তো নিয়ে এসেছিস। কি করেছিস টাকা ?

কয়েক দিন থেকেই বিকেলের দিকে মেঘ জমছিল, মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। আগুনের হল্কার মত রোদ্দুর, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পীচ গলে যায়, পীচের রাস্তায় পায়ের স্লীপার আটকে যায়। বাসে ট্রামে ওঠা যায় না, বসা যায় না, বাসের রডে হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগে হাতে, ঘরে থেকেও স্বস্তি নেই, পাখার হাওয়া তো নয়, যেন কামারের হাপর। কোন কোন দিন বিকেলের দিকে মেঘ জমে, শাড়ির আঁচলের মত মৃদু আমেজটুকু দিয়েই মেঘ উড়ে যায়। বৃষ্টি নামে না, বৃষ্টি নামে না।

—তুই রিয়েল প্রেমিক রে অরুণ, একেবারে বাইশ ক্যারেট। টিকলু ঠাট্টা করে বলেছিল।

সুজিত হেসেছিল।—আমরা মাইরি মোরারজীর চোদ্দ হবারও চান্স পেলাম না।

টিকলু প্রতিবাদের ঢঙে বললে, চান্স পেলেও পারতিস তুই অরুণের মত এই টেরিফিক গরমে টঙাস টঙাস করে ঘুরতে?

যেন অরুণ একাই এই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর সহ্য করছে। যেন অরুণ একাই পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। ওরা যা খুশী ভাবুক। রুণু সেই কত দূর থেকে আসছে, কলেজ ফেরার ক্লান্তি স্পষ্ট দেখা যায় তার মুখেচোখে; কেন আসছে? সুজিত বা টিকলু যখনই ওর মনের মধ্যে রুণুর সম্পর্কে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, কিংবা রুণুর কোন ব্যবহার যখনই ওকে অপমান করে, তখনই অরুণ ভাবতে চেষ্টা করে ওর ভয়টয় সব মিথ্যে। রুণু ওকে ভালবাসে না? শুধুই এটা তার একটা খেয়ালের খেলা? বাঃ, তা হলে বাসের ভিড় ঠেলে এই প্রচণ্ড গরমে রুণু আসবে কেন! রুণু অন্য কাউকে ভালবাসে? বাঃ, দেখা

করতে আসার জন্যে তা হলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সে নিজেকে বাঁধবে কেন? অগুরু মেশানো সেই আবীরের মধ্যে অরুণ প্রথম, হ্যাঁ, সেই প্রথম ভালবাসার ঘ্রাণ নিয়েছিল। তবু একটু একটু ভয় ভয় করতো ওর। রুণু এত সরল, এত খোলা মন নিয়ে কথা বলে, ওর ভয় হতো কখন হয়তো রুণু বলে বসবে, দোলের দিনে তো কারো সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই, তাই চেনাজানা সকলকে আমি আবীর পাঠিয়ে দিই এমনি খামে ভরে। ব্যস, তা হলেই ওর সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সুজিত তো বলেওছিল। 'তুই কি রে, কিচ্ছু না, স্রেফ আবীর মেখেই তোর চোখে রঙ লেগে গেল!' টিকলু বলেছিল, 'ক' ডজন খাম কিনেছিল কে জানে।'

কিন্তু রুণুর মুখ তো মিথ্যে বলতে পারে না। দুপুর দুটো, প্রচণ্ড রোদ্দুর, একদিন নির্দিষ্ট জায়গায় রুণু এলো। আর রুণুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণের ভীষণ মায়া হলো। রোদে ঝলসে রুণুর মুখ লাল, রুমাল দিয়ে পরিপাটি করে ও মুখ মুছলো, তবু কপালের ঘাম মুছে গেল না। তার জন্যে মায়া হলো অরুণের, আহা বেচারীকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছি আমি, আবার সঙ্গে সঙ্গে অরুণের নিজের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। মেয়েটা নিশ্চয় আমাকে দারুণ ভালবাসে। আমার মতই।

—তুমি কেন বিশ্বাস করো না বলো তো? তা হলে আমি আসবো কেন, দেখা করবো কেন। রুণু বিষণ্ণ মুখে বলেছে, যেদিন তুচ্ছ কারণে অরুণ আহত হয়েছে, অনুযোগ করেছে রুণুর কাছে।

—তুমি কেন এত ভাল বলো তো, তুমি ভীষণ ভাল, রুণু একদিন বলেছিল। আর সে-কথা শুনে অরুণের আরো ভয় হয়েছিল, রুণুকে হারানোর ভয়। আসলে অরুণ তো একটুও ভাল নয়, ও শুধু রুণুর কাছে এলেই ভাল হয়ে যায়। টিকলু ঠিকই বলে, ও নাকি পালিশ দিয়ে দিয়ে কথা বলে। বলেই তো। আসলে প্রত্যেকটা মানুষই তো

তাই, দোষ কি শুধু অরুণের! টিকলুর বাবা একদিন ওদের প্রেসে বসে তুটো বুড়োর সঙ্গে কি বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলছিল, অরুণকে দেখতে পায় নি। রিটায়ার করা চারটে লাঠি হাতে বুড়ো একদিন লেকে বসে নোংরা সব আলোচনা করছিল। কলেজে তু'জন প্রফেসর একদিন চেঁচামেচি করে উঠেছিল, মুখে কারো লাগাম ছিল না।

আমরা কেউই বোধ হয় 'একজন' মানুষ নই। অনেক ছোট ছোট পৃথক মানুষ মিলে 'একজন'। অরুণ, সুজিত, টিকলুর মধ্যে 'একজন' অরুণ, অরুণ আর ঊর্মির মধ্যে 'আরেকজন'। আর অরুণ আর রুণু—সেখানে অন্য অরুণ। বাবা-মা'র কাছে এক অরুণ, ছোটমেসোর বাড়িতে অন্য অরুণ।

দিদির বিয়ের দিনটা মনে পড়লো। আদ্দির পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরে সকলকে নমস্কার করে অভ্যর্থনা করছিল ও, বরযাত্রীদের সিগারেট বিলি করেছিল।

পরের দিন মা হাসি হাসি মুখে বলেছিল, তোর যে সবাই খুব গুণ গাইছে রে, বলে হীরের টুকরো ছেলে।

ছেলের প্রশংসায় মা খুব খুশী হয়েছিল। হবারই কথা। কিন্তু অরুণ মনে মনে হেসেছিল। ন্যাকামি করে একটা নমস্কার করো, একটু বিনয় দেখাও, ব্যস, হীরের টুকরো হয়ে যাবে। অথচ, ওরা তিনজন একবার কি মজাটাই না করেছিল। বিয়ের দিন ছিল, একটা পেল্লায় বাড়িতে প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙিয়েছে, রোশনচৌকি, সানাই, ...চোঙা প্যাণ্ট পরেই তিনজনে গটগট করে ঢুকে গেল একজন চেনা বন্ধুকে ঢুকতে দেখে। তারপর দিব্যি গলদা চিংড়ির মালাইকারি সাঁটিয়ে চলে এলো।

অথচ রুণু ভাবছে, অরুণ খুব ভাল! এদিকে রুণু নিজে কত ভাল, কত সরল, এত মন খুলে কথা বলে, অন্য মেয়েদের মত কায়দা করে কথা বলে না, উৎকট সাজসজ্জা নেই, এত সিম্পল, রুণু নিজেই তা জানে না। এমন কি রুণুর মধ্যে এমন একটা সহজ সৌন্দর্য

আছে, যে-কেউ দেখবে সেই ভালবেসে ফেলবে, রুণু তাও জানে না। বিশ্বাসই করে না। 'তুমি তো আমার সবই ভাল ছাখো', রুণু হেসে উঠে বলেছিল। যেন কথাটা হাসির।

কিন্তু রুণুর মধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা আছে, তা না হলে অরুণের নিজেকে আজকাল আর তেতো লাগে না কেন। নিজেকে আর বিরক্তিতে তিক্ততায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে হয় না। বাঁচতে ইচ্ছে হয়।

—তুই না তেতো নিমগাছ হয়ে গিয়েছিলি? সুজিত বলেছিল। —এখন তুই কদম।

অরুণ হেসেছিল।—নিমগাছেও ফুল হয় রে সুজিত, নিমফুলেও মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আছে।

টিকলু তালুতে জিভ ঠেকিয়ে একটা টক্ করে আওয়াজ করেছিল। —প্রেম এমনি জিনিস, কপালে তিল দেখলে তিলক মনে হয়। এখন নিমগাছও তোকে সেণ্ট মাখাচ্ছে।

চোখাচোখি হতেই একমুখ হাসি হয়ে গেল রুণু।

তখন বিকেল। রোদ্দুর পড়ে আসছে, কিন্তু ঝকঝকে রূপোর মত আলো।

—এই, চা খাওয়াবে কিন্তু। সারা দিন ক্লাস করেছি, একটাও অফ ছিল না। একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো, মা কেমন আছেন?

টিকলু সুজিত কি বুঝবে! ওরা তো শুধু জানতে চায় চুমু খেয়েছি কিনা, কদ্দুর এগোলো। এত নোংরা লাগে ওদের। মন বলে ওদের কিছু নেই বোধ হয়। এই যে এখন ও নিজেই বললে চা খাওয়ার কথা, এ যে কি আনন্দ। অরুণের হঠাৎ মনে হলো রুণু অনেক অনেক কাছে এসে গেছে। তা না হলে এমন ভাবে বলতে পারে! আঃ, রুণু যদি সবসময় এমনি অধিকার দেখায়, ভাব দেখায় ওর ওপর জোর আছে···'মা কেমন আছেন' একটা ছোট্ট প্রশ্ন, অথচ কত আপন।

রুণু হঠাৎ হাসলো।—এই দাঁড়াও। বলেই ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করলো, সেন্টের শিশি, আজই কিনেছে। সেটা খুলে ওর শার্টের কলারে, ভাঁজ করা রুমালে, বুকে লাগিয়ে দিল। আনন্দে মন ভরে গেল অরুণের।

রোদ পড়ে গিয়েছিল, অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছিল।

ওরা চা খেয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। কি করবে, এ-সময় না পাবে ট্যাক্সি, না বাসে ট্রামে উঠতে পারবে।

—সেদিন তুমি এই নীল শাড়িটা পরে এসেছিলে, এত অদ্ভুত সুন্দর মানায় তোমাকে···

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঘূর্ণি গেট ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে অরুণ বললে।

—নীল রঙ তোমার খুব পছন্দ, তাই না?

অরুণ মুগ্ধভাবে তাকালো রুণুর দিকে। বললে, নীল আর কমলা রঙ। তুমি একদিন কমলা রঙের শাড়ি পরেছিলে।

—সেদিন নন্দিনীকে কমলারঙেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

—আজ তোমাকে। অরুণ বললে, সেদিনও তোমাকে এত অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল, আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পারি নি।

অরুণ ফিরে তাকালো রুণুর দিকে। দেখলে, তার ঠোঁটে চাপা হাসিটা দুলছে।

ওরা তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে এসে একটা গাছের গুঁড়ির কাছে ঘাসের ওপর বসলো। একটা কাঠ-বিড়ালী তরতর করে নেমে আসছিল, ওদের দেখে গাছে উঠে গেল তরতরিয়ে। সেন্টের আমেজ নাকে এসে লাগলো। মিলুটা যা ফাজিল, বলবে, সে কি রে দাদা! সেন্ট মাখছিস?

গাছটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রুণু বসলো, মুখোমুখি অরুণ।

সত্যি রুণুকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল নীল শাড়িতে। নীলের ওপর ছোট ছোট সাদা জুঁইফুল, তারার মত ফুটে আছে। মনে হলো রুণুর মুখে দিঘির জল, সবুজ পাতা, কাশফুল, পায়রার পালক, ঘুঘুর ডাক, ঝর্ণা, ঘাস, পদ্মের পাপড়ি মিশে গেছে। রূপোলী রোদ মেখে কাছে কাছে একটা ফড়িং উড়ছিল। রুণুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণের মন তখন হরিণ-হরিণ।

রুণু হাঁটু মুড়ে বসেছিল, হাঁটুর ওপর ওর দু' হাত আঙুলে আঙুলে জড়ানো।

রুণু এত কাছে, এত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে, অথচ এখনো যেন অনেক দূরের মানুষ। অরুণের বুকের ভিতর একটা শূন্যতার যন্ত্রণা করুণ হয়ে কাঁদছিল।

রুণুর আঙুলে একটা আংটি দেখতে পেল অরুণ। ও হাত বাড়িয়ে আংটিটা দেখার ছল করে রুণুর হাত স্পর্শ করলো। আংটিটা দেখা যেন শেষ হয় নি এমন ভাব করে ও রুণুর আঙুল ছুঁয়ে রইলো।

আর, অরুণ ভাবছিল এবার হয়তো রুণু হাতটা সরিয়ে দেবে, কি ভাগ্য, রুণুর চোখে মুগ্ধ হাসি ; অরুণ বললে. আংটিটা খুব সুন্দর, রুণু কোন কথা বললো না, ধীরে ধীরে ওর মুখ নামিয়ে এনে তার হাতের ওপর যেখানে অরুণ আংটিটা ছুয়ে হাত রেখেছিল, সেখানে অরুণের হাতের ওপর চিবুক রাখলো। চিবুক, তারপর গাল ছোঁয়ালো।

অরুণ, তোর চেয়ে সুখী আজ আর কেউ নেই। অরুণ নিজেকে বললে। অরুণের সমস্ত শরীর আনন্দে থরথর করে কেঁপে উঠলো। ওর হাত কাঁপছিল, ওর বুকের মধ্যে সব সংশয় অবিশ্বাস সরে গেল, ও স্বপ্ন দেখলো।

আর কিছু চায় না অরুণ, আর কিছু চায় না।

অরুণ আবেশে শিথিল তার শরীরটাকে ঘাসের ওপর এলিয়ে দিলো, কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে।

রুণুর পিছনে একটা মরা গাছ, অসংখ্য ডালপালা, একটাও পাতা নেই সে-গাছে। একটু আগে সেদিকে তাকিয়ে, গাছটার পিছনে পরিচ্ছন্ন আকাশ, অরুণের মনে হয়েছিল—আমি ঐ গাছটার মতই। রুণু আমার কাছে শুধু একটা স্তোকের মত, এক টুকরো সান্ত্বনা—দূরের পরিচ্ছন্ন আকাশটার মত। আর আমি, অরুণ, ঐ গাছটার মত মৃত, হাহাকারে ভরা, নিষ্পত্র, পাতা ঝরা অজস্র শাখা অসংখ্য প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে আছে, আছি, আমিও, আকাশটার দিকে।

অরুণ খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল, রুণু খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল।

হঠাৎ পশ্চিমের আকাশে ধোঁয়াটে কালো কালো বৃষ্টির মেঘ এসে জমতে শুরু করলো। প্রতিদিন বিকেলেই মেঘ জমছে, মেঘ উড়ে যাচ্ছে। এক ঝাঁক পায়রা অনেক উঁচু দিয়ে ডানায় রূপো ঝরিয়ে উড়ে গেল। রুণুকে খুব সুন্দর দেখালো। নীল শাড়িতে সাদা সাদা জুঁই। রুণু জুঁই ফুলের মত ফুটফুট করছে। ওর চোখে, হাসিতে, কথায় জুঁই ফুলের স্নিগ্ধ সুগন্ধ।

'মালা নেবেন বাবু, মালা', লোকটা হাতে একরাশ বেল আর জুঁই, জুঁই ফুলের মালা নিয়ে একদিন ওকে বলেছিল। রুণু আড়চোখে অরুণের দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। ফুল-বেচা লোকটা বলেছিল, 'মালা নেবেন দিদি, মালা'। অরুণ সাহস পায় নি। ভেবেছিল, দিলেও ওর চোখের আড়ালে গিয়েই হয়তো মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বাঃ রে, ফেলে তো দেবেই, তা না হলে মামীমার কাছে জবাব দেবে কি। লোকটা চলে যাওয়ার পরও জুঁইফুলের গন্ধ ছিল।

—তুমি আমাকে একটা নতুন নাম দাও। রুণু বললে।—শুধু তোমার দেওয়া নাম, যা আর কেউ জানবে না। তুমি আর আমি।

অরুণ ভাবলো। কি নাম দেবে ও, যা মন্ত্রের মত অরুণের মনেও রোমাঞ্চ জাগাবে। পাখি, নদী, ঝর্ণা, ফুল, ময়ূরের রঙ, দোয়েলের ডাক, সোনামোড়া ধানের শিষ, সমুদ্র, পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় বরফের চাদরে সূর্যোদয়।

অরুণ নিজের মনেই বললে, বৃষ্টি আসছে।

রুণু বললে, কোথাও এসেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া।

ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে হাওয়া। সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। মেঘ জমেছে, কালো কালো, জলের ভারে টইটুম্বুর।

আর পরক্ষণেই ঝড় উঠলো। কালবৈশাখীর ঝড়। অরুণের মনে, রুণুর মনে।

টিপ টিপ দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। পড়ুক।

বৃষ্টি, বৃষ্টি। নিষ্পত্র গাছটা অজস্র বাহু বাড়িয়ে মৃতের মত দাঁড়িয়ে আছে। অরুণের হৃদয়।

আরো একটু ঘন হয়ে বৃষ্টি ফোঁটা পড়ছে!

অরুণ আর রুণু উঠে দাঁড়ালো।

অরুণ বললে, যাবো না, যাবো না।

রুণু বিদ্যুতের মত হাসলো।—আঃ, কতদিন বৃষ্টিতে ভিজি নি।

ওরা হঠাৎ দেখলে চারপাশে যারা বসেছিল, যাদের কথা ওরা ভুলে গিয়েছিল, তারা সব ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে পালাচ্ছে।

ওরা খুব আস্তে আস্তে হেঁটে চললো, ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে, পড়ুক, স্বচ্ছজল পুকুরটার পাড়ে সব বেঞ্চগুলো খালি হয়ে গেছে, ঝুপুর ঝুপ বৃষ্টি।

অরুণ আর রুণু এক মন হয়ে গেছে, রোমাঞ্চে, একটা অন্যরকম বিশুদ্ধভাব, আনন্দ ওদের চোখেমুখে।

বেঞ্চে এসে ওরা বসলো। লোকগুলো সব জোড়ায় জোড়ায় এতক্ষণ বসেছিল, কেউ উদাস নিঃসঙ্গ, সবাই ছুটে পালিয়েছে, গাছের নীচে নীচে ভিড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—আমাদের নিশ্চয় পাগল ভাবছে ওরা। রুণু বললে।

অরুণ বললে, এই আনন্দ ওরা জানলো না!

দু'জনেরই সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, চুল, পোশাক, মন থেকে জল ঝরে পড়ছে, ঝরে পড়ছে। দুটি স্রোত যেন এক হয়ে যেতে চাইছে।

তুমুল বেগে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি নয়, মেঘ-ভাঙা জলপ্রপাত যেন। চার পাশে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওরা দু'জনকে দু'জনে দেখতে পাচ্ছে।

সেই অঝোর বৃষ্টির আড়াল দেওয়া ঘরে পাগলের মত অরুণ রুণুর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে গেল। রুণুর মুখের ওপর বৃষ্টির ঝড়।

—আরে পাগল, ওরা দেখছে, দেখছে। রুণু বাধা দিলো না, শুধু হাসলো।

আর দু'জনেই কাছাকাছি গাছের নীচের ভিড়ের দিকে তাকালো। ভিড়ের লোক বৃষ্টির পর্দা ঢাকা পড়ে অস্পষ্ট।

অরুণের মনে হলো আকাশের দিকে তুলে ধরা অসংখ্য প্রার্থনার হাত কৃতজ্ঞতায় আনত। অরুণের সমস্ত শরীর আজ সবুজ পাতায় ভরে গেছে।

প্রচণ্ড ঝড়ের মত মেঘভাঙা বৃষ্টি ওদের চারপাশে যেন একটা ঘষা কাচের পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। কিচ্ছু দেখা যায় না, কিচ্ছু দেখা যায় না। ফ্রস্টেড বাল্‌বের আলোর মত, ঘষা কাচের জানলা দিয়ে আসা বিকেলের আলোর মত।

ওরা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না।

অরুণ দু'হাত বাড়িয়ে উত্তেজনায় রুণুকে জড়িয়ে ধরলো সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে, ভিজে পিঠে রুণুর দুটি হাতের স্পর্শ অনুভব করলো অরুণ।

মুখের ওপর মুখ নামিয়ে এনে সৃষ্টির প্রথম দিনের অজ্ঞাত

রোমাঞ্চের স্বাদ নেবার মত অস্থিরতায় অরুণের ঠোঁট রুণুর ঠোঁট স্পর্শ করলো। অরুণের বুক রুণুর বুকের শব্দ শুনলো, অরুণের হৃৎপিণ্ড রুণুর হৃৎপিণ্ডে কান পাতলো।

হঠাৎ বৃষ্টি একটু কমে এসেছিল, ঘষা কাচের জানলা সরে গিয়েছিল, আর কেউ একজন অট্টহাসে হেসে উঠতেই ওরা দু'জনেই সচকিত হয়ে উঠলো।

তারপর বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে পালালো, ঘূর্ণি গ্যেটের দিকে, ঘাস-জল-স্বপ্ন-আনন্দ পিছনে ফেলে ছুটে পালালো।

নির্জনতা নেই, কোথাও নির্জনতা নেই। প্রেমকে স্নেহ দেখানোর মত মানুষ নেই, মানুষের সুন্দর মন নেই।

বেমানান, বেমানান। ভিতরটা বাইরের সঙ্গে মিলছে না, বুকের ভাষা মুখের কথার সঙ্গে মিলছে না। অরুণ তখন রক্তরঙের ফুলে ফুলে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। অরুণের মন মিহি সুরের গান। ভিক্টোরিয়ার চত্বরে রুণুর পিছনে সেই যে মরা গাছটা ছিল, একটাও পাতা নেই, শুধু আকাশের দিকে অসংখ্য প্রার্থনার হাতের মত ডালপালা, সেই গাছটা এখন পাতায় পাতায় কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে। অরুণের সমস্ত শরীর এখন সবুজ সবুজ পাতায় ভরে গেছে।

ছবিটা বার বার ওর মনে সুন্দর কোন ল্যাণ্ডস্কেপের মত ভেসে উঠছিল। সবুজ ঘাস, সবুজ সবুজ গাছের পাতা, কেয়ারি করা ফুলের বেড, ফুলের রঙ, রুণু ছ'হাঁটু মুড়ে ছ'হাতের চালুতে মুখ রেখেছে। পিছনে একটা মরা গাছ, তারও পিছনে ফর্সা আকাশ, পশ্চিমের আকাশে মেঘ, জলে-ভরা কালো কালো মেঘ জমছে।

রুণুর সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। অথচ বৃষ্টি গেছে থেমে, আকাশ পরিষ্কার হয়-হয়। রাস্তায় ঘাটে বাসে শুকনো পোশাকের ভিড়।

রুণুর খুব অস্বস্তি লাগছিল। বললে, কি ভাববে বলো তো সকলে?

অরুণ হেসে বললে, হেমেন মজুমদারের ছবি। কোন একটা ম্যাগাজিনের পুরোনো সংখ্যায় দেখেছিল।

রুণু নামই শুনেছে, ছবি দেখেনি, তবু অর্থ বুঝলো। বললে, বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি।

অরুণের নিজেরও এখন বিচ্ছিরি লাগছে, বেমানান লাগছে। সবাই ফিটফাট, ওর মত কেউ ভেজে নি, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে

অনেকক্ষণ, অথচ ওর সর্বাঙ্গ জলে চোবানো কাঁথা। লোকগুলো অবাক হয়ে দেখবে, যেন ওরা দু'জন একেবারে পাগল। কারো জামা ভিজবে এই ভয়, কেউ ভাববে এমন করে ভিজলো কখন। বৃষ্টি তো নেই। একজনের বুকের মধ্যে যখন ভালবাসার বৃষ্টি নামে, আর সবাই তখন ঠিক এমনি অবাক হয়ে তাকায়। বলে, পাগল, পাগল।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় রুণুকে ও কত কি বলতে চেয়েছিল। বলতে চেয়েছিল, তোমার নতুন নাম বৃষ্টি। অথচ বলে বসলো, তুমি হেমেন মজুমদারের ছবি।

মুখের ভাষায় কি যায় আসে, কোলকাতা এখন কবিতা। ট্রামের ঘন্টিটাও এখন ভাল লাগছে, ট্রাফিক সিগন্যালের আলোয় এখন রঙ।

অরুণের সমস্ত মন এখন ভরে আছে। 'কিচ্ছু পাবি না, কিচ্ছু পাবি না, ও তোর বুকের ওপর পা রেখে ভারতনাট্যম্ নাচছে,' টিকলু বলেছিল। অরুণের ইচ্ছে হলো সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে বলে, টিকলুকে সুজিতকে, উর্মিকে—এই মাত্র আমরা শরীরের দলিলে সই দিয়ে এলাম। ঠোঁট ঠোঁট ছুঁয়েছে, বুক-বুক, এখন আর কোন অবিশ্বাস নেই, কোন ভয় নেই। এখন একটাই ভয়, হারিয়ে না যায়।

টিকলু কিচ্ছু বোঝে না, ও শরীরকেও সুন্দর করে দেখতে জানে না। কেউ জানে না। আরে শরীর মানে যে-কোন একটা শরীর নয়। যন্ত্রণার, স্বপ্নের, ইচ্ছার মোলায়েম ওড়নায় মোড়া একটা বিশেষ শরীর। রুণুর মত।

কিন্তু রুণু হঠাৎ 'বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি' বললো কেন। অরুণকে টিকলু ভাবলো না তো? ওর মন বদলে যাবে না তো! বাঃ রে, চুমুটুমু খাওয়ার পরেও কি বদলে যেতে পারে নাকি। যাবে না কেন, অয়ন কি আর ওকে···যাঃ, শরীর তো স্নান করলেই শুচি, রুণু আমাকে মন দিয়েছে। কেউ কিচ্ছু বোঝে না। গোঁফওলা ছেলেটার মত সবাই কেবল চেঁচায়—ভ্যালুজ বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। তাহলে পাঁচটা

ছেলের সঙ্গে প্রেম করলে সে মেয়েকে যাচ্ছেতাই বলিস কেন? তুই জেনেশুনে তেমন মেয়েকে বিয়ে করতে চাস না কেন?

আসলে ফিকির-ফন্দী সব। আসলে বোকা বুঝিয়ে মেয়েগুলোকে হাত করতে চায়। হাতের কাছে এলেই যেন বুক ভরবে। স্টুপিড, স্টুপিড সব। প্রেম কি জানেই না।

কোজি ঝুঁকে এসে বসলো। পাখার হাওয়ায় জামাকাপড় একটু শুকিয়ে নিতে হবে। মা তো ক'দিন একটু ভাল আছে, ভিজে কাপড় দেখলেই চেঁচাবে। অবশ্য চেঁচানোর শক্তি এখন আর নেই, শুয়ে শুয়েই বলবে। মা কিন্তু ভাল রান্না করতো। একটা রান্নার লোক রাখা হয়েছে। লোকটা রাঁধতেই জানে না।

প্রিন্সের কি খবর? টিকলু হেসে উঠলো।—চোখের জলে জামাকাপড় ভেজালি নাকি?

অরুণের মুখে হাসি রয়েই গেল।—বল্, তোরা যা-খুশী বলে যা। আমি এখন আকাশে হাউই হয়ে ফাটছি, লাল নীল রুপোলী তারা হয়ে ফুটছি।

গরম চায়ে শব্দ করে চুমুক দিলো অরুণ। আঃ।

সুজিত বললে, আর সাতাশ দিন পরেই বৃহস্পতি আমার একাদশে আসছে। তখন দেখাবো।

আসলে ও একটু আশা পেয়েছে। জব-ভাউচার একখানা পেয়ে যেতে পারে। তাহলেই 'ফরেন'। কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বললে, তখন কত রুণু জুটে যাবে, দেখাবো, দেখাবো।

অরুণ হাসলো, যেন প্রেম জিনিসটা 'পদ্মশ্রী' পাওয়া। আরে, প্ল্যান করে পবিত্র হওয়া যায় না, প্ল্যান করে ডাকাতি করা যায়।

—আমি দেখাতেও চাই না। টিকলু বললে, বিয়ামের হাল তো দেখছি।

—কেন? কেন? অরুণ জিজ্ঞেস করলো।

সব শুনে অরুণের খুব খারাপ লাগলো। আহা বেচারী।

তা হলে টাকাই সব নাকি ? নন্দিনী তো ভীষণ ভাল মেয়ে। কম মাইনেতেও ওর তো সংসার গুছিয়ে নেয়ার কথা। অভাব কি কখনো প্রেমকে গলা টিপে মারতে পারে!

—শালা পাড়ার ক'টা ছোকরা ওদের বাড়িতে দিনরাত আড্ডা দেয়। টিকলু ক্ষোভের সঙ্গে বললে।

সুজিত হাসলো।—তারাও তো ভাবে তুই কেন টহল মারছিস।

অরুণ নিজের মনেই হাসলো, মূল্যবোধ না কি যেন বলে ওরা, সব বদলেটদলে গেছে। বদলে যদি গেছে, তবে চাকরিটার জন্যে এত খুঁতখুঁতনি কেন অরুণের। ছোটমেসো তো বলেছে, এ মাসেই হয়ে যাবে। হয়ে তো যাবে, তারপর মিথ্যে সার্টিফিকেটটা ঘাড়ের ফিক ব্যথা হয়ে লেগে থাকবে। অথচ জানি সব ব্যাটারই কোথাও না কোথাও ফল্স্ কিছু আছে। তবু মন এমনি জিনিস, সব সময় খাঁটি থাকতে চায়। আরে দূর, পার্টটাইম ফিলজফার হয়ে লাভ নেই, কত লোক তো জাল ডিগ্রি দেখিয়ে চাকরি জুটিয়ে নিচ্ছে। আর আসল ডিগ্রিতেই বা কি কম ভেজাল। ওর এখন চাকরি নিয়ে কথা, যাক্, তবু তো চাকরি।

অরুণ উঠে পড়লো, ভিজে কাপড়ে বড় শীত শীত করছে।

বাড়ির সামনে এসেই—সর্বনাশ। সেই বড় গাড়িটা। ডাক্তার।

আচ্ছা, অরুণ কি করবে, ও কি চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে বসে থাকবে নাকি। তখন তো দেখে গেল, মা দিব্যি কথা বলছে ধীরে ধীরে। তাছাড়া, বাবা তো ছুটি নিয়ে বাড়িতেই আছে। দু'দিন হাসপাতালে কি সব পরীক্ষাটরিক্ষা করিয়েও এনেছিল বাবা।

ডাক্তার বলেছে, হসপিটালে রিমুভ করতে হবে। বাবার একটুও ইচ্ছে নেই।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর অরুণ মা'র কাছে এগিয়ে এলো।

মা কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন, চোখের দৃষ্টি ভাসাভাসা। মিলু মাথার

কাছে বসে পাখার বাতাস করছিল। মা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, দাদা এসেছে। মা, দাদা এসেছে।

মা বোধ হয় চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। তবু তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো।

বিছানার ওপর পড়ে থাকা ডান হাতটা তুলতে পারলো না মা, শুধু আঙুলগুলো হাতছানি দিলো।

অরুণ গিয়ে মা'র কাছে বসলো, মা'র হাতটা হাতের মধ্যে নিলো—মা, কষ্ট হচ্ছে তোমার?

মা মাথা নাড়লো না, কথা বলতে পারলো না। শুধু মা'র দু'চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়লো।

অরুণের বুকের ভেতর কেমন করে উঠলো। অনুশোচনায় দুঃখে ওর নিজেরও কাঁদতে ইচ্ছে হলো। কাঁদতে পারলো না। মিলু ভাববে, দাদাটা কি, ছেলে হয়েও কাঁদছে।

অনেকক্ষণ মা'র কাছে বসে রইলো অরুণ। মা'র কপালে হাত বুলিয়ে দিলো। মিলু যা ভাবে ভাবুক। মা ভাল হয়ে উঠলে তখন ও হয়তো শুনিয়ে শুনিয়ে হাসবে।

কিন্তু এ-ভাবে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। মিলু কিন্তু ঠায় বসে বসে পাখার বাতাস করছে, কোন ক্লান্তি নেই। মেয়েরা এসব কিন্তু বেশ পারে।

—অরুণ!

বাঁচা গেল। বাবার ডাক শুনে উঠে গেল অরুণ।

বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

—নাঃ, কিছু না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বললো।

অরুণ নিজের ঘরে চলে এলো। ক্ষিদে পেয়েছে খুব। কিন্তু এখন খাওয়ার কথা বলা যায় না। বাবা কি ভাববে, মিলু কি ভাববে। মা এত কষ্ট পাচ্ছে, ও না হয় একটু পেল। দিদি তো বড় বড় লেকচার মারে, উপদেশ দেয়। কেন, এ-সময় আসতে পারে

না? এসে একটু সেবা তো করতে পারে। মিলু একটা বাচ্চা মেয়ে। 'তোমারও তো মা অরুণ, তুমি একটু জোর করতে পারো না? ডাক্তার যখন বলছে, অপারেশন করতে…,' ছোটমাসী একদিন এসে বলে গিয়েছিল, যেদিন পি. জি-তে নিয়ে গিয়ে বাবা দেখিয়ে এনেছিল। কিন্তু তারপর থেকে চুপচাপ। 'জামাইবাবু, রোগটা কি, কিছু বললো?' ছোটমাসী জিজ্ঞেস করেছিল। বাবা মাথা নেড়ে জানালো—না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—বাবা কেন যে কিছু করছে না। রাত্রে মিলুকে বললে অরুণ।

মিলুর মুখ থমথম করছিল। ধীরে ধীরে বললে, বাবা কেমন যেন হয়ে গেছে। এ-সময় দিদি থাকলে তবু বোঝাতে পারতো।

এ-সময় দিদি থাকলে! সে তো শুধু অ্যাডভাইস দিতে জানে। নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। চিঠি দিলো মিলু, আসার তো নাম নেই। উল্টো কাজ বেড়েছে ওর, হপ্তায় হপ্তায় রিপোর্ট পাঠাও মা কেমন আছে।

চাকরিটা হয়ে গেলে টাকাপয়সার দিকটা অনেকখানি সুরাহা হতো। আজকাল খেতে বসে খেতে ইচ্ছেই হয় না, মাছের টুকরোটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। সোনার মা পয়সা মারছে, না বাবা বাজার-খরচ কমিয়ে দিয়েছে তাও জানে না অরুণ। মা'র অসুখে খরচ তো কম হচ্ছে না। বাবা বোধ হয় আর সামলাতেও পারছে না। এ-সময় অরুণের তো উচিত কিছু রোজগার করা। সংসারে কিছু সাহায্য করা। তা হলে ছোটমাসীও ওকে একটু সমীহ করতো। বড়মামা তো ওকে দেখে হাসে, যেন ও একটা গুড ফর নাথিং।

অরুণের নিজেরও এক-এক সময় তাই মনে হয়।

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দিনটা অবধি কোন দুর্ভাবনা ছিল না। ভিড় ঠেলে খেলা দেখতে গেছে, কিউ দিয়ে সিনেমার টিকিট কেটেছে, পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করেছে। তখন সমস্ত পৃথিবীকে বুড়ো আঙুল দেখানোর সাহস ছিল।

এখন রাতারাতি ওরা সবাই অসহায় হয়ে গেছে, ও টিকলু সুজিত। আমরা যেন কিচ্ছু নই, কিছুই করতে পারি না, কোন পাওয়ার নেই আমাদের। একটা ভাল চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলে অন্যকে জানাতে ইচ্ছে করে না। সুজিত একদিন ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বেরিয়ে আসছে, অরুণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললে, একটা বই ফেরত দিতে গিয়েছিলাম। অরুণ জানে স্রেফ মিথ্যে কথা, সুজিত নির্ঘাত জব-ভাউচারের চেষ্টা করছে, ফর্ম আনতে গিয়েছিল। একটা চাকরি পেলে বিলেত যাবে না কেন ? কিন্তু ওর ভয়, অরুণও না চেষ্টা করে। অথচ এই সেদিন অবধি সুজিত ব্রেন-ড্রেন নিয়ে তর্ক করেছে। যাক, ওর যা ব্রেন, বিলেতে পার্শেল করে পাঠিয়ে দিয়ে বিলেত দেশটাকে যদি ডোবানো যায়।

—গ্যাখ টিকলু, এতকাল স্টুডেণ্ট ছিলাম, মনে হতো পৃথিবীটাকে কমলালেবুর মত হাতে নিয়ে লোফালুফি করতে পারি। টিকলুকে বলেছিল অরুণ।

এখন হাসি পায়। ওরা কলেজের সব ছেলেরা যখনই একজোট হয়েছে···ওরা এক জোট হলে গর্মেণ্ট কাঁপে, আগুন জ্বলে, পুলিস ভয় পায়···এটুকুই জানতো। এখন ওদের আর কেউ কেয়ারই করে না। ছু' পয়সা রোজগার করতে না পারলে এখন আর ওদের কোন পরিচয়ই নেই। বাড়িতে প্রেস্টিজ নেই তো বাইরে। কলেজে যাবার সময় অ্যাদ্দিন তবু একটা ছুটো টাকা নিতো মা'র কাছ থেকে, টিফিনের নাম করে সিগারেট খেতো, এখন মিলুর হাত দিয়ে বাবার কাছ থেকেই টাকা চাইতে হয়।

—বিশ্বাস কর সুজিত, আমার এক-একদিন বিরাট কিছু একটা করে ফেলতে ইচ্ছে করে। মনে হয় যেখানে যত গরমিল আছে, সব মিলিয়ে দিই অঙ্কের মত। মনে হয় যেখানে যত অবিচার আছে সব ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিই।

সুজিত হেসেছিল ওর কথা শুনে।—তোর গা থেকে কলেজের গন্ধ

আর যাচ্ছে না। ও সব ছেড়ে নিজের ফিউচার বানা। সকলে ভাল ভাল চাকরি করবে, আর আমি দেশসেবা করবো, ও মাইরি আমার কুষ্ঠিতে নেই।

—যা বলেছিস। টিকলু টিপ্পনি কেটেছিল।—অরুণ প্রেমে পড়েছে, ও তো গ্রেট হবার স্বপ্ন দেখবেই। আমি বাবা লীডারদের চিনে গেছি।

অরুণ কোন কথা বলে নি আর। টিকলু তো ঠিকই বলেছিল। প্রেম ছাড়া আর কি জন্যেই বা ও সব গরমিল মিলিয়ে দিয়ে পৃথিবীটাকে বদলে দিতে চাইছে! নাঃ, বাজে কথা। এতদিন ভাবতো পৃথিবীটাকে বদলে দেবে, এখন জেনে গেছে তা সম্ভব নয়, তাই নিজেকেই বদলে নিতে চাইছে। রুণু, ছোট ছোট সুখ—এসব চাওয়ার মানেই তো নিজেকে বদলে নিয়ে বেমানান পৃথিবীটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া।

রুণুকে বিয়ে করার কথা এখনো ভেবে দেখে নি। ভালবাসে, ভালবাসে। ইচ্ছে হলে তখন আর কোন বাধানিষেধ মানবে না। বাবা, মা, দিদিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে মা'র কথা মনে পড়ে গেছে। ছি, ছি। সব দায়দায়িত্ব ও ভুলে গিয়েছিল।

দূর্, কাল থেকে আর রুণুর সঙ্গে দেখা করবে না, রুণুর কথা আর ভাববে না। রুণুকে দেখলেই ও সব দায়দায়িত্ব ভুলে যায়। কি আশ্চর্য, আজ যতক্ষণ রুণু ছিল, যতক্ষণ রুণুর কথা ভেবেছে, একবারও মা'র কথা মনে পড়ে নি। রুণু ওর কষ্ট বোঝে না বলে ওর অভিমান হতো, কই, মা'র কষ্ট ও যে বুঝছে না, তার বেলা?

অরুণের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই যাঃ, সুজিত যে বললে উর্মি ওকে আজ ফোন করতে বলেছিল! বিশেষ কি দরকার। সুজিতের সঙ্গে গল্প করতে করতে ও একদম ভুলে গেছে।

এস কে এম-এর সঙ্গে ঘোরাঘুরির কথাটা টিকলু বলার পর থেকে

ঊর্মির বিরুদ্ধে ওর একটা দারুণ অভিমান। অরুণ চায় ঊর্মি বিদ্যুতের মত পবিত্র আর বিশুদ্ধ থাকবে। ঊর্মি শুধু মাইনিং এঞ্জিনিয়ারকে ভালবাসবে, একদিন বিয়ে করবে, সুখী হবে। ঊর্মি খারাপ হলে, কিংবা ঊর্মিকে কেউ খারাপ বললে যেন ওরই প্রেস্টিজে ঘা লাগবে।

—অরুণ! বাবা বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে বসে বিলেত থেকে আনানো কয়েকটা মেডিকেল জার্নালের পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ ডাক দিলো।

এই এক রোগ হয়েছে বাবার এখন। মা'র রোগটা কি তাই ধরা গেল না এখনো, ডাক্তার তো বলছে ব্রেনে কিছু, অপারেশন করাতে হবে, এদিকে বাবা যত রাজ্যের প্যাম্পলেট জার্নাল আনিয়ে ঘর বোঝাই করছে।

বাবার ডাক শুনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো অরুণ।

বাবা চোখ তুলে তাকালো, চোখ নামালো। তারপর বললে, না থাক।···শুয়ে পড়গে যা। অনেক রাত হয়েছে।

টিকলু অন্যায় করেছে, একশোবার স্বীকার করবে ও অন্যায় করেছে। না করে উপায় ছিল না তাই। কিন্তু ওর কি কোন মান ইজ্জত নেই নাকি। বাবা তো ঠাণ্ডা মাথায় বলতে পারতো, ওর পাস করার খবরটা শুনে মা একটু খুশী হতে পারতো। তা না, বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই এমন চেঁচামিচি চিৎকার করলো, ভাই-বোনদের সামনে এমন গালিগালাজ করলো বাবা, ওরা তো টিকলুর চেয়েও খারাপ হবে, দাদাই এই, তবে আর আমরা ভাল হবো কেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়লো টিকলুর। বাবাকে কেউ সমীহ করে না, পাড়ায় বাবার কোন ভয়েস নেই, সবাই কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, এই সব দেখেই না পড়াশুনার দিকে মন গিয়েছিল। তখন অরুণ আর সুজিত ওকে এত হেয় চোখে দেখতো না। দেখলে বন্ধুত্বই হতো না। কিন্তু ওর বাবাকে নিয়ে সুজিত আর ক্লাসের আরেকটা ছেলে একদিন ঠাট্টা করছিল, ও হঠাৎ এসে পড়ে শুনতে পেয়েছিল। তার পর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত সুজিতের ওপর ওর রাগ ছিল।

সবাই, সব ছেলেই সুযোগ পেলে একবার করে বাবা দেখাতো। কে কত বিদ্বান, কে কত বড় চাকরি করে। কিছু না থাকলে অমুক মন্ত্রী আমার মামার মেসোর মেজশালীর দেওর। টিকলুর যে বলার মত কিচ্ছু নেই। ও তাই চুপ করে থাকতো, আর ভিতরে ভিতরে রেগে উঠতো। যারা ঐ সব বলাবলি করতো তাদের ওপর রাগ গিয়ে পড়তো শেষে বাবার ওপর। এক-এক সময় তাই মনে হতো, পড়াশোনা করে পাস করেই বা কি লাভ। ডিগ্রি তো বড়জোর পেন্সিলের দাগ তোলার ইরেজার, উল্কির দাগ তুলবে কি দিয়ে!

ও রকবাজদের মত কথা বলে, চোঙাদের সঙ্গে মিশে যায়, কিন্তু অরুণ বোঝে না, ওটাও এক ধরনের স্নবারি। তোদের পালিশ দেওয়া ভদ্রতাকে ভেংচি কাটার জন্যে। আসলে চোঙা প্যাণ্টদের ও ঘেন্নাই করে, কারণ ও নিজেকে ঘৃণা করে। যাদের পরিচয় দেবার মত পরিচয় আছে, ডিগ্রি না থাকলে তাদের ভেংচি কাটা যায় না, বড়জোর তাদের ওপর রেগে যাওয়া যায়।

সেল্স রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরিটা যদি পেয়ে যায় নিয়ে নেবে, ভাবলো টিকলু। ভেতরে ভেতরে ধরাধরি করছে, চেষ্টাও করছে, অরুণ সুজিতদের বলে নি। কোলকাতায় আমার কি আছে ? না হয় হোটেলে হোটেলেই ঘুরবো, বাড়িটাও তো হোটেল।

বিলের টাকাটা আদায় করে সবটা মেরে দেবার ইচ্ছে ওর ছিল না। কি করবে, নন্দিনী হঠাৎ ধার চেয়ে বসলো। পকেটে টাকা, বলা যায় কি যে দিতে পারবো না। তাছাড়া নন্দিনীকে ওর ভাল লাগছে, সুধা যতই তাচ্ছিল্য করছে ততই ওর ইচ্ছে হয় নন্দিনীর কাছে ছুটে যেত।

আসলে টিকলু এই বাড়ি থেকে, পুরোনো জীবন থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। কিন্তু এখান থেকে ও কোথায় যেতে চায় তা নিজেই জানে না।

উপস্থিত নন্দিনীর কাছে।

প্যাণ্ট শার্ট পরে তৈরি হচ্ছে, মা বললে, আপিসার ছেলে, ফিটফাট হয়ে বেরুচ্ছে। ঠাট্টাটা হঠাৎ ধমক হয়ে গেল।—বেরুচ্ছিস যে, টাকাটা দিয়ে যা।

টিকলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, দেবো তো বলেছি, তোমাদের ধার আমি এক পয়সাও রাখবো না। একটু থেমে বললে, এখন নেই।

—নেই ? মা'র গলার স্বর হতাশ শোনালো।—নেই মানে ? সংসার চলবে কি করে ? ঐ টাকার ওপর ভরসা করে ছিল তোর বাবা।

—নেই মানে নেই। জোর দিয়ে বললে টিকলু। মোজা খুঁজতে গিয়ে এক পাটি পেলো, আরেক পাটি কোথায় কে জানে। রোজ এই এক ঝামেলা। বাড়ি ভর্তি ভাইবোন, এ ওটা টানছে ও এটা ফেলছে। বিরক্তির একশেষ। কখনো মোজা পাবে না, কখনো গেঞ্জি কিংবা গামছা। গামছায় করে বাবা আবার একদিন মাছ নিয়ে এসেছিল। আঁশটে গন্ধ সাবান দিয়েও যায় নি!

মোজা খুঁজতে গিয়েও বিরক্তি। নিজেব মনেই বললে, শালা বাড়ি, না ধোপার ভাটি।

সত্যিই তাই। সব ক'টা ঘর আর বারান্দায় ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে—শাড়ি, ধুতি, বাচ্চাদের ইজের, কামিজ, এটা-ওটা। লম্বালম্বি টাঙানো শাড়ি, নড়াচড়া করতে গেলেই মাথায় ভিজে কাপড় ঠেকে।

শেষ পর্যন্ত পেলো মোজাটা। জুতোটা পালিশ করাতে হবে। ঐ একটা সময় টিকলুর নিজেকে বেশ রাজা-রাজা লাগে। সিগারেট ধরিয়ে জুতো-পালিশ বাচ্চাটার পা-দানিতে পা তুলে দিয়ে যখন দাঁড়িয়ে থাকে, আর বাচ্চা ছেলেটা ফটাফট ফটাফট পালিশ করে, তখন টিকলুর খুব ভাল লাগে।

বাইরে বেরিয়ে এসে টিকলু পকেটে হাত দিয়ে দেখলো। তিনটে নোট এখনো আছে। মাকে দিব্যি বলে দিলো, নেই।

একবার ভাবলে সুধাদের বাড়ি যাবে কিনা! রোজ রোজ গেলে অন্য সবাই কি ভাববে। আর গিয়েও হয়তো তাকে একা পাবে না। পেলেও সুধা কাউকে না কাউকে ডেকে গল্প করতে বসবে। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। এক একদিন এমন রাগ হয়। একদিন তো রেগে গিয়ে বলেও ছিল, তোমাকে জব্দ করার অস্ত্র আমার হাতে আছে, দেখাবো যেদিন···

সুধা ভয় পেয়েছিল। তারপর ন্যাকামি করে করে ওকে শান্ত করেছিল। একটুখানি সুযোগ দিয়েছিল।

তারপর থেকে টিকলুর নিজেরই খারাপ লেগেছে। এ তো স্রেফ ব্ল্যাকমেল। ভয় দেখিয়ে কি ভালোবাসা পাওয়া যায় নাকি। 'তুই কিচ্ছু বুঝিস না টিকলু, কিচ্ছু বুঝিস না।' যত বোঝে অরুণ। ভালবাসা কি তা যদি নাই বুঝতো, তা হলে সুধার ব্যবহার দেখে মনে হয় কেন, রক্তে কেউ শুকনো লঙ্কা বেটে দিয়েছে। আরে যাঃ, সুধার ওপর ও কখনো রিভেঞ্জ নিতে পারে নাকি। নেবে সুধা কখনো বিপদে পড়লে তার দারুণ কোন উপকার করে দিয়ে। তখন বুঝবে, রক্তমাংসের শরীরটাও ভালবাসতে জানে। বছর তিনেক আগে এক দিন রাস্তা থেকে একটা মেয়েকে দশ টাকা দিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিল ওরা ক' বন্ধু। হুল্লোড় আর ফাজলামি করেছিল, কিন্তু মেয়েটাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় নি। সেক্স, সেক্স! এক গালাগাল। জানে না তার মধ্যেও ভালবাসা আছে। শরীরকে ভালবাসা। অদ্ভুত সব ধারণা লোকের, ভেনাসের মূর্তিটা বেঁচে উঠলেই লোকে বলবে অশ্লীল, অশ্লীল। তা হলে প্রাণটুকুই অশ্লীল নাকি? অশ্লীল এই হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি?

ঊর্মি তো ওকে কথায় কথায় বলে, অসভ্য। ওটা অবশ্য মেয়েদের কথার মাত্রা। 'মেয়েটা হয়তো নির্ভেজাল, বোকা বোকা, জাহাজ দেখে নি কখনো, ছেলেটা তাকে ভুলিয়েভালিয়ে গঙ্গার দিকে নিয়ে যায়; বলে, চলো চলো জাহাজ দেখাবো।' ব্যস্, 'জাহাজ দেখানো' কথাটায় আপত্তি। ভেতরে অন্য কোন মানে যদি দেখে থাকিস, সে তো তোরও দোষ। সাদা কথার সাদা মানে বুঝলেই আর ঝঞ্ঝাট থাকে না। ঊর্মি তো হাসতে হাসতে বললে, 'তুই ছিলি টিকলু? ডাকলি না কেন? হ্যাঁ, নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম, এস কে এম-এর সঙ্গে দেখা। বললেন, চলো নামিয়ে দিয়ে যাবো।' ব্যস্, অরুণ তো বিশ্বাস করলো। আমি অবিশ্বাস করছি তেমন ভাবও দেখাই নি।

মেয়েদের টিকলু একটুও বিশ্বাস করতে পারে না।

টিকলু ভাবলে, বিরাম বোধ হয় নন্দিনীকে খুব বিশ্বাস করে। নন্দিনী? না, নন্দিনী নিশ্চয় বুঝতে পারে ও কেন ওদের ওখানে প্রায়ই যায়। বরং টিকলু তো সুযোগ পেলেই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

কোমর-ভাঙা একটা ট্রাম বিচ্ছিরি আওয়াজ করে দুলতে দুলতে আসছিল। টিকলু লাফিয়ে উঠে পড়লো।

কড়া নাড়তেই গ্যারেজের ওপরের জানলা থেকে পর্দা সরে গেল।

বিরাম বললে, দাঁড়া, যাচ্ছে।

ইচ্ছে করেই তো সকালে এসেছে টিকলু। নন্দিনীর কাছে ওর আসতে ইচ্ছে হয়, গল্প করতে ভাল লাগে। এ ছাড়া আর কি। ভিতরের লোভটাকে চাপা দিয়েই রেখেছে। জানে, ওর শরীরে পৌঁছনো যায় না।

নন্দিনী গিয়ে দরজা খুলে দিলো। মুখ থমথমে। টিকলুকে দেখেও একটু হাসতে পারলো না নন্দিনী। টিকলু বেশ বুঝতে পারলো, এইমাত্র বিরামের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেছে নন্দিনীর। আজকাল তো প্রায়ই হয়। আসলে নন্দিনী হয়তো বুঝতে পারছে ও ভুল করেছে, ভীষণ ভুল করেছে। কিংবা বিরাম নিজেই হয়তো বিরক্ত হচ্ছে নন্দিনীর ওপর। ভাবছে সব দোষ নন্দিনীর। আরে বাবা, প্রেমটাই সব নয়। এত সব দায়দায়িত্ব, অভাব-অনটন, ঝুটঝামেলার কথা তখন হয়তো ভাবেই নি বিরাম। নিজেকে তৈরি করার সময় পায় নি। কিংবা দাদা-বৌদি, বাবা-মা সকলকে ছেড়ে এসে ভিতরে ভিতরে দগ্ধে মরছে। নন্দিনীকে বলতেও পারছে না।

নন্দিনী একদিন বলেছিল, ও তো বাড়ির কোন খবরই রাখে না, রাত করে বাড়ি ফেরে। আমাকে যে কিভাবে চালাতে হয় সে আমিই জানি।

বিরামের ওপর রেগে গিয়েছিল টিকলু।

ঘরে ঢুকে দেখলে বিরাম আপিস যাওয়ার জন্যে তৈরী। এক

থালা ভাত ছিট্‌কে পড়ে রয়েছে। নির্ঘাত ঝগড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে থালাটা।

টিকলু ঢুকতেই বিরাম উঠে দাঁড়ালো।—আমি চললাম, দেরি হয়ে যাবে। বলে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে গম্ভীর মুখ নিয়ে এলো নন্দিনী, ছড়িয়ে থাকা ভাতগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে থালায় রাখলো, তারপর সেটা বাঁ হাতে ধরে জায়গাটায় ন্যাতা বুলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘড়ি দেখলো টিকলু। বিছানায় বসে বসে ঘড়ি দেখলো। প্রায় আধঘণ্টা পরে এক কাপ চা নিয়ে ঢুকলো নন্দিনী।

মুখ তখন নির্বিকার।

চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা প্রাণহীন গলায় বললে, না খেয়ে বেরিয়ে গেল! গলার স্বরে কান্না এসে গেল ওর।—দেখলেন, না খেয়ে বেরিয়ে গেল।

টিকলু কোন কথা বললো না। কাপের চায়ে দু'বার চুমুক দিয়ে চোখ তুলে তাকালো। দেখলে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে নন্দিনী, মুখ নামিয়ে। জল-টলমল চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করলো টিকলু। ওর বুকের মধ্যে কেমন একটা নিষ্পাপ কষ্ট আর লুকোনো লোভ ডুব-সাঁতার দিতে দিতে ভেসে উঠছিল।

—দাদা এসেছিল, তাও যেতে দিলো না। গলার স্বরটা কান্নার মত শোনালো।

টিকলু চুপ করে রইলো। তারপর মুখ তুলে হাসবার চেষ্টা করলো ও, নন্দিনীকে বললে, বসুন আপনি। দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ।

নন্দিনী ধীরে ধীরে এসে বসলো টিকলুর কাছে। এত কাছে আর কোনদিন বসে নি। শুধু সেদিন কলঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ওর গা ঘেঁষে গিয়েছিল। টিকলুর সমস্ত শরীর কেমন কেমন করে উঠেছিল।

আজ আবার তেমনি লাগছে। নন্দিনীকে সুধা বানিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

নন্দিনীর হাতটা মুঠো করে ধরলো টিকলু। বোধহয় অস্ফুটে কি একটা সান্ত্বনা দিতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনী ডুকরে কেঁদে উঠে টিকলুর কোলের ওপর মুখ ডোবালো।

নন্দিনীর পিঠের ওপর হাত রাখলো টিকলু।—আপনি ফিরেই যান, দাদার কাছেই ফিরে যান।

নন্দিনীর শরীরের ওপর লোভ, নন্দিনীর অসহ্য কষ্ট, আবার হয়তো টাকাপয়সা দিতে হবে সেই ভয়—পলকের মধ্যে অনেক কিছু খেলা করে গেল টিকলুর মনের মধ্যে।

অনেকক্ষণ পরে নন্দিনী মুখ তুললো, জলে মাখামাখি চোখমুখ ওর হেসে উঠলো। বললে, হাতে কিচ্ছু নেই, কি করে কি করি বলুন তো? ও বোঝে না।

নন্দিনীকে এক মুহূর্তে সুধা বানিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো টিকলুর।

নন্দিনী মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, আপনার কাছে আর কত চাইবো। আমাদের জন্যে আপনি অনেক করেছেন। চোখ নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কুড়িটা টাকা অন্তত না হলে···

টিকলু বললে, টাকা নেই নন্দিনী, টাকা নেই আমার কাছে।

সমস্ত শরীর মন তেতো হয়ে গেল। বাবার গালাগাল, মা'র কথাগুলো মনে পড়তেই টাকার কথাটা অসহ্য বিরক্তি হয়ে গেল। বললে, টাকা নেই, সত্যি টাকা নেই।

পকেটে তখনো তিনখানা দশ টাকার নোট!

নন্দিনী মুখ তুলে তাকালো টিকলুর মুখের দিকে।

কিন্তু টিকলু চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

নন্দিনী কি টিকলুকে বোকা ভেবেছে নাকি? দিনের পর দিন টাকা চাইবে, সেই বিয়ের সময় থেকে শুরু হয়েছে, আর টিকলু শুধু

দিয়েই যাবে? নন্দিনীর জন্যে কি করে নি ও? অথচ নন্দিনী ভাবছে, মুখের হাসি দিয়েই ওকে সন্তুষ্ট করবে।

নন্দিনী মুখ তুললো না। ধীরে ধীরে অস্ফুটে বললে, আমি এমনি চাইছি না।

হঠাৎ ও কেঁদে উঠে বললে, আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই টিকলুদা।

একটু থেমে চাপা গলায় বললে, এমনি চাই না, আপনি বরং দুপুরে আসবেন।

বলেই হয়তো ভীষণ লজ্জা পেয়ে ছুটে পালালো নন্দিনী।

—নন্দিনী, নন্দিনী! টিকলু ডাকলো।

কিন্তু নন্দিনী এলো না। বোধহয় চূড়ান্ত লজ্জায় ও আর সামনে আসতে পারলো না।

টিকলু নিজেই নেমে এসে নন্দিনীকে খুঁজে বের করলো। নন্দিনী তখনো দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ফর্সা ধপধপে কান আর কানের চারপাশ রক্ত জমে লাল হয়ে আছে। যাব্বাবা, লজ্জায় কান লাল হওয়া পড়েই এসেছে, সত্যি এমনি হয় নাকি!

টিকলু পকেট থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে বললে, এই নিন।

নন্দিনী তখনো ফিরে তাকালো না।

টিকলু নন্দিনীর হাত ছুঁলো না। দেয়ালের তাকে নোট দুটো রেখে বললে, এইখানে রইলো।

বলে বারান্দা পেরিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নামলো। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। মাথার মধ্যে যেন কিচ্ছু নেই। কেমন একটা ঘোরের মত।

হাঁটতে হাঁটতে, ট্রাম লাইনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে টিকলুর ইচ্ছে হলো ও চিৎকার করে বলে ওঠে, শালা টিকলু, তুই মহৎ, তুই শালা বেজায় মহৎ।

টিকলু নিজের মনকে বললে, আমাকে কেউ বুঝলো না রে, কেউ বুঝলো না। আমার নাকি নন্দিনীকে দেখে লোভ হয়, অরুণ আমাকে ঘেন্না করে, কিন্তু আমি ওদের চেয়ে অনেক বেশী মহৎ। আমি তো সৎ, আমি তো ভাল।

নিজেকে শালা বিশ্বাস নেই। আমি আর কোনদিন নন্দিনীর কাছে আসবো না, কোনদিন না। টিকলুকে কি কোন বিশ্বাস আছে নাকি।

'ভালবাসার তুই কিচ্ছু বুঝিস না টিকলু, কিচ্ছু বুঝিস না।' অরুণ বলেছিল। আসলে অরুণ, তুই বুঝিস না। আমি শরীরের ভালবাসা চেয়েছিলাম রে, শরীর চাই নি।

কেউ কোথাও ছিল না, চারদিক নির্জন। হাঁটতে হাঁটতে টিকলু হঠাৎ জোরে জোরে উচ্চারণ করলে, আমার মধ্যেও মানুষ আছে রে, অরুণ, আমি সৎ, তোদের চেয়ে অনেক বেশী সৎ।

কলেজে যেবার খুব হইচই হলো, ট্রাম-বাস পুড়লো, সেদিন উর্মিকে টিকলু বলেছিল, আড্ডা দিই আর যাই করি, আমাদের ভিতরেও বারুদ আছে, কেউ শালা জ্বালিয়ে দিলো না।

আজ হঠাৎ আবার সেই কথাটা টিকলুর মনে পড়লো।

অরুণের এখন অন্য এক ভাবনা।

প্রথম কয়েকটা দিন ও পালকের বিছানায় গোলাপের পাপড়ির চাদর গায়ে দিয়ে স্বপ্নের ঘোরে ঘুমিয়েছে। ওর মনে হয়েছে ওর চেয়ে সুখী আর কেউ নেই।

ওর যখন সতেরো বছর বয়স, ফ্যাকাশে রোগা চেহারার একটা মেয়েকে ভালবাসতে চেয়েছিল। নীপা। ওর দুর্বলতা নিয়ে মেয়েটা তার বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি করতো। অরুণের এখন ইচ্ছে হয়, ও রুণুকে নিয়ে বেড়াবে, হাসবে; মুগ্ধচোখে মুখের দিকে তাকাবে, আর নীপা আরো রুগ্ন আরো কালো চেহারা নিয়ে তাকিয়ে দেখবে। অদ্ভুত। নীপাকে ওর তো মনেই নেই, হঠাৎ দেখা হলে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। মেয়েরা এত চটপট বদলে যায় যে চেনাই যায় না। কিংবা মেয়েদের বোধ হয় কখনোই চেনা যায় না।

অরুণের এখন আর তেমন ভয় হয় না, রুণুর ওপর কেমন একটা বিশ্বাস এসে গেছে। বাঃ, রুণু তো আমাকে ভালবাসে, তা হলে আর হারাবার ভয় কিসের। এতদিন ভয় ছিল বলেই সুজিত আর টিকলুকে আড়ালে আড়ালে রেখেছে। কিংবা টিকলুদের প্রেসের টেলিফোনটা ব্যবহার করতে হয় বলেই আর ওকে আড়ালে রাখা যায় না। একদিন তাই সুজিত আর টিকলুকে সঙ্গে নিয়ে রুণুর সঙ্গে দেখা করেছিল।

ভেবেছিল রুণুর ভুরু কুঁচকে যাবে। ভেবেছিল এক সুযোগে রুণু ওকে বলবে, আজকের দিনটাই মাটি করলে।

কোথায় কি, সুজিত আর টিকলুকে পেয়ে রুণুর হাসি এক মুহূর্তে একেবারে ফোটা তুবড়ি। সারাক্ষণ জমিয়ে গল্প করেছে ওদের সঙ্গে, অরুণ আছে সে কথাই যেন ভুলে গেছে।

সুজিতকে রুণুর একটু বেশী বেশী ভাল লেগেছে, অরুণের বুঝতে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু রুণুর ঐ গায়ে-পড়া ভাব অরুণের একটুও ভাল লাগে নি। অরুণের ইচ্ছে, সুজিত আর টিকলুর সঙ্গে রুণু একটু দূরত্ব রেখে কথা বলবে, আর অরুণের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে যে, ওরা দেখেই ভাববে মেয়েটা অরুণকে ভীষণ ভালবাসে।

তাই রুণু যখন সুজিতকে বললো, আবার কবে আসবেন বলুন, তখন অরুণের খুব রাগ হয়েছিল।

সুজিত অবশ্য বললে, আমি? আমি তো বোধ হয় চলে যাচ্ছি। ইউ কে নয়তো ক্যানাডা। জব-ভাউচার নিয়ে চলে যাবো, গিয়ে চাকরি করবো সেখানে।

সুজিত রুণুকে এড়িয়ে গেল দেখেও অরুণ খুশী হতে পারলো না। শালা বিলেত দেখাচ্ছে রুণুকে। জব-ভাউচার দেখাচ্ছে। আর রুণুটা তো একদম বোকা, ও হয়তো ওসব বিশ্বাস করবে। কিংবা ভাববে বিলেতে চাকরি করা যেন খুব গর্বের। হয়তো সুজিতের সঙ্গে তুলনা করে অরুণকে মনে হবে—কিছু না, কিছু না।

অরুণ যে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে, রুণু তা বুঝতেই পারে নি। ও হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে দিলো সুজিতের দিকে, দেখুন না, আমার 'ফরেন' যাওয়া হবে কিনা।

ফেরার সময় তাই অরুণ হঠাৎ বললে, সেই হলুদ শাড়ির মেয়েটাকে মনে আছে রে টিকলু? বেশ আলাপ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ রুণুকে যদি তোরা সস্তা ভেবে থাকিস, কিংবা যদি ঠাট্টা করে বলিস, ও সুজিতের প্রেমে পড়ে গেছে, তা হলে···হ্যাঁ, অরুণও কম যায় না। ও শুধু রুণুকে নিয়ে মজে যায় নি। অথচ, কোথায় কি, হলুদ শাড়ির সঙ্গে ওসব কোন সম্ভাবনাই নেই।

কিন্তু টিকলু বিশ্বাস করলো। চোখ বড় বড় করে বললে, সত্যি তোর কপাল মাইরি, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, না হয় ওটাকে স্টেপনি বানিয়ে নিবি।

অরুণ বুঝতে পারলো না দেখে টিকলু হেসে উঠে বললে, গাড়ির একটা ফালতু চাকা থাকে দেখিস না ? সেটাই স্টেপনি।

অরুণ কোন কথা বললো না। রুণুর কাছে ও নিজেই ফালতু কিনা তাই বা কে জানে ?

আগে রুণুর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল না, এখন হয়েছে নতুন জ্বালা।

এখন এক কাজ হয়েছে অরুণের, দুপুরে এসে টিকলুদের প্রেসে বসে থাকা। টিকলুর বাবা এ সময় থাকে না, রুণু জানে। 'মনে থাকবে রে বাবা, মনে থাকবে', রুণু ফোন নম্বরটা শুনে বলেছিল, কখন ফোন করতে হবে তাও বলে দিয়েছিল অরুণ। কিন্তু বিশ্বাস করে নি, ভেবেছিল, রুণু নিজের থেকে নিশ্চয় ফোন করবে না।

কিন্তু অরুণের এখন ওই এক কাজ হয়েছে। দুপুরে একটা ঘণ্টা টেলিফোনের সামনে বসে থাকা। কখনো টিকলু থাকে, কখনো থাকে না। ও থাকলেই হাসাহাসি করে এমন সব আজেবাজে কথা বলে, একটাও যদি কানে যায়, রুণু আর অরুণের সঙ্গে দেখাই করবে না। যেদিন ও একা একা আসে, সেদিন মন খুলে কথা বলতে পারে। টিকলু থাকলে, নিজেকে রুণুর পায়ে লুটিয়ে দেয়ার মত করে কথা বলতে পারে না। কিন্তু সেভাবে কথা বলেও তো লাভ নেই। ও যা বলতে চায় তার তো কোন ভাষা নেই। ওর ইচ্ছে হয় প্রত্যেকটি শব্দের গায়ে একটু করে চোখের জল মিশিয়ে দিতে।

অরুণের এখন অন্য এক কষ্ট। দিনের পর দিন সব কাজ ফেলে ও ছুটে আসে টিকলুদের প্রেসে, আর সে কী অসহ্য যন্ত্রণা। প্রতিটি সেকেণ্ড যেন এক একটা পক্ষকাল। সকাল থেকে উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে এই সময়টার জন্যে, আশায় আশায় স্বপ্ন দেখে, রুণু নিশ্চয় টেলিফোন করবে। হয়তো বলবে, 'যাবো ? আজ দেখা করার মত সময় আছে হাতে।' যতক্ষণ থাকে, টেলিফোনের দিকে চোখ। রাস্তা দিয়ে একটা সুন্দর মেয়ে চলে গেল একদিন, টিকলু বললে, 'ছাখ, ছাখ',

অরুণ দেখলো না, কিংবা দেখেও দেখলো না। ওর কান রিরিরিং, রিরিরিং শোনার জন্যে উৎকর্ণ। এক-একবার হাতের ঘড়িটা দেখে, আশার লগ্ন পার হতে আর কতক্ষণ, এক-একবার হতাশ হয়ে ভাবে, আজ আর বোধ হয় ডাক এলো না, আবার পরক্ষণেই মনে হয়, আসবে আসবে।

একবার টেলিফোনটা সত্যি সত্যি বেজে উঠলো।

একটিবার বাজতেই ঝট করে রিসিভার তুললো ও।

—আজ্ঞে না, হরিদাসবাবু নেই, এক ঘণ্টা পরে করবেন।

বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

টিকলু হেসে উঠে বললে, একটা মুভি ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখতাম তোর। মুখটা তখনই দপ্ করে জ্বলে উঠলো, তখনই নেবানো কুপী।

টিকলুকে নিয়ে এই এক মুশকিল। ও না থাকলে অরুণ নিশ্চিন্ত। শেষ অবধি টেলিফোন না এলে বুকের জ্বালা বুকেই গোপন করা যায়। টিকলু থাকলে উর্মি আর সুজিতকে গিয়ে বলবে, হাসাহাসি করবে।

আচ্ছা, শুধু তো একটা ফোন, কয়েকটা কথা। তা হলেই সেদিনটা আনন্দে কেটে যায়, বুকের জ্বালা জুড়িয়ে যায়। তাও পারে না কেন রুণু?

যেদিন ফোন আসে না, পর পর কয়েক দিন হয়তো আসে না, অরুণের সব কিছু বিস্বাদ লাগে, ইচ্ছে হয় হকি স্টিক দিয়ে পৃথিবীটাকে নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এক-এক সময় মনে হয় বুকের মধ্যে এত যে যন্ত্রণা, বোধ হয় একমুঠো মাংস কিংবা ফুসফুস কিংবা কি যেন পচা ঘা হয়ে গেছে, খামছে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে স্বস্তি।

ফোন আসে না, ফোন আসে না, তারপর হঠাৎ একদিন।—বৃষ্টি, আমি বৃষ্টি। যেন রুণুর গলা চেনে না অরুণ, যেন পরিচয় দেয়া

দরকার। একটা ছিপিখোলা উল্লাস অরুণের মুখেচোখে ছড়িয়ে পড়ে।

—উহুঁ, আজ কি করে যাবো, আজ তো···

ব্যস, উড়ন্ত ফানুসটা, আকাশ-ছুঁই-ছুঁই ফানুসটা হঠাৎ গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুন হয়ে যায়।

—শোনো, কাল যাবো। কাল কি বলো তো? রুণু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে।

অরুণ যেন জানে না। রুণু ফোন নম্বরটা মনে রাখতে পারে, আর অরুণ এই দিনটা মনে রাখতে পারে না?

—তোমার জন্মদিন।

জন্মদিন। রুণু এসেই বললে, আমি ভাবতেই পারি নি। সেই কবে তোমাকে বলেছিলাম, তারিখটা তুমি ঠিক মনে রেখেছো?

বাঃ, মনে থাকবে না? এ তো সামান্য ব্যাপার। অরুণ তো ভাবে ওদের দু'জনের মনের মধ্যেও কথা চলে। পর পর কয়েক দিন ফোন না পেয়ে অরুণ নিজেই ফোন করলো একদিন, আর রুণু বললে, ও মা, আমি তো এইমাত্তর তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। রুণুর জন্মদিন ওর নাকি মনে থাকবে না। এই একটা মাস ও খরচ কমিয়ে কমিয়ে শুধু টাকা জমিয়েছে। ওর যদি টাকা থাকতো খুব দামী একটা কিছু দিতো অরুণ।

তিনটে দিন শুধু দোকানে দোকানে ঘুরেছে। নিউ মার্কেটে।

মাত্র সাতটা টাকা। কিই বা কিনবে। কিচ্ছু পাওয়া যায় না, কিচ্ছু পাওয়া যায় না। যা কিছু পছন্দ হয়েছে, দাম শুনে পিছিয়ে এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে, হঠাৎ একটা শো-কেসে সুন্দর একটা কাশ্মীরী সিল্কের স্কার্ফ দেখতে পেলো। এক কোণে সূক্ষ্ম সুতোর ছোট্ট একটি নক্‌শা। একটা দীর্ঘ চেনার গাছ রাজার মত দাঁড়িয়ে

আছে, তার গুঁড়িতে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোট্ট একটি শিকারা। দড়িটা জরি দিয়ে বোনা, দড়ির মতই।

অরুণ জিজ্ঞেস করলে, কত দাম ?

রুণুর কাছে অরুণ ভিখিরি, ভিখিরি। তা বলে ওর চেহারাও কি ভিখিরির মত ?

লোকটা হেসে উঠলো।—বহুৎ দাম, বহুৎ দাম। যেন দামটা বলতেও তার কষ্ট।

প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে সাতটা এক টাকার নোট ছুঁলো অরুণ, অপমানে রাগে সেগুলো মুঠো করে ধরলো, মুঠোর মধ্যে পিষে ফেললো। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত বাইরে বেরিয়ে এসে দুমড়ে যাওয়া কুঁকড়ে যাওয়া নোটগুলো আবার হাতের ওপর রেখে সমান করলো।

বহুৎ দাম, বহুৎ দাম। একবার ইচ্ছে হলো ঊর্মির কাছ থেকে ধার নিয়ে এসে দামটা ছুঁড়ে মারবে দোকানদারের মুখে। স্কার্ফটা কিনে নেবে। পরক্ষণেই ভাবলে, ঊর্মির কাছে ধার নিয়ে রুণুকে জন্মদিনের উপহার দেবে ? সে তো রুণুর অপমান।

ভাবতে ভাবতে শেষ অবধি কিছুই কেনা হলো না।

জন্মদিন, জন্মদিন।

রুণুর সঙ্গে প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে চলে গেল অরুণ, সামনে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে।

তারপর নির্জন ঘাসের দিকে, কেল্লার পিছনের ডিচ্ ঘেঁষে এক জায়গায় বসলো অরুণ।—বোসো। রুণুকে বললে।

রুণু হেসে বললে, উঁহু, উঠে দাঁড়াও।

অরুণ কিছু না বুঝে উঠে দাঁড়ালো, আর রুণু ওকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।—আমার জন্মদিন।

একুশ বছরের যুবক অরুণ হঠাৎ অনেক বড়ো হয়ে গেল। অনেক বড়ো।

ওদের দূর থেকে দেখে একটা ফুলওয়ালা কাছে এগিয়ে আসছিল, অরুণ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

ঠিক সেদিনের মতই মিষ্টি গন্ধ জুঁই ফুলের মালায়। রুণুর চুলের মত মিষ্টি গন্ধ, রুণুর চোখের তারার পাশের সাদা অংশটার মত সাদা।

একটা মালা কিনলো অরুণ, রুণুব খোঁপায় জড়িয়ে দিলো।

রুণু ভীষণ খুশী হলো, ওর মুখ জুঁই ফুলের মত ফুটে উঠলো। তারপর মালাটার একটা প্রান্ত তুলে নাকের সামনে এনে ঘ্রাণ নিলো রুণু। ধীরে ধীরে বললে, অয়ন আমাকে এমনি একটা মালা দিয়েছিল।

ব্যস্, অরুণের মনের সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে মুছে গেল।

অয়ন, অয়ন, অয়ন।

অরুণের মনে হলো আমি কেন অয়ন হতে পারলাম না। 'অয়ন এমনি একটা মালা দিয়েছিল আমাকে।' তা হলে অণুক্ষণ রুণুর মনের মধ্যে অয়ন বেঁচে আছে? শুধু তুচ্ছ কোন ভুল বোঝাবুঝির ফলে দু'জনে দূরে সরে গেছে বলেই রুণুর বুকের মধ্যে কোন ব্যথা গুমরে মরে? তা হ'লে তো ও অয়নকেই খুঁজছে, অরুণের মধ্যেও অয়নকে।

পাড়ার আনন্দদার পাঁচ বছরের ছেলেটা গ্রামে গিয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। ওই একটাই ছেলে, আনন্দদার বউ কেঁদে কেঁদে কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। খেতো না, ঘুমোতো না, কেঁদে কেঁদে চোখে ভাল দেখতেও পেতো না। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকতো, তিনটে প্রশ্নের একটা কানে যেতো। শেষে আনন্দদার বউ, সকলে বলতো, একটা এত্ত বড় ডল পুতুলকে শার্ট প্যান্ট পরিয়ে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমোতো।

তা হ'লে রুণু কি আমাকে ভালবাসে না? আমি শুধু একটা ডল পুতুল? হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে, কিংবা রুণুর যেদিন মনে

হবে আমি ঠিক অয়নের মত নই, সেদিন আবার ও অন্য একটা ডল পুতুলকে বুকের কাছে আসতে দেবে ?

—এই ! মামীমাকে তোমার কথা বলেছি। রুণু হঠাৎ বললে।

অরুণ আঁতকে উঠলো।—সে কি! যেন ভয়টা অরুণের। তার-পর জিজ্ঞেস করলো, কি বলেছো ?

রুণু হাসলো।—তুমি কি পাগল নাকি, আমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি কিচ্ছু নেই ? বলেছি, আলাপ হয়েছে, বন্ধু।

তারপর একটু থেমে বললে, মামীমা খুব হাসছিলেন। আমি রেগে গিয়ে মামীমার সঙ্গে কথাই বলি নি।

আরেকটু থেমে অরুণের মুখের দিকে কৌতুকের চোখে তাকিয়ে রুণু বললে, মামীমা বলেছিলেন, একদিন বন্ধুটিকে নিয়ে এসো।

বলে ঝর্ণা হয়ে হেসে উঠলো রুণু। শেষ বিকেলের আলোয় রুণুকে বড় সুন্দর দেখালো। ও হাসলে ওকে রুপোলী ঝর্ণার মত মনে হয়।

রোদ পড়ে আসছে তখন। আর একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। রুণু ঘড়ি দেখলো।

—সময় ফুরিয়ে গেছে ? অরুণ অতৃপ্তিতে বিষণ্ণ হয়ে গেল।

রুণু হেসে উঠলো।—সব কি ফুরিয়ে যাচ্ছে ? আবার তো আসবো।

অরুণ বললে, আজ, লক্ষ্মীটি, আজ অন্তত আরেকটু বসো। আজ তোমার জন্মদিন।

রুণু দূরে কোথাও চোখ ফেলে উঠে দাঁড়ালো।—না না, আমার ভয় করছে।

—ভয় ? হেসে উঠলো অরুণ।—কিসের ভয় ?

রুণু লাজুক চোখ নামিয়ে বললে, কাগজে দ্যাখো নি ?

কি আশ্চর্য, অরুণ ভুলেই গিয়েছিল। ঝপ্ করে ততক্ষণে হঠাৎ আবছা অন্ধকার নেমেছে। ওর নিজেরও ভয়-ভয় করলো। দূরে

একটা পুলিস কনেস্টবল নির্জনে বসা মধ্যবয়স্ক লোকটিকে কি বলছে, একটু দূরেই স্থূলাঙ্গী এক ভদ্রমহিলা।

মধ্যবয়স্ক লোকটি পকেটে হাত দিলো।

আজ রুণুর জন্মদিন। আজ ওরা স্নিগ্ধ সন্ধ্যার বাতাসে কবিতা হয়ে যেতে চাইছিল। নির্জন হতে চাইছিল। কিন্তু নির্জনতা নেই, কোথাও নেই।

একটু দূরে জন পাঁচেক ইতর প্রাণী মদের বোতল নিয়ে বসেছে। তারা বোধ হয় রুণুকে শুনিয়ে শুনিয়েই কিছু কুৎসিত আবর্জনা ছুঁড়লো। পুলিস কনেস্টবলটা তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে, তাদের কথা বোধ হয় তার কানেও গেল না। কিংবা আগেই বোধ হয় তার মুখবন্ধ করে রেখেছে ওরা।

আজ অনেক কথা ভেবে রেখেছিল অরুণ। অনেক কথা গুছিয়ে বলবে ভেবেছিল। কিছুই বলা হলো না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অরুণের হাতটা ধরলো রুণু, আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়িয়ে ও একবার অরুণের অতৃপ্ত বেদনার মুখখানা দেখলো। মৃদু ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়লো রুণুর চোখেমুখে। গাঢ় গলায় বললে, তুমি অনেক কিছু চেয়ো না, আমাদের এইটুকুই ভাল, এইটুকুই।

অরুণের দিকে আরেকবার তাকিয়ে খোঁপা থেকে জুঁই ফুলের মালাটা খুলে আরেকবার ঘ্রাণ নিলো রুণু।

আমি কি একটা মানুষ? টুকরো টুকরো যত সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি, একটু একটু দুঃখ নিতে চাইছি না। আমি কি একটা মানুষ? অরুণ ভাবলো।

—ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই প্রকাশ, ওরা অন্য জাত। বড়মামা একদিন অরুণকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাবাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি শরীর খারাপ হলেও একদিন ট্যাক্সিতে আপিস যাও না। বলো, যখন পারবো তখন রোজ ট্যাক্সি করে যাবো। আর এরা? পকেটে টাকা থাকলেই ঝট্ করে উঠে পড়ে, পরের দিন বাসের ভাড়াটাও থাকবে না জেনেও।

সত্যি তাই। সেবার পুরী গিয়েছিল সকলে, বাবা কিছুতেই হোটেলে উঠলো না। অথচ অরুণ আর মিলু বলেছিল, ক'টা তো দিন, কোথায় ফুর্তিতে থাকবো, তা না, বেড়াতে এসেও মা রান্নাঘরে, বাবা বাজার করছে।

বাবাকে অরুণ কিছুতেই বুঝতে পারে না। ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে বাবা কোনদিন বর্তমানকে উপভোগ করতে পারলো না। বড়মামাও তো বাবার মতই; বলেছিলেন, প্রকাশ, তোমরা চাও উপভোগ করতে। দোতলায় ওঠবার মত অবস্থা না হলে দোতলায় উঠতে চাও না। ওরা চায় ভোগ করতে। পুজোর বোনাস পেলে একালের ছোকরারা কি ভাবে জানো? দু'দিন অশোকা হোটেলে থাকবো।

যেন সেটা খুব দোষের। অরুণ কাকে আর বলবে? টিকলুকে বলেছিল, আমাদের কি ভবিষ্যৎ আছে নাকি? শান্তিতে কেউ কিছু উপভোগ করতে দেবে নাকি? কিছুই যখন পাবো না, একটু একটু করে ভোগ করে নিই। তবু জানবো কিছু পেয়েছি।

আরে, বাচ্চা তো আঁতুর ঘরেও হয়। আমরা হয়েছি, অরুণ ভাবলো। কিন্তু দিদির ননদ তার ফুটফুটে ছেলেটাকে দেখাতে এনে বার বার বললে, প্রেসিডেন্সি নার্সিং হোমে হয়েছে। যেন ব্যথা ওঠে না ওখানে গেলে। নিজের মনেই হেসে ফেললো অরুণ। আচ্ছা, সত্যি খুব কষ্ট হয় ওদের? কি রকম? ইংরিজীতে কথায় কথায় তো বার্থ্ প্যাংস্ ব্যবহার করে, অথচ কেউ জানেই না জিনিসটা কি।

মা যে কষ্ট পাচ্ছে, এই অসহ্য যন্ত্রণা, এও তো অরুণ বুঝতে পারছে না। শুধু মুখ দেখে বুঝতে পারে কষ্ট হচ্ছে। এক এক সময় ওর নিজেরও অসহ্য লাগে। আসলে ও মাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, না মা'র কষ্টটাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে? ও জানে না।

চিঠি পেয়ে দিদি এসে গেছে, খুব সেবা করছে। সত্যি, দিদি না থাকলে বাবাও অসুখে পড়তো। অবশ্য বাবা অসুখে পড়বেই। রাতে ঘুমোতে পারে না। অরুণ যখনই উঠেছে, দেখেছে বাবা চুপচাপ মা'র মাথার কাছে বসে পাখার হাওয়া করছে। সব ঝক্কি তো বাবাই পোয়াচ্ছে।

এদিকে, অসুখ মানেই তো একটা মচ্ছব। আত্মীয়স্বজনে ঘর ভর্তি, এ আসছে ও যাচ্ছে—চা খাওয়াও, রিক্‌শা ডেকে দাও, রাঙাপিসীর ছেলেমেয়েরা এসেছে লিলুয়া থেকে, জলখাবারের ব্যবস্থা করো।

আর সকলের কাছে অরুণের লজ্জা, হাসপাতালে দিচ্ছিস না কেন, অপারেশন করাচ্ছিস না কেন? যেন ওর কথাতেই সব হবে।

বাবা কিন্তু গোঁ ধরে বসে আছে, অপারেশন করিয়ে আমাদের কি লাভ, ডাক্তাররা হাত পাকাবে।

বাবাকে এক এক সময় খুব নৃশংস মনে হয়। কিংবা কৃপণ। এক-একবার সন্দেহ হয় মাকে বাবা হয়তো একটুও ভালবাসতো না।

ওর ইচ্ছে হয়, খুব বড় বড় ডাক্তার দেখানো হোক, অপারেশন করানো হোক হাসপাতালে রেখে। বাঁচানো বা কষ্ট কমানোর

চেয়ে বড় কথা, কেউ যেন না বলতে পারে, ওরা কিচ্ছু করে নি।

সুজিত তো সেদিন চমকে উঠে বলেছিল, সে কি রে, অপারেশন করাস নি ?

যেন মাকে ও খুন করছে। তাই যত রাগ ওর বাবার ওপর।

—অরুণ।

রাগারাগি করে অরুণ বেরিয়ে এসেছিল, সকাল থেকে মা'র ঘরে যায় নি। বাবার ডাক শুনে প্রথমটা সাড়া দিলো না। তারপর কি মনে হলো নিজেই গিয়ে বাবার কাছে দাঁড়ালো।

বাবা চোখ তুলে তাকালো। বললে, শোন্।

বাবার চোখের দৃষ্টি পাথর।

বাবা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ধীরে ধীরে বললে, ক্যান্সার। ব্রেণে।

অরুণের মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো, সমস্ত শরীর শক্তিহীন অবশ মনে হলো। সুজিতের ওপর ওর মাঝে মাঝে রাগ হয়, দিনরাত কেবল হাতের রেখা দেখছে, কিংবা কুষ্ঠীর ছক কাটছে। অরুণের মনে হলো ও সুজিত হয়ে গেছে, অদৃষ্টের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে।

বাবা আবার ফিসফিস করে বললে, কষ্ট বাড়িয়ে কি লাভ বল্। ওকে শান্তিতে মরতে দে।

বাবা তাই বার বার সেদিন ডাক্তারকে বলেছিল, আর কিছু না, ওর কষ্ট কমিয়ে দিন।

শান্তিতে মরতে দে মানে শান্তিতে তাড়াতাড়ি মরতে দে।

অরুণ মা'র বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। ওষুধ খেয়ে আচ্ছন্ন মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো মৃত্যুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অবধারিত মৃত্যুর দিকে।

বাবা আবার বিলিতী মেডিকেল জার্নালগুলোর পাতা ওল্টাচ্ছে।

নিজের ঘরে এসে বসতেই দিদি এসে দাঁড়ালো।—মাকে তোরা মেরে ফেলেছিস।

অসহ্য একটা কষ্ট হলো, কথা বলতে না পাওয়ার কষ্ট। অরুণ এই প্রথম বুঝতে পারলো, বাবা কি যন্ত্রণার মধ্যে দিনগুলো কাটিয়েছে। ওর আবার মনে পড়লো, মানুষ কথা বলতে পারে না।

সকলে ভুল বুঝছে বাবাকে। অথচ বাবা দিনের পর দিন কেবল মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। কিংবা প্রার্থনা করছে, অরুণের মতই, যাতে মা'র তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়। বাবা দিদিকে বলতে পারছে না, মিলুকে বলতে পারছে না। আমাকে বলতে পারে নি, পাছে কষ্ট হয়।

বাবা কাউকে কষ্ট দিতে চায় না, সব কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে পুষে রাখতে চায়। অরুণ মাকে কষ্ট দিতে চায় না, তাই মা'র দ্রুত মৃত্যু চায়।

পাড়ার ননীবাবুর বাবার হয়েছিল। অপারেশন করে 'রে' দিয়ে শুধু লোকটাকে ছ'মাস ধরে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল। তার পর সেই মৃত্যু।

বাঁচবে না, বাঁচবে না। যে ক'দিন বাঁচবে কষ্ট পাবে, হয়তো বা জড়পদার্থের মত পড়ে থাকবে।

অরুণের একবার মনে হলো মা'র মৃত্যু, মা'র কষ্ট—এসব কিছুই নয়। বড়মামা বলবে, চিকিৎসা না করে তোরা মেরে ফেললি। ছোটমাসী বলবে, অপারেশন করিয়ে দেখলে তো পারতিস। টিকলু বলবে, বাঁচতেও তো পারতো। ঊর্মি আর সুজিত বলাবলি করবে, খরচের ভয়ে কিচ্ছু করায় নি।

দিদির ননদ কেন নার্সিং হোমে গিয়েছিল এখন যেন বুঝতে পারছে অরুণ। মারা গেলে কেউ কাউকে দোষ দিতো না। বলতো, নার্সিং হোমে তো গিয়েছিল।

এতকাল ও ভাবতো নার্সিং হোম আসলে স্নবারি। সাধারণের মত আঁতুরে কিংবা হাসপাতালে যায় নি, তারই বিজ্ঞাপন। এখন মনে হচ্ছে দায়িত্বস্খালন। বড় ডাক্তার দেখানোও বোধ হয়

সেজন্যেই। কেউ কোন অপবাদ দেবে না, বাঃ, বড় ডাক্তার তো দেখিয়েছিলাম।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অরুণের মনে হলো, মা তুচ্ছ হয়ে গেছে, মা'র অসুখ তুচ্ছ। আসলে বাড়িটা এখন রথের মেলা। লোক আসছে যাচ্ছে, গল্প করছে হাসছে। সময় মত চা না পেলে চটে যাচ্ছে।

লোকে কি বলবে সেটাই বড়। অরুণের মনে হলো ও বিরাট একটা কিছু করে ফেলুক। খুব বড় বড় ডাক্তার আসুক। হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন হোক। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস টাকা খরচ করে ওরা নিঃস্ব হয়ে যাক। ছোটাছুটি করে ওরা সকলে অসুখে পড়ুক। মা'র কষ্টটা কিছু নয়। মা'র মৃত্যু কিছু নয়। সকলে বলবে, বেচারী ভীষণ কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু ওদের যত্নে ত্রুটি ছিল না।

দিদির ননদের মত গর্ব করে বলতে পারবে, ডাক্তার স্বোয়ামী অপারেশন করেছিলেন, ডাক্তার স্বোয়ামী!

—দাদা! কে একটা ছেলে তোকে ডাকছে রে; বেশ দেখতে ছেলেটা!

মিলু এসে বললে।

দরজার কাছে যেতেই বছর পনেরোর একটা সুদৃশ্য ছেলে ছু'হাত জোড় করে নমস্কার করলে। তারপর একটা চিরকুট বের করে দিলো।

চিরকুটে ছোট্ট করে লেখা 'জরুরী দরকার, এক্ষুনি চলে আয়।' নীচে কেউ সই করে নি, তবু বুঝতে অসুবিধে হলো না।

—কোথায়? অরুণ জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটার পিছনে পিছনে এসে রাস্তার মোড়ে দেখলে ট্যাক্সিতে ঊর্মি বসে আছে।

ঊর্মি গম্ভীর। শুধু পরিচয় দেয়ার জন্যে বললে, আমার ভাই।

তারপর বললে, ভাইটি, তুমি ট্রামে চলে যাও। অরুণকে বললে, উঠে আয়।

উর্মিকে অনেকদিন দেখে নি অরুণ। ওর কেমন মনে হয়েছিল উর্মি ওদের এড়িয়ে চলছে আজকাল। দু'দিন ফোন করেছিল। একদিন উর্মি কি একটা অজুহাত দেখিয়েছিল। আরেকদিন কফি হাউসে যাবে বলেও যায় নি।

অরুণের সেজন্যে মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগতো। রুণুর সঙ্গে দেখা করতে না পাওয়ার মত তীব্র জ্বালা নয়। কেমন একটা অভাব-অভাব।

টিকলুর কাছে, সুজিতের কাছে বুকের আবেগ চেপে রাখতে হয়। অনেক কথা বলা যায় না। রুণু অয়নকে ভালবাসতো এ-কথা ওদের বলাই যায় না। উর্মিকে বলা যায়। উর্মি বোঝে। উর্মির কাছে তার জন্যে রুণুর দাম একটুও কমে যায় না।

কিন্তু উর্মিকে দেখে ওর মনে হলো কি যেন হয়েছে ওর। সাংঘাতিক কোন অসুখ।

—তোর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে উর্মি।

উর্মি কোন উত্তর দিলো না।

অরুণের হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়ে গেল। বললে, মা'র ভীষণ অসুখ রে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

উর্মি এবারও কোন কথা বললো না।

উর্মির মুখে সেই হাসি নেই, ওর শরীরে সেই উচ্ছল সৌন্দর্য নেই। ওর কথা জাদু হারিয়েছে।

—তুই অ্যাদ্দিন ডুব মেরেছিলি কেন? কি হয়েছিল?

উর্মি কোন উত্তর দিলো না। ও কি যেন ভাবছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওর মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে।

চলন্ত ট্যাক্সিটা ভিড়ের রাস্তা দিয়ে যেতে শুরু করেছে দেখেই অরুণের ভয় হলো। ছোটমাসীকে নয়, বড়মামাকে নয়। রুণুকে।

রুণু যদি দেখতে পায় কি ভাববে সে। নির্ঘাত ভাববে অরুণ একটা লম্পট। উর্মির সঙ্গে তার প্রেম, রুণুর সঙ্গে খেলা করছে। অথচ উর্মিকে এ-সময় বলা যায় না, আমি নেমে পড়বো।

ভিড়ের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল অরুণ, কোথাও রুণু আছে কিনা। রুণু দেখছে কিনা।

অরুণ হঠাৎ ফিরে তাকালো উর্মির দিকে। দেখলে ট্যাক্সির জানলায় হাত রেখে, হাতের ওপর মাথা, উর্মির মুখ চাপা কান্নায় থমথম করছে।

কয়েকদিন অবিরাম বৃষ্টির পর, আজ অসহ্য রোদ্দুর। না, গতকালও বৃষ্টি হয় নি। তবু মেঘ মেঘ ঠাণ্ডা একটা আমেজ ছিল। এখন দুপুরের রুটি-সেঁকা রোদ্দুর। চতুর্দিক নির্জন, নির্জন···কিন্তু অরুণের বড় নিঃসঙ্গ লাগছিল। এখন রুণু সঙ্গে থাকলে এই দুপুরই নির্জনতা। গাছের ছায়া এই প্রচণ্ড রোদ্দুর মুছে দিতো। ঊর্মির সঙ্গ কখনো কখনো রুণুর অভাব মুছে দিয়েছে। একদিন টিকলুদের প্রেসে বসে টেলিফোন বেজে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করে বিস্বাদ হতাশ মন নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, একা একা রাস্তায় ঘুরেছিল, কেমন একটা শূন্যতা বুকে নিয়ে ছায়া খুঁজেছিল, রাস্তায় বাসে-ট্রামে ছুটন্ত গাড়ির জানলায় সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত হতে চেয়েছিল, তারপর অনেককাল আগে চেনা একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ঈষা, কথার ফাঁস ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে টেনে রাখতে চেয়েছিল অরুণ, পারে নি। কিন্তু রুণুর জন্যে ব্যথাটা অনেক কমে গিয়েছিল তখন। তখন অরুণ একা, তবু নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় নি।

আজ ঊর্মি সঙ্গে রয়েছে, তবু কেউ যেন সঙ্গী নয়। কারণ ঊর্মির মন আজ অনেক দূরে চলে গেছে। পাশে পাশে দু'একবার ছোঁয়া লাগছে। তবু যেন ঊর্মি কাছে নেই। কি ভাবছে কে জানে। কি ব্যথা বোঝা যায় না।

একটা চীনেবাদামওয়ালা—নোংরা-ঘাগরা টান-কাঁচুলির মেয়েটার সঙ্গে রসিকতা করছে। আইসক্রীমওয়ালা একজন গাছের ছায়ায় আইসক্রীমের গাড়িটার ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘূর্ণি-গ্যেট ঘুরিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরে ঢুকলো ঊর্মি আর অরুণ।

আমাকে বোধ হয় একটুও বিশ্বাস করে না রুণু। অরুণ ভাবলো। দোষ কি ওর, টিকলু আর সুজিতই বিশ্বাস করে না। ওরাও একটু একটু সন্দেহ করে, কখনো মুচকি মুচকি হাসে। 'বন্ধু তো আমাদেরও। তবু উর্মির মুখে এক কথা—অরুণটা এলে বেশ জমতো। কেন বাবা, আমরা কি কেউ নই।'

মনে পড়তেই উর্মিকে ভীষণ ভাল লাগলো অরুণের, আপন মনে হলো। শুধু আশঙ্কা, রুণু যদি দেখতে পায়। রুণু যদি ভুল বোঝে। আরে সে তো স্বাভাবিক। উর্মির হাসি, কথা, উর্মির ব্যবহারই তো সন্দেহ জাগিয়ে দেয়। সুজিত টিকলু কিংবা কলেজের অন্য ছেলেদের সামনে সেটা ভালই লাগতো। অরুণ বেশ মজা পেতো। কিন্তু রুণু কেন ভুল বুঝবে? তা হ'লে আর ভালবাসা কিসের? কি জানি, রুণু হয়তো ভালই বাসে না। আচ্ছা, এখন এখানে ঐ রেস্তোরাঁর মধ্যে যদি রুণু থাকে, রুণু আর একটি ইয়াং ছেলে, সুন্দর চেহারা, কিংবা অয়ন? অরুণ মরে যাবে, মরে যাবে। কিছু কষ্ট হয় না, নিজে জানতেও পারবো না, অথচ মরে যাবো, এমন কোন উপায় নেই? বাঃ, রুণু যদি আঘাত দেয়, রুণু যদি ঠকায়, ওর যত খুশী ও আমার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে ভারতনাট্যম নাচুক না, আমি বোকার মত মরে গিয়ে লোক হাসাবো কেন! আমি খারাপ হয়ে যাবো, একদম খারাপ হয়ে যাবো। সেও তো এক ধরনের মৃত্যু।

রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি এসে বসলো দু'জনে।

অরুণ বললে, এবার বল্।

তাকিয়ে দেখলো উর্মির মুখ পাথর, নিঃশব্দ। তাকিয়ে দেখলো উর্মির চোখ কাচের মার্বেলের মত—ঘোলাটে। ঠিক এমনি চোখ অরুণ আরেক বার দেখেছিল। নন্দিনীর। নন্দিনী যেদিন বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। নন্দিনীর প্রেম যেদিন ভয়, দুশ্চিন্তা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঘা খেয়ে খেয়ে মরে গিয়েছিল।

উর্মির এই থমথমে মুখের আড়ালে কি আছে অরুণ কিছুতেই

খুঁজে পাচ্ছিল না। উর্মির কোন দুঃখ থাকতে পারে, কখনো ভাবে নি।

সব মেয়েরাই মুখে স্নো-পাউডার মাখে, উর্মির মুখে এতকাল আরেকটা বাড়তি জিনিস দেখে এসেছে—উর্মির হাসি। ওর মুখে হাসি, ওর চোখে হাসি। তাই উর্মি যখন যেখানে থাকে সে-জায়গাটা পলকের মধ্যে বেল ফুলের ঝাড় হয়ে পুট পুট করে গাছ ভর্তি কুঁড়ি ফোটায়। সুখ-সুখ সুগন্ধে চারপাশ ভরে ওঠে।

'আসল ফুর্তি তো টাকায়। অমন একটা দাদা পেলে আমার মুখেও মার্কারি ল্যাম্পের আলো জ্বলতো।' টিকলু একদিন বলেছিল।

কথা মিথ্যে নয়। উর্মির দাদা গাভমেন্টের একটা প্রচণ্ড অফিসার, এটুকুই জানতো। যেদিন ওদের তিন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল উর্মি, অরুণ তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। চোখ ঝলসে গিয়েছিল সুজিতের। আর টিকলু যে অমন স্মার্ট ছেলে, সেও কেমন বোকা বোকা কথা বলেছিল। ওর দাদা-বৌদি ভদ্রভাবে কথা বলেও ওদের কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল। ও একটা চাপা গলার চাপা হাসি শুনেছিল উর্মির বৌদির, দরজার ওপারে। সে হাসিটা যেন ঠোঁট উল্টে বলেছিল, কি সব বন্ধু!

'জানিস অরুণ, বাড়িটা আমার কাছে একটা জেলখানা, অসহ্য লাগে আমার', উর্মি বলেছিল একদিন। 'লোকে বিরাট বাড়িটাই দেখে, সামনে লন, কিন্তু আমার নিজের বলতে শুধু এই ছোট্ট ঘরখানা। ঘরের বাইরে, ঘরের ভেতর সব জায়গায় ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। আমার যেন রুচি নেই, ভালমন্দ বিচার নেই, আমার নিজের পছন্দ অপছন্দ কিছু নেই।'

—কিন্তু, তুই তো ফ্রী। আমাদের চেয়েও ফ্রী। অরুণ বলেছিল।

উর্মির মুখের হাসিটায় ব্যথার ছাপ পড়েছিল, নিজেকে নিজেই

ঠাট্টা করে বলেছিল, ফ্রী? ঠিকই তো, সেজন্যে তোদের আর কোনদিন এ বাড়িতে ডাকবো না।

অরুণ হয়তো একটু বুঝতে পেরেছিল, হয়তো সবটা বুঝতে পারে নি। তাই চুপ করে গিয়েছিল।

কিন্তু ঊর্মি তো চুপ করে থাকার মত মেয়ে নয়। ও বলেছিল, জানিস অরুণ, একদিন দাদার অফিসে গিয়েছিলাম। এত মাইনে পায়, এত বড় অফিসার, অথচ সেখানে গিয়ে দেখলাম ওর মত কিংবা ওর চেয়েও বড় আরো কত রয়েছে। দেখলাম, সেই ছোট্ট একখানা ঘর। প্রকাণ্ড অফিস বিলডিংটার মধ্যে দাদা একেবারেই তুচ্ছ।

অরুণ হেসে উঠেছিল।—তাতে কি, সকলেই তো তাই।

ঊর্মি হাসে নি। 'ওরা জানে ওরা কত তুচ্ছ, তাই ওরা বড় বড় ফ্ল্যাট চায়, ঘর সাজায়, মেপে মেপে চলে। নিজেকে জাহির করে। এক জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না বলেই আরেক জায়গায় নিজেকে জাহির করতে চায়।'

অরুণ চুপ করে গিয়েছিল।

ঊর্মি হঠাৎ বলেছিল, তোদের যে কোন পরিচয় নেই, তাই তোরা ওদের কাছে তুচ্ছ। জানে না, যে যতই বড় হোক, সকলেরই সেই একখানা ছোট্ট ঘর।

অরুণ বলেছিল, তোর ওপর তো আমাদের কোন রাগ হয় নি ঊর্মি। ওঁদের দোষ কি, আমরাই ওঁদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি না।

ঊর্মি খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল, আমার ওপর আমার নিজেরই রাগ হয়।—আমি নাকি ফ্রী, কিন্তু এ যে কি যন্ত্রণা তুই জানিস না।

অরুণ বুঝতে পারে নি, অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ঊর্মির মুখের দিকে।

আর ঊর্মি ধীরে ধীরে বলেছিল, কলেজের মেয়েগুলো ব্যবহারে

দেখায় কত মডার্ন, এদিকে বাড়িতে বিয়ের চেষ্টা চলে, মেয়ে দেখতে এলে চটাচটিও করে, তারপর খুশিখুশি মুখে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। অথচ আমার সমস্যা ভাব তো, বৌদি ঠাট্টা করে বলে, 'ধানবাদ কদ্দুর উর্মি', দাদা একদিন বললে, 'অন্তত এক মাসের নোটিশ দিবি আমাকে।' অথচ যাকে নিয়ে ওরা এত নিশ্চিন্ত, সেই মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের মন বোঝা দায়।

অরুণ কোন কথা বলে নি।

উর্মির গলা গাঢ় হয়ে এসেছিল।—দাদা-বৌদি, আত্মীয়স্বজন সবাই জানে, সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, অথচ বল তুই, তাকে কি ভাবে ধরে রাখবো আমি নিজেই জানি না, নিজেই নিশ্চিন্ত নই।

এদিকে ছাখো, উর্মি সম্পর্কে অরুণ কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল।

সেদিনের কথাগুলো মনে পড়তেই উর্মির সেই অসহায় মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

কিন্তু উর্মিকে যেন আজ আরো অসহায় মনে হচ্ছে। মৃতের মুখের মত।

হাল্কা কথায় উর্মিকে হাসাবার চেষ্টা করলো অরুণ।—তোর ভাইয়ের হাতে S. O. S. পেয়ে আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

উর্মির মুখে সেই চেনা হাসিটা আসবো আসবো করে বিষণ্ণতায় মরে গেল।

অরুণ চুপ করে রইলো, উর্মি চুপ করে রইলো।

তারপর হঠাৎ এক ঝলক হাসি উর্মির মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে সেটা ছ'চোখের পাতায় বৃষ্টি হয়ে গেল। দূর থেকে রেস্তোরাঁর বয় বিস্ময়ের চোখে উর্মির দিকে তাকিয়েছে। অরুণের বড় অস্বস্তি লাগলো। ছপুরের রেস্তোরাঁয় আর কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হলো।

উর্মির ছ'চোখে জল টলটল করছে। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারছে না।

গলার স্বরে চাপা কান্নার গাঢ়তা ফুটিয়ে উর্মি হঠাৎ বলে উঠলো,

অরুণ, তোর কাছে আমার লজ্জা নেই, তোর কাছেই আমার কোন লজ্জা নেই। আমি—আমি বিপদে পড়েছি অরুণ।

—বিপদে? অরুণের মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো।—কি বলছিস উর্মি?

পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। তারপর ভেঙে পড়া অবসন্ন গলায় বললে, তুই এত বোকা উর্মি? তুই এত বোকা?

উর্মি এখন আর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। অরুণ এখন আর উর্মির মুখের দিকে চোখ তুলতে পারছে না।

অরুণ প্রগাঢ় লজ্জায় মাথা নীচু করে খুব ধীর স্বরে বললে, এস কে এম?

—ছি ছি, কি বলছিস অরুণ? উর্মি বলে উঠলো।

অরুণ মিথ্যে সন্দেহ করার জন্যে অপ্রতিভ বোধ করলো।—তুই বলতিস মাইনিং এঞ্জিনিয়ার খুব ভালো, ওর মত কেউ নয়, তুই বিশ্বাস করতিস।

উর্মি ম্লান বিষণ্ণ হাসি হাসলো, তবু চোখ তুললো না। চায়ের কাপে অকারণ চামচ নাড়লো। বললে, তুই জানিস না অরুণ। ভয় শুধু নিজেকে, নিজেকে বিশ্বাস করা যায় না।

অরুণ প্রশ্ন করলো,

উর্মির হাসিটা হিস্টিরিয়ার হাসি হয়ে গেল।—কি বলছিস তুই? যে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে···আমার কি একটু আত্মমর্যাদাও নেই?···আমি, না না, আমি ওকে একটুও দোষ দিই না। দোষ তো আমার, আমার।

চমকে চোখ তুলে উর্মির মুখের দিকে তাকালো অরুণ। আরে, আরে, এ তো মুক্তোর মত মেয়ে। নিজের মধ্যে এক কণা বালি নিয়ে মুক্তো হয়ে গেছে। কিন্তু এখন···

অরুণ প্রশ্ন করলে,

উর্মি তার জলে ভাসা দুটো চোখ তুলে বললে,

একটুক্ষণ চুপচাপ।

অরুণ বললে, কি জানি···

টিকলুর কথাটা মনে পড়লো। 'চঞ্চলকে মনে আছে অরুণ? চঞ্চল রুদ্র? চঞ্চলদা বলতাম। খুব টাকা পিটছে, দেখা হলো সেদিন।'

উর্মি হঠাৎ বললে, তুই আছিস, শুধু এইটুকু জানি। আমি আর কিচ্ছু জানি না, আমি আর কিচ্ছু জানি না।

অরুণ হাত বাড়িয়ে উর্মির হাতের ওপর হাত রাখলো। মুঠো করে ধরলো। বললে, আছি। আমি আছি।

তারপর প্রশ্ন করলে,

উর্মি মাথা নাড়লো, বললে,

তারপর ব্যাগ থেকে, সাদা ঢাউস ব্যাগটা খুলে একটা কাগজে মোড়া কি যেন দিলো।

অরুণ শুধু অনুভবে বুঝলো। খুলে দেখলো না। নিঃশব্দে সেটা পকেটে রেখে দিলো।

উর্মি যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

অরুণ বললে, জানি না, তবু···

টিকলুর রুণুকে নিয়ে ঠাট্টাটা মনে পড়লো। 'দরকার হলে বলিস।' কিন্তু টিকলুর কথা উর্মিকে বলা যাবে না। টিকলুকে উর্মির কথা বলা যাবে না। ও নিশ্চয় ভাব দেখাবে যেন যুদ্ধজয় করেছে। বলবে—আমি বলেছিলাম, আমি আগেই বলেছিলাম।

অরুণ বললে,

উর্মি উত্তর দিলো,

অরুণ বললে,

উর্মি বললে,

উর্মি যেন সেসনস্ কোর্টে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দিনের সওয়াল-জেরার

পর শেষ বিচারের রায় শুনবে। উর্মি উৎসুক দুটি চোখ তুলে তাকালো অরুণের মুখের দিকে।

অরুণ সান্ত্বনার কণ্ঠে বললে, আছি, আমি আছি।

সঙ্গে সঙ্গে উর্মির দু' চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। জলে ভাসা দুটো চোখের মধ্যে দিয়ে হেসে উঠলো।—জানতাম অরুণ, আমি জানতাম।

কিন্তু অরুণের মনে তখন দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে, অরুণের মুখ ম্লান। উর্মির তখনো উৎকণ্ঠা, উর্মির মুখ ম্লান। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, ওপরে সর পড়া, দু' কাপ চা পড়ে আছে। কেউ ছোঁয় নি। ঠিক ঐ ঠাণ্ডা সর পড়া চায়ের মত ম্লান মুখ দু'জনের।

একা একা বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক কথা, অনেক দুশ্চিন্তা ওর মনের মধ্যে ঘুরলো। আচ্ছন্নের মত মনে হলো নিজেকে। আবার এক এক সময় নিজেকে অনেক দামী মনে হলো। মাথাটা যেন সকলকে ছাড়িয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চূড়ার পরীটার মত অনেক উচুতে উঠে গেছে।

ধীরে ধীরে লুকিয়ে মোড়কটা বের করলো অরুণ। খুলে দেখলো, রেখে দিলো। ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মত প্যাটার্ন। অরুণের হঠাৎ নিজেকে রুদ্রাক্ষের মত বিশুদ্ধ লাগলো।

নন্দিনীর বিয়ের নোটিশ দেয়ার কথায় টিকলু বলেছিল, ও-ও শালা টাকা।

সর্বত্র টাকা।

কিন্তু অরুণ কি কোন অন্যায় করছে? তা হ'লে মনের মধ্যে খিচখিচ করছে কেন?

পুরোনো সংস্কার, প্রাচীন বিবেক, বিগত দিনের বিশ্বাস তা হ'লে কি এখনো অরুণের রক্তের মধ্যে খেলা করছে? সব কিছু তুচ্ছ করতে গিয়েও নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না? নতুন বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে চাইছে, বুকের বিশ্বাসকে রাজী করাতে

পারছে না। আমরা তাই দোটানার মধ্যে জ্বলছি, যন্ত্রণা ভোগ করছি।

অরুণের মনে হলো, এ দেশে যৌবন একটা পাপ। তা যেন ভিন্ন গ্রহ থেকে ফ্লাইং সসারে চড়ে হঠাৎ এসে নেমে পড়েছে। তাই সকলে ভাবে, পাপ বিদেয় হলে বাঁচি।

টিকলু বলেছিল, কোথাও কিচ্ছু নেই রে, শুধু একটাই জিনিস আছে—টাকা।

পরক্ষণেই অরুণের মনে হলো, ভাগ্যিস টাকার এমন অদ্ভুত শক্তি ছিল। তা না হ'লে আজ অরুণের মত অসহায় আর কেউ থাকতো না। তা না হ'লে উর্মি আজ লাশকাটা ঘরে ফালা ফালা করে কাটা নেকেড অ্যাণ্ড দি ডেড। একটা ডেড বডি।

আছি কি জানি এস কে এম নয় ছি ছি মাইনিং এঞ্জিনিয়ার আমার দোষ চঞ্চলদা কি বিচ্ছিরি সন্দেহ টাকা অনেক টাকা বিশ্বাস নেই হ্যাঁ গাইনোকোলজিস্ট সুন্দর প্রেম পারবে না মরে যাবো না তো দেখি খোঁজ করি জানি না আছি অসম্ভব যে এড়িয়ে যায় দাদা-বৌদি আমি নেই অসম্ভব মরে গেছে প্রেম মরে গেছে একদিন একটা দিন কি দুটো দিন ছি ছি চিনেছি ছোট ছোট মুহূর্ত চেনা যায় অসম্ভব সে তখন এগিয়ে এলেও ছোট ছোট মুহূর্ত দিয়েই প্রেম মরে গেছে চিনেছি বাড়ি বলে দেবো না না কোন সমস্যা নয় বাঁচবো বেঁচে উঠবো মুছে দিয়ে নতুন প্রেম কোনটাই শেষ নয় কোথাও শেষ নেই অরুণ, মরে যাবো না তো! আছি, আমি আছি।

ম্যাজিসিয়ানের দুটো হাতে দশটা বল খেলা করার মত অসংখ্য শব্দ অরুণের মাথার মধ্যে ঘুরছে, ঘুরছে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো অরুণের। মা'র অসুখ বাড়াবাড়ি। মা'র মাথার মধ্যে ক্যান্সার। অরুণের মাথার মধ্যেও হবে নাকি? ক্যান্সার কি কুরে কুরে খায়? না, ক্যান্সার ঠিক কি জিনিস অরুণ জানে না। শুধু একটা ভয়ঙ্কর শব্দ। উর্মির মুখে 'বিপদ' কথাটার মত ভয়ঙ্কর।

ক্যান্সার বোধ হয় উইঢিবি। কুরে কুরে মাটি ফেলে, তারপর রাতারাতি একটা উইঢিবি হয়ে যায়। বাড়ে, দিনে দিনে বাড়ে। থামাতে না পারলে মৃত্যু, অবধারিত মৃত্যু। থামাবার রাস্তা নেই। অরুণের মনে হলো ক্যান্সার—উর্মির ক্যান্সার। আজকের মানুষের বুকে মাথায় রক্তে সর্বত্র। আজকের সমাজের সব জায়গায়।

টিকলুকে বলবে কিনা ভাবলো অরুণ। টিকলুকে বিশ্বাস নেই। ও কোন কিছুই চেপে রাখতে পারে না। উর্মির মান-সম্মান? শালা মাইনিং এঞ্জিনিয়ার। হাতের কাছে পেলে তাকে খুন করতো অরুণ। তারপর ধরা পড়লে লোকে বলতো রাইভ্যাল, বলতো জেলাসি। উর্মির ওপর টিকলুর কুৎসিত লোভ, টিকলু ব্যাটা হয়তো সুযোগ নিতে চাইবে। তাহ'লে টিকলুকেও আমি খুন করবো।

হঠাৎ রুণুর কথা মনে পড়লো। টিকলুকে যদি কিচ্ছু না বলি, অরুণ ভাবলো। তোর চঞ্চলদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে। বাড়ির সামনের নেম-প্লেট যেন দেখতে পেলো—ডাঃ চঞ্চল রুদ্র। একজন বড় বিপদে পড়েছে। না না, মানুষ কথা বলতে জানে না, কথা বলতে পারে না। কথা বলার উপায় নেই। টিকলু নির্ঘাত ভাববে রুণু বিপদে পড়েছে। ছি ছি, রুণু সুন্দর একটা রঙিন পালকের আকাশে-ওড়া-পাখি, রোদ্দুরে তার নীল পালক চিকচিক করছে। জাল পেতে ঐ পাখিকে ধরতে চায় না অরুণ। ও বড় জোর কাছে নেমে এসে গাছের ডালে বসুক, কিংবা অনুকম্পায় একটা রঙিন পালক ঝরিয়ে দিয়ে উড়ে যাক।

আচ্ছা, রুণুর তো এমন বিপদ হতে পারতো। হয়তো অয়ন। তখন তো সেটা অরুণের নিজেরই সমস্যা। রুণুর জন্যে ও সব পারে, সব পারে। হয়তো আমি নিজেই। 'তুই এত বোকা উর্মি?' অরুণ বলেছিল। উর্মির কথাটা মনে পড়লো, নিজেকে বিশ্বাস নেই। অরুণ নিজেকে বিশ্বাস করে না। শরীরের রক্তকে বিশ্বাস করা যায় না।

রুণুকে একদিন স্বপ্নে দেখেছিল।

টিকলু ভাববে রুণু বিপদে পড়েছে। ভাবতেও খারাপ লাগছে। অরুণ চায় না রুণুর গায়ে এতটুকু মলিন ছাপ পড়ে।

তার চেয়ে অরুণ নিজেকে কালো করে দেবে, নোংরা করে দেবে। সমস্ত অপরাধ নিজের ঘাড়ে নেবে। প্রেমফ্রেম সব বাজে কথা রে টিকলু। হলুদ শাড়ির সেই মেয়েটাকে তোর মনে আছে? বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসতো? তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কি কেলেঙ্কারি···

টিকলুর সঙ্গে দেখা হতেই অরুণ বলে উঠলো, টিকলু, আমি বিপদে পড়ে গেছি মাইরি। ভীষণ বিপদ!

টিকলু ভীতু। ভাগ্যিস ভীতু, তা না হ'লে ঊর্মিকে বিশুদ্ধ আর পবিত্র রাখতে পারতো না অরুণ। ঊর্মি ওর কে? কেউ নয়! আমরা তো গাছ, অরুণ ভাবলো। কিন্তু চন্দনের বনের মধ্যে অন্য গাছও চন্দনের গন্ধ বিলোয়।

টিকলু সামনে যেতেও সাহস পায় নি। শুধু টেলিফোনে বলে দিয়েছিল।

অন্ধকার বারান্দার মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডাক্তার রুদ্রর ঘর।

অরুণের পরিচয় পেয়েই ঊর্মির দিকে তাকালেন। ঊর্মির রজনীগন্ধার মত শরীরের দিকে। তারপর নার্সকে বললেন, নিয়ে যাও।

—মরে যাবো না তো, অরুণ? ঊর্মি হাসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু হাসির মধ্যে থেকে ভয় ফুটে বের হলো।

যাবার সময় একবার অরুণের দিকে ফিরে তাকালো ঊর্মি।

একখানা কাগজ এগিয়ে দিলেন ডাক্তার রুদ্র। —সই করুন।

—সই? অরুণ বুঝতে পারলো না।

অরুণ পড়লো, পড়ে দু'চোখ বন্ধ করে সই করে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। রাস্তায় বেরিয়ে এসে নার্সিং হোমটার দিকে ফিরে তাকালো।

সামনে একটি 'বার'। ভিড় জমতে শুরু করেছে। পানের দোকানে মত্তপ লম্পটের ভিড়। একটা সস্তা মেয়ে খালি ট্যাক্সির মত ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় হাঁটছে, হেলেদুলে। কেউ এগিয়ে গেলেই সওয়ারী পাওয়া ট্যাক্সির মত সময়কে দামী মনে করবে।

অরুণের বুকের মধ্যে একটা কান্না আর ভীষণ ভয় মাথামাখি

হয়ে তোলপাড় শুরু করেছে। ও যেন ভেঙে পড়ছে।

নোংরা অন্ধকার নার্সিং হোম। নার্সের মুখ নির্বিকার। 'মরে যাবো না তো, অরুণ'—কথাটা শুনে মৃদু হেসেছিলেন ডাক্তার রুদ্র। বলেছিলেন, ভয় নেই।

কিন্তু সই কেন? সই করার আগে পর্যন্ত ও টিকলুকে ভীতু ভেবেছে। এখন মনে হচ্ছে কাগজটা ফিরিয়ে আনা যায় না?

সই করতে গিয়ে হাতটা কেঁপে গিয়েছিল।

বুকের মধ্যে সাহস আনলো অরুণ। ও আর এমন কি! সামান্য একটা সই। সত্যি তো নয়। আসলে এ তো একটা খেলা। স্টেজের ওপর অভিনয় করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী হওয়ার মত। স্বামী-স্ত্রী সেজেছে শুধু, একটা দিনের জন্যে। কিংবা দুটো দিন। ঊর্মির সব বিপদ কেটে যাবে, সব কিছু ও আবার ফিরে পাবে।

ঊর্মি আমার বন্ধু। তার জন্যে যে-কোন বিপদকে ও তুচ্ছ করতে পারে।

কিন্তু নির্ভয় হতে পারছে না কেন? সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওর মাথার ওপর ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

অরুণ কোথায় বাসে উঠেছে, কখন উঠেছে, কিভাবে বাড়ি ফিরেছে কিছুই মনে পড়লো না। একটাও মানুষ দেখে নি ও। কিছুই দেখে নি। মাথার মধ্যে শুধু একটা গভীর দুশ্চিন্তা।

আমি ঊর্মির স্বামী?

ডাক্তার রুদ্র তো বলেছেন, ভয় নেই। ভয়ই যদি নেই, তবে সই দিতে হলো কেন? সকলেই নিজের নিজের গা বাঁচিয়ে চলেছে। ঊর্মি মারা গেলে···ঈস্, অরুণ ভাবতেও পারছে না। ওর দু'চোখ অন্ধকার দেখলো। অবিনাশবাবু সার্টিফিকেটের জন্যে লেটারহেডের কাগজটা দিয়ে বলেছিলেন, কেউ এনকোয়ারি তো করে না। ডাক্তার রুদ্র বলেছেন, ভয় নেই। অরুণ বোকা, বোকা। ও নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি নিয়েছে। অরুণরাই হয়তো ঝুঁকি নেয়। না নিয়ে উপায়

নেই। অবিনাশবাবুরা বা ডাঃ রুদ্ররা নেবে না, ওরা সাকসেসফুল। যারা সাকসেস দেখেছে তারা শুধু বাঁচিয়ে চলে।

অরুণের মনে হলো ওর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে হলো প্রচণ্ড জ্বর। কিংবা বুকের মধ্যে ক্যান্সার। হ্যাঁ, একটা তক্ষক কুরুর কুরুর করে ফুসফুস হৃৎপিণ্ড পাঁজর সব চিবিয়ে খাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে এলো অরুণ। ক্ষিদে নেই, একদম ক্ষিদে নেই। সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছিল, তখনো ভাল করে খায় নি। ক'দিন থেকেই ওর ক্ষিদে চলে গেছে। এখন বাঁচার ক্ষিদেও চলে গেছে।

মা'র ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েই চলে এলো। একটু বসতে ইচ্ছে হলো না, কপালে হাত রাখতে ইচ্ছে হলো না, কিছু না কিছু না, ভয় এসে ওর মাকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন শুধু ভয়।

মানুষ সহ্য করতে পারছে না অরুণ। মিলু না, বাবা না, ছোটমাসী না, দিদি না। এমন কি রান্নার লোকটাকেও না। সোনার মা কি জিজ্ঞেস করলো, উত্তর দিলো না।

উর্মি বাঁচবে তো? যদি মারা যায়, সমস্ত পৃথিবী জানবে, ছি ছি করবে। মিলু ভাববে, ছি ছি, দাদা এই! অথচ দিব্যি ইনোসেন্টের মত হেসে হেসে কথা বলছিল? দিদি বলবে, সে কি রে, মা'র কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, ভাবলাম···

বাবাকে বিশ্বাস নেই। গ্লানিতে লজ্জায় শেফিল্ড লেখা ক্ষুরটা স্ট্র্যাপের ওপর শান দিয়ে দিয়ে গলায় বসিয়ে দেবে হয়তো।

মা, তুমি তো কষ্ট পাচ্ছো, তুমি তো বাঁচবে না, তুমি মরে যাও, তাড়াতাড়ি মরে যাও। তোমার শোকের মধ্যে ওরা ডুবে যাবে, জানতেও পারবে না তোমার ছেলে একটা ক্রিমিন্যাল। একজন খুনী আসামী।

টিকলু হাসবে।—আমি জানতাম, আমি জানতাম। ভাব দেখাতো ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

আচ্ছা, উর্মি যদি মারা যায়, পুলিস, হ্যাঁ পুলিস যাবে। ডাক্তার রুদ্র তো সই করা কাগজটা এগিয়ে দেবেন। স্বামী সই করে দিয়ে গেছে। স্বাস্থ্যের জন্যে ইট ওজ এ নেসেসিটি···স্বামী? খোঁজ খোঁজ লোকটাকে। পোস্টমর্টেমে লাশ পাঠিয়ে দাও।

টেরিবল্! নাঃ, আর পারছে না অরুণ। একটা বুক, একটা ছোট্ট হৃৎপিণ্ড কতখানি ভার সহ্য করতে পারে। এক পৃথিবী অপমান, ধিক্কার। বুকের মধ্যে ধুকধুক আওয়াজটা কানে শুনতে পাচ্ছে অরুণ। কই, আগে তো পেতো না।

টেবিলে মাথা দিয়ে বসেছিল অরুণ। দিদি এলো, মাথায় হাত রাখলো।—যা অরুণ, মা'র মুখে একটু জল দিয়ে আয়।

বলেই অরুণের তক্তপোশের ওপর লুটিয়ে পড়লো দিদি। ডুকরে কেঁদে উঠলো।

অরুণ ফিরে এলো। নাড়ি নেই। মা অনেকক্ষণ আগেই হয়তো মারা গেছে।

কিন্তু অরুণের কোন দুঃখ নেই। মা কষ্টের যন্ত্রণার নদীটাকে পার হয়ে গেল।

'স্কাউণ্ড্রেল, তুমি—আপনি আমাকে কোনদিন আর ফোন করবেন না; এরপর পুলিসে খবর দেবো।' রুণুর গলা শুনতে পেলো অরুণ।

অরুণ কাঁদছে, হাউ হাউ করে কাঁদছে। ওর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অরুণ।

ছোটমাসী নিজেও কাঁদছে, অরুণের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে, কাঁদিস না অরুণ, কাঁদিস না। মা তো চিরকাল থাকে না রে।

মিলু কাঁদছে।—দাদা, তুই কাঁদিস না দাদা, তুই কাঁদিস না।

আরো কে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে! অরুণ জানে না। অরুণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, মনে মনে বলছে, রুণু, আমি একটা

স্কাউণ্ড্রেল, আমি লম্পট, আমি উর্মির স্বামী, আমি একটা ক্রিমিন্যাল। আমি খুনী আসামী। কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করো না রুণু।

হুজুর ধর্মাবতার! আমি কিচ্ছু জানতাম না। আমার মা'র এই কঠিন অসুখ, সেদিনই মারা যাবেন, আমি জানতাম। আমার মনের অবস্থাটা বিবেচনা করুন হুজুর। উর্মি আমার বন্ধু, সে নিয়ে গিয়ে সই করতে বললো। হুজুর, আমি ভেবেছিলাম তাকে বাঁচালে হয়তো আমার মা বেঁচে উঠবে। আমি তাকে মারতে চাই নি, আমি আমার মাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।

গঙ্গা, আমার সব পাপ ধুয়ে নাও। আমাকে রুণুর যোগ্য করো।

মা, আমি আবার জন্ম নেবো। তুমি থেকো, তোমার কোলেই জন্ম নেবো। দেখো, এবার আর তোমাকে বুঝতে ভুল হবে না। তোমাকে আমি কোনদিন কষ্ট দেবো না। সমস্ত কষ্ট আমি নিজে নেবো।

উর্মি, তুই কি মারা গেছিস? তুই অপেক্ষা করিস। আমরা বড় তাড়াতাড়ি, সময়ের আগে বন্ধু হয়েছিলাম। অনেককাল পরে আমরা আবার বন্ধু হবো। তখন সকলে আমাদের বুঝবে, বুঝতে পারবে।

রুণু, ভালবাসাকে বিচার করতে যেও না। চলো আমরা সেই গুহার ধারে ছোট্ট ঝর্ণায় পা ভিজিয়ে বসবো। আমি তোমার গলায়, চুলে, তোমার বুকে রক্ত-ফুলের মালা দুলিয়ে দেবো। আমি তোমার দুটি চোখের পাতায় ছোট্ট করে চুমু খাবো। আমি তোমার দুটি নগ্ন বুকের উপত্যকায় মুখ ডুবিয়ে শান্তি চাইবো।

গঙ্গায় স্নান করে উঠে এলো অরুণ। সকলের পিছনে পিছনে বাড়ি ফিরলো।

এখন অরুণের মন স্নিগ্ধ। বিস্তৃত গঙ্গার জল থইথই বুকের মত স্নিগ্ধ। উড়ন্ত গাংচিলের মত হাল্কা। অশৌচবস্ত্রের মত নির্মল সাদা।

কিন্তু থেকে থেকে উর্মির জন্যে একটা উৎকণ্ঠা বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আচ্ছা উর্মির হার্ট দুর্বল নয় তো? যদি ক্লোরোফর্ম···ক্লোরোফর্ম না অ্যানাসথিসিয়া? কি জানি,···সহ্য করতে পারবে তো?

সমস্ত বাড়ি আচার-অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। সমস্ত বাড়ি নিঃশব্দ। কেউ কোন কথা বলছে না। কিংবা খুব ধীরে বাতাসের শব্দের মত কথা বলছে। মিলু বসে আছে, দিদি বসে আছে, ছোটমাসী বসে আছে। শোকাহত।

অরুণের বাবা পাথর। নির্বিকার।

উর্মির কোন খবর নেই কেন? কে খবর দেবে! উর্মি হয়তো এখনো নার্সিং হোমেই আছে। একদিন, একটা কি দুটো দিন। উর্মি নিশ্চয় চলে আসে নি, এলে একটা খবর দিতোই। হয়তো ভাইয়ের হাতে। অরুণের মনে হলো ও খুব ভুল করেছে। উর্মিকে বলে নি কেন, একটা খবর দিস। বাঃ, তা বলে কৃতজ্ঞতা নেই! জানে না, অরুণ উৎকণ্ঠায় ঘুম হারিয়েছে!

অরুণ ভাবলো, ডাক্তার রুদ্রকে একটা ফোন করলে হয়। কিংবা নিজেই চলে যাবে এই সাদা থানের পোশাকে? দেখে আসবে উর্মিকে? না, বড় ভয় করছে অরুণের। যদি কাল রাতেই উর্মির মৃত্যু হয়ে থাকে? প্রায়ই তো কাগজে দেখে। কেউ বলতে পারে না, কেউ ভরসা দিতে পারে না। মৃত্যুর কাছে, অদৃষ্টের কাছে বিজ্ঞানও অসহায়।

সেখানে চলে যেতে ইচ্ছে হলো অরুণের। সিসটার, উর্মি ভাল আছে তো?

অন্ধকার করিডরটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অন্ধকার ছোট ছোট কেবিন, নোংরা বিছানা, ম্লান মুখ, কেমন চুপচাপ, নিঃশব্দ,

রহস্যময়। ভয়ের রাজত্ব যেন। ফিসফিস কথা নার্সের, রোগীর, ডাক্তারের। প্রতিটি পদক্ষেপে শুধু আতঙ্ক, আতঙ্ক। তখন ঐ অন্ধকারে আশা ছিল, বাঁচবার মন্ত্র ছিল। এখন ভয়, শুধু ভয়।

খবরের কাগজটা খুঁজে নিয়ে এলো অরুণ। তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কোন ছোট্ট খবর, কিংবা চাঞ্চল্যের বড় হরফ। কাল যদি মৃত্যু হয়ে থাকে উর্মির, তাহলে নিশ্চয় তা খবর হয়ে যেতো। হতো না? কি জানি। যদি মৃত্যু না হয়ে থাকে, তা হ'লেও তো খবর—উর্মি সে-খবর নিশ্চয় অরুণের কাছে পাঠাতো। বাঃ, সে-খবর কে দিয়ে যাবে! উর্মি তো এখনো ঐ রহস্যের অন্ধকারে।

যদি উর্মি মারা গিয়ে থাকে? ডাক্তার রুদ্রই নিশ্চয় পুলিসে খবর দিয়েছেন। কিংবা পুলিস নিজেই খবর পাবে। এ-সব গোলমেলে ব্যাপার কোনটা কিভাবে হয়, কি আছে আইনকানুন, অরুণ কিছুই জানে না।

ও শুধু চোখ বুঁজে একবার প্রার্থনা করলো, উর্মি যেন বেঁচে থাকে, উর্মি যেন বেঁচে ওঠে। মা'র চিতাভস্ম-অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দেবার পর গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে উঠে ও একবার প্রার্থনা করেছিল। উর্মি যেন বেঁচে থাকে, উর্মি যেন বেঁচে ওঠে।

'আপনার সই, আপনার', পুলিসের লোক যেন সেই কাগজখানা বাড়িয়ে ধরেছে ওর সামনে। আপনার স্ত্রী নয়, মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলেন ডাক্তারের কাছে, মেয়েটি অবিবাহিতা, আপনি ক্রিমিন্যাল। চলুন, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

না না, খবর নিতে যাবে না অরুণ। হয়তো পুলিস ঘিরে ফেলেছে নার্সিং হোমটা। কিন্তু অরুণের ঠিকানা নেই সে-কাগজে। উর্মি কি কোন ঠিকানা দিয়েছিল? হয়তো নিজের, হয়তো বানানো। পুলিস ওকে খুঁজবে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। নাও পেতে পারে। পাবে পাবে। ডাক্তার রুদ্র নিশ্চয় টিকলুর ঠিকানা বলে দেবেন। টিকলুর ঠিকানা কি তিনি জানেন? শুধুই তো চঞ্চলদা চঞ্চলদা বলতো। হয়তো টিকলুর বাড়ি চেনেন না।

অরুণের মনে হলো সমস্ত কোলকাতা তোলপাড় করছে ওরা। অরুণ, অরুণ। অরুণ কে? কোথায় থাকে?

কার ডাক শুনে চমকে উঠলো অরুণ। বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একটা পুলিসের গাড়ি, কালো রঙের পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কেন?

—অরুণ। আবার ডাক শুনলো।

পরক্ষণেই সুজিতকে দেখে বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। ও ভয়ে কেঁপে উঠলো। তা হলে টিকলুকেও ধরেছে। ধরা পড়েছে টিকলু। এবার অরুণ। এবার লাঞ্ছনা, ধিক্কার। অরুণের ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে এখনি আত্মহত্যা করে। কিভাবে করবে? আত্মহত্যা করার কোন পথই এখন আর ওর মনে পড়ছে না।

সমস্ত মুখ কালো করে এগিয়ে এলো অরুণ।

—আজ শুনলাম। সুজিত বিষণ্ণভাবে বললে।

কি শুনলো সুজিত? কি শুনেছে?

—দুঃখ করিস না। সুজিত বললে।—মা চিরকাল কারো থাকে না! আমার তো—সেই পাঁচ বছর বয়সে।

সমস্ত শরীর থেকে ভয়, সমস্ত আতঙ্ক ঘামের মত ঝরে পড়লো। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে অরুণের। কপাল ঘেমে গেছে।

আঃ, কি শান্তি। পুলিসের গাড়িটাও হর্ন বাজিয়ে চলে গেল। ওটা তো প্রায়ই এ রাস্তা দিয়ে আসে যায়।

—চল্ সুজিত, একটা সিগারেট খেয়ে আসি। অরুণ বললে। এই শোকের পোশাকে সিগারেট খেলে ওরা ভাববে মা'র জন্যে ওর কোন দুঃখ নেই। মা'র জন্যে সমস্ত শোক, দুঃখ, অনুশোচনা এখন শুধু একটা ভয়ের ঘরে বন্দী হয়ে আছে।

উর্মি। উর্মি ওর সমস্ত দেহমন জুড়ে আছে। এখন রুণুও ওর কাছে অসহ্য। হয়তো টিকলুদের প্রেসে ফোন করে করে বিরক্ত হয়ে গেছে। কিংবা ভেবেছে অরুণ ওকে ভুলে গেছে।

না, এখন রুণুর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। যদি সত্যি উর্মি মারা গিয়ে থাকে, যদি সত্যি ও ধরা পড়ে, রুণু তখন কি ভাববে! 'স্কাউণ্ড্রেল। একটা লম্পট। আমি এই লোকটাকে বিশ্বাস করেছিলাম। সে-কথা ভাবতেও লজ্জা।'

অথচ অরুণ কিছুই চায় নি। ও শুধু উর্মিকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কলঙ্ক থেকে, মৃত্যু থেকে। একটা ছোট্ট ভুলের জন্যে একটা বৃহৎ মাশুল কেন দেবে উর্মি! 'আমি বিশুদ্ধ, আমি পবিত্র।' কথাটা নতুন করে বিশ্বাস হলো। যারা পবিত্র তারাই এমন ছোট্ট ভুল করে। যারা অপবিত্র তারা ভুল করে না। তারা সতর্ক।

যারা পবিত্র তারাই গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে, নির্জনে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে, লেকে—কোন আবেগের প্রস্ফুটিত মুহূর্তে শরীরকে আদর করে। যারা অপবিত্র তাদের জন্যে সারা কোলকাতার দরজা অবারিত। হোটেলের দরজা।

কিন্তু এখন ও-সব তত্ত্বকথা ভালো লাগছে না অরুণের। কাউকে বোঝানো যাবে না। অরুণ ভাবলো, আমাদের কেউ বোঝে নি, বুঝবে না। বুড়োদের হাতে, ব্যর্থপ্রেম যুবকদের হাতে, সমাজের হাতে, সরকারের হাতে—শুধু একটাই রঙ। কালো। তারা সব কিছুকে কালো করে দিতে চায়। কালো চশমা পরে সব কিছু দেখতে চায়। তাই অন্ধকারকে তারা এড়িয়ে চলে, কালো চশমা পরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। খোঁজা যায় না। যা কিছু কালো তারা এড়িয়ে চলে। কারণ তার ওপর কালো রঙ চড়ানো যায় না। তাই আলোর ওপর, শুভ্রতার ওপর তাদের দৃষ্টি।

—সুজিত শোন্। অরুণ ওর হাতটা বাড়িয়ে দিলো।—ছাখ তো, আমার কোন বিপদ আছে কি না?

সিগারেটের প্যাকেটের উল্টো পিঠে কুষ্ঠীর ছকটা এঁকে দিলো অরুণ।—বেশ তাই ছাখ। ভয়ের কিছু আছে কি না।

সুজিতকে এতদিন ঠাট্টা করে এসেছে অরুণ। আজ তার মুখের দিকে এমন উদ্‌গ্রীব আতঙ্কিত চোখ তুলে তাকালো, যেন সুজিত কোন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি। মুখের কথায় ওকে অবধারিত কলঙ্ক থেকে রক্ষা করতে পারে।

'কি অধঃপতন! মা মারা যাচ্ছে ছেলেটার, তখন, ছাখো কি কাণ্ড', সারা পৃথিবী যেন অরুণকে বিদ্রূপ করে উঠলো।

মা'র একটা ছোট্ট ছবি ছিল, বড় মামা সেটাকে বড় করে বাঁধিয়ে এনেছে। ছবিটা দেখে দিদি বলে উঠলো, ছাখ ছাখ অরুণ, মায়ের ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে মায়ের মনে বড় কষ্ট ছিল রে, মুখের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

মিলু ছবিটা দেখলো, বললে, সত্যি তাই রে দিদি, মাকে দেখে এতদিন বোঝাই যায় নি, ছবিটায় ব্যথাটা একেবারে স্পষ্ট।

অরুণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলো ছবিটা। সেই চেনামুখ, কিন্তু কি যেন আছে ছবিটায়, যা কোনদিন অরুণ দেখে নি। অরুণের মনে হলো, ঠিক তো, মা'র একটাও হাসিমুখের ছবি নেই। অরুণের মনেই পড়ে না, মাকে কোনদিন হাসতে দেখেছে কিনা।

মা'র মনে সত্যি বড় কষ্ট ছিল। অরুণ ভাবলো, আমাদের সকলের মনেই বড় কষ্ট, কেউ সেটা দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না।

বাবার বুকের মধ্যেও তো অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা। কই, বাবাকে দেখে এখন কি ওরা বুঝতে পারছে? একটুও না। মা যখন মারা গেল বাবার চোখ বেয়ে তখন ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছে অরুণ। বাবা তারপর থেকে কেমন চুপচাপ, কিন্তু অনুষ্ঠানে এতটুকু ত্রুটি হতে দেয় নি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিয়েছে, নিজের হাতে খাট সাজিয়েছে, এখন অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম খুঁটিয়ে দেখছে, মেনে চলছে।

অনুষ্ঠান আসলে একটা যন্ত্রের মত। যন্ত্রের মতই বাবা চলছে, ফিরছে, কথা বলছে। অরুণ নিজেও তো সবই মেনে চলছে। কেন তা ঠিক অরুণ নিজেও জানে না। ও তো আগে এ-সব মানতোই না।

ভাবতো, ভণ্ডামি। হিপোক্রিসি। হৃষিকেশবাবুকে একদিন প্রণাম করতে হয়েছিল বলে বাবা-মা'র ওপর রেগে গিয়েছিল। এখন সব মানছে। বোধ হয় এতকাল মা'র দিকে চোখ তুলে তাকায় নি, মা'র কষ্ট বোঝে নি, তাই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করছে। কিংবা মা'র সেই কথাটা কানে বাজছে: তোকে সবাই যে হীরের টুকরো ছেলে বলছে রে! তাই। সব নিয়ম মানলেই লোকে বলে হীরের টুকরো। নিয়মটাই বড়, কেউ বুকের ভেতরটা দেখে না। রুণুই কি দেখে? ও শুধু মুখের কথাকে দাম দেয়; গুছিয়ে, মন জুগিয়ে চলতে পারলেই হলো। বুকের মধ্যে অসহ্য অভিমান নিয়ে যদি একটু বিরক্তি দেখায় তাহলে রুণু ভাবে, ও ভালবাসে না। কিন্তু মা? এখন মা'র ছবিটা যেন হাত তুলে আশীর্বাদ করছে। মা'র ছবিটার দিকে তাকিয়ে উর্মির জন্যে ভয় সহ্য করতে পারছে।

মা উর্মির জন্যেই মারা গেল না তো! হয়তো উর্মিকে বাঁচিয়ে দিয়ে মা মৃত্যু ডেকে নিয়েছে ছেলের মুখ চেয়ে। ছেলের গায়ে কলঙ্ক লাগবে জানতে পেরে মা হয়তো···

'ছেলেটা ভেবেছিল প্রেমিকার চেয়ে বড় কেউ নেই! মা বলে, ওর কাছে যাসনে, যাসনে। মেয়েটা বললে, এসো না, এসো না, যদি ভালবাসার প্রমাণ দিতে পারো তবেই আসবে। কি প্রমাণ চাও? ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে। প্রেমিকা মেয়েটি বললে, তোমার মাকে হত্যা করে তার হৃৎপিণ্ডটা উপহার এনে দিতে পারো? ছেলেটা নিঃশব্দে চলে গেল, তারপর মা'র বুক চিরে হৃৎপিণ্ডটা তুলে নিলো হাতে। প্রেমিকার কাছে ছুটে এলো তাজা রক্তের হৃৎপিণ্ডটা হাতের তালুতে রেখে। কিন্তু প্রেমিকার ঘরে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেলো। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা বলে উঠলো, আহা, বাছা, তোর লাগলো?'

উর্মির জন্যে মনের মধ্যে আতঙ্ক, কিন্তু মা'র ছবিটার দিকে

তাকালেই মনে হয় মা বলছে, ভয় কি রে, আমি তা হলে মরলাম কেন!

দূর, কি আজেবাজে ভাবছে অরুণ। উর্মি কি ওর প্রেমিকা নাকি! বন্ধু তো।

কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করবে, যদি উর্মি মারা যায়, যদি অরুণ ধরা পড়ে? ছি ছি, ওর জন্যে সকলের মাথা নিচু হবে। বাবা-দিদি-মিলু। লোকে উপহাস করবে, দিদি শ্বশুরবাড়িতে খোঁটা খাবে, মিলুর বিয়েই হবে না হয়তো। দাদাই যখন এরকম···বাঃ, আমরা যদি গাছ, সব একা একা দাঁড়িয়ে আছি, তা হলে অরুণের জন্যে ওরা কেন মাথা হেঁট করবে। শিকড়ে শিকড়ে মেশামিশি হ'য়ে আছে বলে?

না, উর্মিকে একটা ফোন না করে শান্তি নেই। এতকাল মনে হতো শজারুর কাঁটাগুলো উল্টোমুখে শরীরে বিঁধে আছে। এখন সেই বিরক্তি যদি বা সরে গেছে, মন জুড়ে এখন শুধু ভয়।

পোস্ট আপিস এখান থেকে অনেক দূরে। সেখানে গেলে উর্মিকে ফোন করা যায়। কিন্তু এই পোশাকে, সাদা 'কাচায়', মুখে দাড়ি, ট্রামে উঠতে একটু অস্বস্তি হয়। খালি পায়ে আরো। তবু ওসব কথা একটুও মনে হলো না, ট্রামে উঠলো, পোস্ট আপিসের সামনে এসে নামলো।

রুণুর কথা একবার শুধু একটু মনে পড়লো। তারপর ভাবলো, যাক, উর্মির খবরটা জানা আরো বেশী প্রয়োজন। নম্বরটা ডায়াল করে ক্র-র্-র্ শব্দ হতেই পয়সা ফেললো। শ্লট মেশিনটা এক যন্ত্রণা। এখন যদি কেউ না ধরে, পয়সাটা বরবাদ। আবার হ্যালো হ্যালো শুনে পয়সা ফেললে, তোমার কথা ও-প্রান্ত শুনতে পাবে দেরিতে, দু'বার 'হ্যালো হ্যালো' বলেই রেখে দেবে, বলবে, কিরে বাবা, কেউ সাড়াই দিলো না। গাভমেণ্টের মাথায় এতটুকু বুদ্ধি নেই। সিস্টেমটা এমন করো না, আমার কথা ও-প্রান্ত শুনতে পাবে, পয়সা

ফেললে তার কথা আমি শুনবো। তা হ'লে সে ঝট করে নামিয়ে রাখবে না। অনেকে বলে, আগে শ্লট মেশিন ভাল ছিল। তখন কিরকম ছিল অরুণ জানে না। আগে তো সবই ভাল ছিল।

ক্র-র্-র্ ক্র-র্-র্, রিং হচ্ছে, আর অরুণের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। এ দু'দিনে আতঙ্কটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, এখন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত ভয়। কি জানি কি শুনতে হবে।

উর্মির বউদি বোধ হয়, গলা শুনে বুঝতে পারলো অরুণ।

—উর্মিকে দিন না। উর্মি আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারলো না।

—সে তো ফেরে নি। বউদি উত্তর দিলো।—দিঘা গেছে, কাল আসার কথা ছিল।

অরুণের হাত কেঁপে গেল, হৃৎপিণ্ড যেন দুরমুজের মত আওয়াজ করছে। ফেরে নি, দিঘা গেছে, পাস করার আনন্দে, কলেজের মেয়েদের সঙ্গে, ফেরে নি, কাল আসার কথা ছিল।

দিঘা! দিঘা! ও তো একটা ওজুহাত। উর্মি নিজেই বলেছিল।

অসহ্য কষ্টে, দুঃখে, ভয়ে অরুণের চোখে জল এসে গেল। গলা কেঁপে গেল কথা বলতে গিয়ে, হাত কেঁপে গেল রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে।

কি করবে কিচ্ছু ভেবে পেলো না। একবার ইচ্ছে হয়েছিল রুণুকে ফোন করবে উর্মির খবর পেয়ে, এখন আর রুণুর কথা মনেও পড়লো না।

ফেরে নি, ফেরে নি, ফেরে নি। কেন ফেরে নি? ডাঃ রুদ্রর বাড়ি তো চেনে, প্রথম দিন টিকলু যায় নি, ও একা গিয়ে ঘুরে এসেছিল। সেখানে যাবে? ডাঃ রুদ্রকে ফোন করবে? সাহস হলো না।

ফিরতি ট্রামে অরুণ একেবারে সেই 'বার'টার সামনে গিয়ে নামলো। পাশের পানের দোকানটার কাছে দাঁড়িয়ে, ওর চেহারায় শোকবস্ত্র, দাড়ি কামায় নি, খালি পা, ও কেন 'বার'-এর কাছে, কয়েকজন দেখলো ওকে। আর অরুণ দূর থেকে সেই বাড়িটা,

রহস্যের দরজার মধ্যে দিয়ে সেই অল্প-আলোর করিডোরের দিকে, দোতলার ছোট ছোট ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে দেখলো। ভিতরে যেতে সাহস হলো না। একবার শুধু ইচ্ছে হলো পানের দোকান-দারটাকে জিজ্ঞেস করে, থানা-পুলিস হইচই কিছু হয়েছিল কিনা। ঐ বাড়িটাকে কেন্দ্র করে!

নার্সিং হোমটার দিকে তাকাতেও ভয়, যেন বাড়ি নয়, একটা বিকট আতঙ্ক।

সত্যি বলছি রুণু, আমি নির্দোষ, উর্মি আমার বন্ধু, শুধু বন্ধু, সে বিপদে পড়েছিল, আমার বুকের ভেতরটা সেই মুহূর্তেই কেমন করে উঠলো···

মা, তুমি তো সবই জানো। তুমি তো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব দেখতে পাচ্ছো। উর্মির সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলাম সে কথা ছোটমাসীর কাছে শুনে বলেছিলে, তুই গোল্লায় গেছিস। এখন তুমি অন্তত বলো, হীরের টুকরো!

অরুণের এক একবার দুঃসাহসের ইচ্ছে জাগছিল। কি আছে, সেদিনের মতই গটগট করে না হয় ঢুকে যাবে, ডাঃ রুদ্র যদি নাও থাকেন, নার্সকে ডেকে বলবে, সিসটার···

আশপাশের লোকগুলো মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছিল। অরুণের কেমন ভয়-ভয় করলো, তবু নিজের মনকে বোঝালো, নাঃ, সন্দেহ করবে কেন, নিশ্চয়ই ওর খালি গায়ে জড়ানো চাদর, খালি পা, কিংবা দাড়ি কামায় নি বলেই···এত ভয়ের মধ্যেও অরুণ হঠাৎ হেসে ফেললো। নিশ্চয়ই ওরা ভাবছে, ব্যাটার মা নয়তো বাপ মারা গেছে, তবু মদের জন্যে ছুকছুক!

আনমনা এদিক ওদিক পায়চারী করলো অরুণ, ফাঁকে ফাঁকে নার্সিং হোমটার পর্দা দেওয়া জানলাগুলোর দিকে তাকালো।

পর্দা সরিয়ে জানলায় একবার দাঁড়াক না উর্মি। তা হলেই তো সব ভয় ঘুচে যায়।

—ছ্যাখ সুজিত, আমরা প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে এত বিব্রত, কিন্তু আসলে ওটা কি জানিস, একটা গামছার মাঝখানে গিঁট দিয়ে টানছি, একদিকে পাস্ট একদিকে ফিউচার। অরুণ কবে যেন হঠাৎ বলেছিল।

বুকের ভেতরটা গামছার মত কে যেন নিঙড়ে দিচ্ছে। ভয়, যন্ত্রণা, দুঃখ—কত কি। আসলে কেন ভয় পাচ্ছে অরুণ। মা তো এখন পাস্ট টেন্স। তবু রক্তের মধ্যে সেই পুরোনো সংস্কার, বিবেক, অন্যায়বোধ মা হয়ে বেঁচে আছে। সকলের রক্তের মধ্যে। তা না হ'লে ও বুক ফুলিয়ে বলতে পারতো, কোথাও কোন অন্যায় হয় নি। ওর কর্তব্যটুকু ও করেছে, উর্মি স্বভাবের বিরুদ্ধে যায় নি, নিয়ম যারা বানিয়েছে তারা জীবনের নিয়ম মানে নি।

মা যদি অতীত, তা হ'লে রুণু ওর ভবিষ্যৎ নাকি? একদিকে সংস্কার, অন্যদিকে আশা গামছার মত নিঙড়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন মনে হচ্ছে, আমরা পুরোনো ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস আর নতুন গড়ে-ওঠা বিশ্বাসের মধ্যে পাক খাচ্ছি, তাই এত কষ্ট এত ব্যথা। এক মূল্যবোধ থেকে আরেক মূল্যবোধে পৌঁছনোর রাস্তা পার হচ্ছি।

দু'ধার থেকে রাশি রাশি গাড়ি, ডবল-ডেকার বাস, ট্রামের ঘন্টি··· এদিকের ফুটপাথ থেকে ওদিকের ফুটপাথে পৌঁছে ঝট করে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়লো অরুণ।

বাড়ি বাড়ি···সেখানে যদি শান্তি থাকে!

ফিরে এসে গলির ভেতর সবে ঢুকেছে, দেখলো একটা পুলিসের লোক হাতে কি একখানা কাগজ নিয়ে বাড়ির নম্বর খুঁজছে।

অরুণ সেখানেই থেমে পড়লো। এক পাও এগোতে পারলো না। মাথা ঘুরে গেল, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মত কেমন কেমন অন্ধকার অন্ধকার।

আরেকটু হলেই অরুণ টলে পড়তো। দেখলো পুলিসের লোকটা এগিয়ে আসছে। অরুণের দিকে এগিয়ে আসছে।

ও কি ছুটে পালাবে? কিংবা বলবে, অরুণকে ও চেনে না?

—আট নম্বর কোনটা জানেন? পুলিসের লোকটা জিজ্ঞেস করলে—অবনীবাবু, অবনী চ্যাটার্জি?

আঃ, কি আরাম। ওদের বাড়ি তো সাতাশ। কি আরাম!

বাড়ি ফিরে মা'র এনলার্জ করা ছবিটার দিকে তাকিয়ে অরুণ অনেকখানি শান্তি পেলো। মনে হলো মা বুকের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছে, অরুণ, তোর কোন ভয় নেই। বন্ধুর বিপদে···তুই তো মানুষ, মানুষের মত মানুষ!

বিকেলের দিকে টিকলু এলো। বললে, রুণু তোর ওপর চটে ফায়ার। পর পর ক'দিন ফোন করেছে, কাউকে পায় নি, আজ আমি ছিলাম···

নাঃ, শান্তি নেই। যখন তেতো হয়ে গিয়েছিল, তখন তবু নিজেকে সহ্য করতে পারতো। তখন একটু কিছু পেয়েছিল, এখন ভয়। উর্মির জন্যে ভয়, রুণুর জন্যে ভয়।

টিকলু ফোন ধরেছিল! ওকে কোন বিশ্বাস নেই, রুণু তো এমনিই কিচ্ছু জানে না, রেগে আছে, তার ওপর টিকলু কি বলেছে কে জানে। হলুদ শাড়ির কথা শুনে টিকলু বলে উঠেছিল, ইয়াল্লালা, কপাল নিয়ে এসেছিস তুই। একটাকে আমাদের দিকে একটু ঢিল দে না বাবা, এক লাটাইয়ে দুটো ঘুড়ি, প্যাঁচ খেয়ে শেষে দুটোই সাফ হয়ে যাবে। টিকলু বলেছিল, প্রেম-প্রেম যন্তরনা—কত কি ভড়ং মারতিস, তলায় তলায় সবাই দেখি এক।

অরুণ কিছু বলতে পারে নি। নির্দোষ হলুদ শাড়ির গায়ে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে। এরপর টিকলুর সঙ্গে কারো কথা হ'লে সে বলবে, আরে জানি জানি, ও হলুদ শাড়ির কথা আর জানতে বাকি নেই। হলুদ শাড়ির কাছে একটা থাপ্পড় খেলেও টিকলু একই কথা বলতো। ছেলেরা সব এক, সব মেয়েই তাদের চোখে বাজে, বাজে—খারাপ, খারাপ, প্রেমে পড়লেই ফুলের মত সুন্দর দেখে তাকে।

উমির কিছু একটা যদি হয়ে থাকে, অরুণ যদি ধরা পড়ে, তখন কি ভাববে এই টিকলু? কিন্তু এখন মনের মধ্যে আরেক ভয়, রুণুকে কি বলেছে টিকলু। হলুদ শাড়ির একটু আভাস? ব্যস, তা হ'লে রুণু, রুণুর প্রেমও এখন মৃত। মা, উর্মি, রুণু—সব মরে যাবে।

—না রে, মেয়েটা ভীষণ ভাল, ভীষণ সিম্পল, তোর মা মারা গেছেন শুনে গলার স্বরটা এমন হয়ে গেল, বিকেলে তোর সঙ্গে দেখা করবে···

টিকলুর কাছে সব নির্দেশ জেনে নিলো অরুণ। গালে হাত বুলিয়ে দেখলো, আয়নার সামনে নিজেকে, খালি গায়ে থান চাদরটা জড়িয়ে চেহারা একটু মানানসই হয় কিনা। বড় অস্বস্তি লাগলো এই শোকবস্ত্রে রুণুর সামনে যেতে।

—তুমি কি, আমাকে একটু খবরও দিলে না! রুণুর চোখের পাতা মেঘের মত। বললে, মাকে একবার দেখবো, এত সাধ ছিল। একটু থেমে বললে, আমি তো শ্মশানে যেতে পারতাম, অচেনা লোকের মত দূর থেকে দেখতে পারতাম।

অরুণ চুপ করে রইলো। ও তখন মনে মনে ভাবছে, রুণু এত আপন মনে করে মাকেও, অথচ উর্মি হয়তো সব ভেঙে দেবে।

—তুমি মাকে ভীষণ ভালবাসতে, তাই না? রুণু বললে।—তোমার মন ভীষণ নরম, মাকে ভাল না বাসলে এমন নরম মন হয় না।

অরুণ বললে, মাকে সকলেই ভালবাসে।

ওর মনে হলো ও একটুও মিথ্যে বলছে না। ওর মনে পড়লো না, মা বেঁচে থাকতে ও শুধু তিক্ততা পেয়েছে, তিক্ততা দিয়েছে। কিন্তু সেটা তো শুধু বাইরের পোশাক। নাকি এই খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল, সাদা থানকেই লোকে ভালবাসা মনে করে। বুক চিরে কেউ কিচ্ছু দেখতে চায় না।

—মামীমা রোজ বলছে, তোর বন্ধুকে একদিন নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। না গেলে ভাববে শুধু বন্ধু নয়। বলে ঈষৎ হাসলো রুণু।

রুণুর হাসিটা এত যে সুন্দর, অরুণের কিন্তু আজ তা মনে হলো না।

—আচ্ছা, উর্মি গিয়েছিল? ওকে তো নিশ্চয় খবর দিয়েছিলে।

অরুণ অসহায় রাগে চুপ করে রইলো, তারপর বললে, না।

—বাঃ, ও তো বন্ধু। রুণুর গলার স্বরে কোন সন্দেহ ছিল না। তবু অরুণের মনে হলো উর্মির নামটাও ও যেন সহ্য করতে পারছে না।—ও গেলে কিই বা ক্ষতি ছিল।

আরো দু' পাঁচটা কথার পর রুণু চলে গেল, আর অরুণ এসপ্লানেড থেকে সব ক'টা খবরের কাগজ কিনে নিলো।

পাড়ার রীডিং রুমে গিয়ে সব ক'টা কাগজ তন্ন তন্ন করে দেখছে এ ক'দিন। সকালে রাজ্যের লোক গিয়ে ভিড় করে, ভাল করে দেখাই হয় না। নিজেই কিনে ফেলবে তেমন পয়সাও হাতে থাকে না। মা নেই, এখন কার কাছে হাত পাতবে।

—মাকে তুই মণিব্যাগ বলে ডাকলেই তো পারিস। দিদি একদিন বলেছিল।—টাকার দরকার না থাকলে মা আছে কি নেই খবরই রাখিস না।

ঠিক মনে পড়ছে না, কে যেন বিয়ে বাড়িতে স্বামীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, আমার মণিব্যাগ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদির ননদের কে হয় বউটা—খুব স্মার্ট, হাসিখুশি। দিদি নাক বেঁকিয়ে বলেছিল, ঢঙি।

মেয়েরা অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। ওরা বন্ধু হতে পারে না, প্রেমিকা হতে পারে না, স্ত্রী হতে পারে না। ওরা শুধু আত্মপ্রেমে ডুবে থাকতে চায়। তুমি দিনরাত আমার ফ্ল্যাটারি করো, আমার গুণগান করো, আমার রূপের বর্ণনা দাও, আমাকে পুজো করো। আমি বলবো, অরুণ আমাকে, জানিস ভাই, দারুণ ভালবাসে, বড্ড মায়া হয়।

ঊর্মি হয়তো তার নিজের মনকে বলছে, রুণু হয়তো তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে। কেউ বলবে না, আমি অরুণকে ভালবেসে ফেলেছি।

শেষ অবধি অপেক্ষা করে করে একদিন আবার ফোন করে বসলো অরুণ। প্রথমটা গলার স্বর নতুন নতুন ঠেকলো। তারপর।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঊর্মি। ওর হাসির শব্দটা চিনতে অসুবিধে হয় নি।

ঊর্মি বললে, বাঃ সে তো কবে, কবে ফিরে এসেছি।

ভয়টা তরতর করে শরীর থেকে নেমে গেল মুহূর্তের মধ্যে, রক্ত তরতর করে উঠে রাগ হয়ে গেল।

অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। নিজের মনে মনেই বললে অরুণ।

ব্যস, আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। দুশ্চিন্তার বন্ধ ঘরে কেউ যেন ওকে আটকে রেখেছিল। সেই ঘরের দেয়ালগুলো পটাপট খুলে গিয়ে অসংখ্য জানলা হয়ে গেল। আনন্দে, খুশিতে তখনই ঊর্মির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হলো অরুণের। অভিমানে সে-কথা বলতে বাধলো। কেন, ঊর্মি নিজে বলতে পারে না? ও এখন হাসছে, যেন হাসির ব্যাপার।

সেদিনের কথা মনে পড়তেই রাগে জ্বলে উঠলো। ঊর্মির সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। ঊর্মি আমার বন্ধু নয়। ও

কি ভেবেছে? নিজের সুন্দর শরীর আর সুন্দর হাসিটাকে ম্যাজিক ল্যাম্প বানিয়ে বুড়ো আঙুলে টুসকি দেবে, আর অরুণ সেই দৈত্যটার মত শুধু হুকুম তামিল করবে?

অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ।

তার চেয়ে রুণু অনেক সুন্দর, অনেক সহজ।

—না না, ওসব আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না, আমি আজ দেখা করবোই। সেদিন তো দু'মিনিটও থাকো নি। রুণু বলেছিল।

অরুণের তবু অস্বস্তি। নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে ফেলেছে।—কি করি বল্ তো টিকলু?

—আরে ফল্স্ চুল নিয়ে কত মেয়ে তো দিব্যি কেশবিলাস, তোর তো ফল্স্ টাক।

অরুণ আর সুজিত দু'জনেই হেসে ফেলেছে। কিন্তু অরুণের অস্বস্তি যায় নি। এখন জীবনে আবার রঙ ফিরে এসেছে, রুণুকে আবার তীব্র ভাবে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলো অরুণ, ফল্স্ টাক—বেশ বলেছে টিকলু।

নাঃ, শার্ট প্যাণ্টের সঙ্গে কামানো মাথাটা একদম মানায় না। মনে হয় অন্য কার মাথা যেন ধার করে এনে বসিয়ে দিয়েছে। দিদি একবার পুজোর সময় ধুতি পাঞ্জাবি দিয়েছিল। খুঁজে খুঁজে সেটা বের করে পরলো অরুণ। আয়নায় দেখলো।

মিলু পিছন থেকে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, ভাল লাগছে রে দাদা, তোকে বেশ লাগছে। তারপর হেসে উঠে বললে, শুধু ভুরু দুটো মনে হচ্ছে আঠা দিয়ে সেঁটেছিস।

চুল গজাতে এখন কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই। এতদিন রুণুকে না দেখে, দেখা না দিয়ে থাকতে পারবে নাকি।

অরুণ এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো, দেশলাই কিনতে গিয়ে থেমে গেল। একদিন ওর দেশলাইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে

রুণু বলেছিল, মোম লাগানো ঐ ছোট্ট বাক্স কেনোনা কেন ? ওগুলো খুব সুন্দর। এরপর থেকে ওগুলোই কিনবে।

অরুণ খোঁজ করলো। এই ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখতে পারলে যেন নিজের কাছেই খুশি হতো। খোঁজ করলো, খোঁজ করলো। পর পর কয়েকটা দোকান, অনেকখানি হেঁটে অনেকগুলো দোকান খুঁজে সেই ছোট্ট দেশলাইয়ের বাক্সটা কিনলো।

—ধুতি পাঞ্জাবিটায় তোমাকে অদ্ভুত ভালো দেখাচ্ছে। রুণু বললে।

অরুণ হাসলো, তারপর দেশলাইটা দেখালো।

রুণু দেশলাইটা হাতে নিলো, একটার পর একটা কাঠি জ্বাললো। চাপা আলোর রেস্টুরেন্টে কাঠিগুলো ফস্ ফস্ করে জ্বলছে আর রুণুর মুখ আলো করছে।

রুণু হঠাৎ বললে, খুব সুন্দর লাগে এই দেশলাইগুলো, অয়ন ব্যবহার করতো।

রুণু একদিন একটা জাপানী দেশলাইয়ের বাক্স, খুব সুন্দর ছবি আঁকা, এনে দিয়েছিল।

অরুণ খরচ হয়ে যাবার ভয়ে রোজ ঘুমোবার আগে তার একটা করে কাঠি জ্বালতো, সিগারেট ধরাতো। যেন ওটা যতদিন কাছে থাকবে ততদিন রুণুও কাছে।

সাদা তাঁতের শাড়িতে রুণুকে অন্যরকম লাগছিল। চওড়া জরিপাড় সাদা শাড়িতে ওর উজ্জ্বল বয়সের শরীর খুব ঠাণ্ডা আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছিল। খোঁপা বাঁধে নি, পিঠ বেয়ে ওর ঘন চুল কোমর ডিঙিয়ে ঢেউ হয়ে হয়ে ভেঙে পড়েছে। রুণু কথা বলতে বলতে এক একবার সেই চুলের রাশ বুকের ওপর টেনে আনছিল, এক একবার এলো খোঁপায় তাকে শাসন করছিল, আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে খোঁপা ভেঙে পড়ছিল।

কথা বলতে বলতে বার বার মুগ্ধ হয়ে রুণুর দিকে তাকাচ্ছিল অরুণ।

রুণু বললে, আজ তোমাকে যেতেই হবে। মামীমা বলে দিয়েছেন।

মামীমাকে বড় ভয় অরুণের, বড় অস্বস্তি।

—না গেলে কোনদিন আর আসবো না। রুণু ঠোঁট ফোলালো।

বাঃ রে, এ কথাটায় যে অরুণ আঘাত পায়, রুণু একবারও বোঝে নি। রেগে গেলেই ও বলে, কোনদিন আর আসবো না। যেন ওর ভাল ছেলে হয়ে থাকার, রুণুর মন জুগিয়ে চলার পুরস্কার দিতেই ও আসে। ওর নিজের কোন ইচ্ছার তাগিদ নেই। কোন ভালবাসার টান নেই। অর্থাৎ রুণু জানে, ও না এলে অরুণ কষ্ট পাবে। রুণুর একটুও কষ্ট হবে না। ও শ্লেটের ওপর জল বুলিয়ে দিয়ে সব মুছে দিতে পারবে।

অরুণ অসহায় বোধ করলো। মুখে হাসি টেনে বললে, যাবো যাবো। কিন্তু আজকের বিকেল···

আজকের বিকেল ও কৃপণের মত খরচ করতে চায়। কতদিন, কতদিন রুণুর সঙ্গে দেখা হয় নি।

রুণুর সমস্ত শরীর ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তারপর তাকে একটা উদ্দাম ঝড়ের মধ্যে ফেলে তার ফুলের মত শরীরের একটি একটি করে সব পাপড়ি ঝরিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

—তুমি আমাকে কতদিন আদর করো নি। রুণু বললে।

তখন আবছা-আবছা সন্ধ্যা, অন্ধকার, একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ির আড়ালে, নির্জনে, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে, শান-বাঁধানো বেঞ্চের ঘনিষ্ঠতায়, গঙ্গার বুকে মোটর লঞ্চের বাঁশি, রুণুর চুলের কি এক মিষ্টি গন্ধের আমেজ, নির্জন, রুণুকে কাছে টেনে তার দুটি চোখের পাতায়, চোখ বুঁজলে রুণুর চোখ লিলিফুলের কাঁপানো কুঁড়ি, অরুণ একটি একটি চুমু রাখলো। রুণু হাসলো, চোখ খুললো, চোখ তুললো। রুণু লজ্জায় চোখের পাতা এবার বন্ধ করলো। রুণুর শরীর অবশ

হলো। রুণু দুরন্ত সুখে অরুণের আরো কাছে ঢলে পড়লো।

এক পলকের আশ্লেষে হৃৎপিণ্ডকে হৃৎপিণ্ড সাড়া দিলো, অরুণ পাগলের মত লক্ষ লক্ষ চুমু খেলো, উত্তেজনায় স্নান করলো।

—আরে পাগল, আরে পাগল, এটা তোমার রবিনসন ক্রুশোর দ্বীপ নয়। রুণু ঝট করে দাঁড়িয়ে হাসতে শুরু করলো।

অরুণ বললে, আরেকটু বসো, লক্ষ্মীটি।

এই সুন্দর সন্ধ্যাটাকে একটু একটু করে আপন করে নিতে চাইছিল অরুণ। এতদিন ওর মনে হয়েছে, যেন অন্যের সন্ধ্যাকে ও চুরি করছে।

ঘড়ির দিকে তাকালো রুণু, বলে উঠলো, সর্বনাশ!

তিনটে ফাজিল ছোকরা ওদের পিছন দিয়ে যাচ্ছিল, রুণুর কথা কানে যেতেই ফিরে তাকালো, একজন শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, এরই মধ্যে? আরেকজন হয়তো কবি-কবি, বললে, তোমার চোখে দেখেছিলাম—

ওরা দু'জনেই লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলো।

রুণু রেগে গিয়ে বললে, আর কোনদিন না, কোনদিন না।

ছেলেটি আর মেয়েটি স্বর্গে পৌছবে বলে রোজ দুটি করে সিঁড়ির ধাপ গড়তো। আর কে একজন প্রতিদিন এসে একটি করে সিঁড়ি ভেঙে দিতো। শেষে রেগে গিয়ে মেয়েটি একদিন সমস্ত সিঁড়িটাই ভেঙে গুড়িয়ে দিলো। বললে, যাবো না, যাবো না।

মা কোথায় গেছে, কোথাও গেছে কিনা, অরুণ মাঝে মাঝে ভাবে। স্বর্গ সত্যি সত্যি থাকলে অনেক সান্ত্বনা থাকতো।

আমাদের তো কিছুই নেই। না অতীত, না ভবিষ্যৎ। শুধু বর্তমানকে টুকরো টুকরো ভাবে, একটু একটু করে ভোগ করতে পারো। চারপাশের অতৃপ্তির মধ্যে একটুখানি সুখ।

বাবা যন্ত্র হয়ে গেছে, অরুণের আজকাল মনে হয়। কর্তব্যের পায়ে দাসখত লিখে দেওয়া একটা নির্ভুল যন্ত্র। কিংবা পাথর।

কিংবা গাছ। গাছের মত নির্বাক, অথচ অটল অনড়।

সকালে বাবা ডেকচেয়ারটায় শরীর এলিয়ে চুপচাপ বসেছিল। বাবা আজকাল চুপচাপ বসে থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কেউ বাবার সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না। শোকের দেয়াল তুলে বাবা নিজেকে পৃথক করে ফেলেছে।

বাবা হঠাৎ ডাকলো, অরুণ!

অরুণ গিয়ে চুপ করে কাছে দাঁড়ালো।

—তোর চাকরিটার কিছু হলো? বাবা জিজ্ঞেস করলো।

অরুণ বললে, বোধ হয় এই সপ্তাহে চিঠি পাবো, ছোটমেসো বলছিল। একজন দু'বছরের লিয়েন নিয়ে বিলেত যাচ্ছে, পড়তে, তার জায়গায়। চাকরিটা টেম্পরারি।

চাকরিটা পেলেও কোন বিশেষ আনন্দ নেই। এখনই এখনই কিছু পাওয়া গেল এই যা। টেম্পরারি। তা হোক, স্থায়ী তো কিছুই নয়। কিন্তু অরুণের যা কিছু আনন্দ উবে গিয়েছিল ঐ একটা কথায়। একজন লিয়েন নিয়ে বিলেত যাচ্ছে। অর্থাৎ অরুণ একটা ফালতু। ওরা সবাই—টিকলু, সুজিত, অরুণ সবাই ফালতু। ওদের জন্যে কিচ্ছু নেই, ওদের কোন ভূমিকা নেই। ওরা অস্থায়ী, ওরা এক্সট্রা। ওরা শুধু অনুপস্থিত অভিনেতার হয়ে দু'এক রাত্রি হাততালি পেতে পারে।

হয়তো তাও পাবে না। অনেকদিন আগে ওরা একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল, উর্মিও ছিল সঙ্গে। বিখ্যাত একটা নাটক, বিখ্যাত একজন অভিনেতা ছিল সে নাটকে। ওরা আগেই একবার দেখেছিল, উর্মি দেখে নি। তাই আবার গিয়েছিল। 'তুই ভাবতে পারবি না উর্মি, ছোট্ট একটা রোল, কিন্তু কি দারুণ অভিনয়।'

গিয়ে বসেছে সীটে, স্টেজ থেকে কে একজন ঘোষণা করলে, আমরা দুঃখিত। আপনারা অনেকেই এ নাটকে যাঁর অভিনয় দেখতে এসেছেন, তিনি আজ অনুপস্থিত।

একজন নতুন কে, অরুণ কিংবা সুজিত কিংবা টিকলুর মত কেউ একজন সেই চরিত্রে অভিনয় করলো। অরুণের তো মনে হয়েছিল খুব ভাল অভিনয়, বোধ হয় সে আসল অভিনেতার চেয়েও ভাল, কিন্তু কেউ হাততালি দিলো না। কেউ খুশি হলো না। সকলেই একটা অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এলো।

অরুণ তেমনি একজন। আসল অভিনেতা অনুপস্থিত বলেই ওর ডাক পড়ছে। ও যত ভাল অভিনয়ই করুক হাততালি পাবে না।

—অয়ন কক্ষনো এমন করতো না। ফেরার পথে রুণু বলেছিল।

একটু আগে অরুণের মনে হয়েছিল ওর চেয়ে সুখী কেউ নেই। মনে হয়েছিল ওরা কেউ কিচ্ছু বোঝে না। এর মধ্যে শরীর নেই, সেক্স বলতে কি বোঝায় কেউ জানে না, টিকলু না, রুণু না, বুড়োরাও জানে না। এ তো শরীরকে রোদ্দুরে বাতাসে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মত ফুটিয়ে দেওয়া। এ এক ধরনের মৈত্রী, সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমরা দু'জনে এক।

অয়ন কক্ষনো এমন করতো না।

জানি, জানি, তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না। আমি অয়নকে কোনদিন ঈর্ষা করি নি, বরং ব্যথা পেয়েছি, রুণুর জন্যে, অয়নের জন্যে। অরুণ ভাবলো, রুণু যেন ওকে তুলনা করছে, বিচার করছে। বলছে, অনুপস্থিত অভিনেতার মত ভাল অভিনয় করতে পারছো না। তুমি আসল অভিনেতার মত নও।

—খুব সুন্দর লাগে এই দেশলাইগুলো। অয়ন ব্যবহার করতো। রুণু বলেছিল।

আর অরুণ মুখ কালো করে বিমর্ষ হাসি হেসেছিল। ঈর্ষা দিয়ে সেই মুহূর্তকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় নি।

রুণুর মামীমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার তখন আর একটুও ইচ্ছে ছিল না অরুণের। তবু যেতে হয়েছিল। হাততালি পাবে না,

সকলে আঙুল দেখিয়ে বলবে, নকল নকল, তবু স্টেজের ওপর উঠতে হবে, অভিনয় করতে হবে। দুঃখ পাবে, ব্যথা পাবে, হয়তো লাঞ্ছনা জুটবে শুধু, তা জেনেও। তুমি যে অভিনয় করতে চাও, ঐ ভূমিকাটা তুমি যে ভালবেসে ফেলেছো।

এখন আর অরুণের ফেরার পথ নেই। ফিরতে গেলেও যন্ত্রণা, এগিয়ে গেলেও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা।

ভয় বোধ হয় এক ধরনের মৃত্যু। ভয়ই বোধ হয় এই যুগটার ভেতর থেকে সব রস কেড়ে নিচ্ছে, সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিচ্ছে। বিরাম আর নন্দিনীর কথা মনে পড়লো অরুণের। নন্দিনীর সেই উদ্‌ভ্রান্ত বোকা বোকা চোখ। ওরা পরামর্শ করছে, চক্রান্ত করছে, উপায় বের করতে চাইছে কিছু একটা। অথচ নন্দিনীর কানে যাচ্ছে না একটা কথাও। বিরাম বলেছিল, ওর দাদা নিশ্চয় পুলিসে খবর দেবে। নন্দিনী অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ ভেঙে-পড়া গলায় বলে উঠেছিল···কি বলেছিল এখন আর ঠিক মনে নেই।

পুলিস নয়, দাদাকে নয়, আসলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে ভয় পেয়েছিল নন্দিনী। ভয় এসে ওর প্রেমকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছিল। একটা দিনেই নন্দিনীকে মনে হয়েছিল একটা মৃত বিবর্ণ শবদেহ, প্রাণ নেই, প্রেম নেই।

অরুণের মনে হলো ওর মধ্যেও আর কোন প্রেম নেই। উর্মির জন্যে ভয় এ ক'টা দিনে ওকে সকলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বাবা, মিলু, দিদি, এমন কি মা'র কাছ থেকেও। কারো সঙ্গে ও মুখ তুলে কথা বলে নি, বলতে পারে নি। সুজিত আর টিকলুকেও অসহ্য লেগেছে।

—হিপ হিপ হুর্‌রে, হিপ হিপ হুর্‌রে।

মুখ-ভর্তি হাসি নিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে ঢুকেছিল সুজিত, হাতে একখানা লম্বা সাদা খাম। 'কোজি নুকের' চায়ের টেবিলে খামটা ছুঁড়ে দিতেই বিদেশী ডাকটিকিটখানায় চোখ পড়েছিল।

—জব-ভাউচার! উৎফুল্ল মুখে সুজিত বলে উঠেছিল, মেরে দিয়েছি!

বিলেতে একটা ভাল চাকরি, ভাল মাইনে। ব্যস, সুজিত যেন আর কিছুই চায় নি।

—শালার ফরেন এক্সচেঞ্জের ধার ধারি না আর। তেল দিয়ে দিয়ে পি. ফর্ম আর পাসপোর্ট, তার পরেই···খুশী-খুশী মুখ, দু' আঙুলে একটা তুড়ি দিয়েছিল সুজিত। তারপর জমানো রাগ ফুটে বেরিয়েছিল।—এ দেশে মানুষ থাকে না, বুঝলি অরুণ। তুই শালা টাকা রোজগার করবি, ইনকাম ট্যাক্স দিবি; মন্ত্রীরা বিলেত যাবে ফুর্তি করতে। তোর বেলায় দেশ দেখাবে, ফরেন এক্সচেঞ্জ পাবি না।

অরুণের এসব কিচ্ছু ভাল লাগে নি। ওকে যেন কোন কিছুই আর স্পর্শ করছে না। ভয় ওর মন থেকে সব রস কেড়ে নিয়েছে।

—তুই মাইরি কেমন যেন হয়ে গেছিস। সুজিত বলেছে, রুণুই তোকে ডোবাবে।

রুণু? রুণুর কথা তো ভাবেই নি অরুণ, ভাবতে ভালই লাগে না। তবু অন্যমনস্কের মত হেসেছে।

সুজিত হেসে বলেছে, গিয়েই রুণুর জন্যে কি পাঠাবো বল্।

অরুণ উত্তর দেয় নি। টিকলু বলেছে, ওর তো রুণুই আছে। আমার জন্যে বরং ব্রিজিত বার্দো টাইপের কচি মেমসাহেব একখানা পাঠিয়ে দিস।

ওরা সকলেই হেসে উঠেছে। সুজিত বলেছে, পারলে নিজেই নিয়ে আসবো।

ব্রিজিত বার্দো! অরুণ মনে মনে ভেবেছে, তোরা তো বুঝতে পারছিস না আমার মনের অবস্থা, জিনা লোলোব্রিজিডা মিনি স্কার্ট পরে এসে দাঁড়ালেও তাকে মেয়ে বলে মনে হবে না।

সত্যি, ভয় এমন জিনিস, যা একবার দেখা দিয়ে সরে গেলেও, মানুষ আর তার পুরোনো জায়গায় ফিরে যেতে পারে না। নন্দিনীর ভয় সরে গিয়েছিল, তবু তার প্রেম ফিরে আসে নি। ঊর্মি এখন আর কোন দুশ্চিন্তা নয়, তবু রুণুর জন্যে এখন আর সেই গুমরে-মরা

ভালবাসা খুঁজে পাচ্ছে না অরুণ। সিনেমা দেখছি, দারুণ একটা রোমান্টিক সীন, হঠাৎ রীল কেটে গিয়ে পর্দায় সাদা আলো, লোকেদের চিৎকার, তারপর আবার ছবি শুরু হলেও যেমন সুর কেটে যায়—ভয় যেন ঠিক তেমনি সাদা পর্দা।

বাবা শেষ অবধি বিরাটির জমিটা কিনেই ফেললো। রিটায়ার করে থাকতে তো হবে কোথাও, একখানা ছোটখাটো বাড়ি অন্তত …বাবার মধ্যেও সেই ভয়। আর দু'দিন পরে কি হবে, কোথায় থাকবো। ভবিষ্যৎকে ভয় পেয়েছে সারা জীবন, তাই কিছু ভোগ করলো না বাবা। ছোটমেসোকে একদিন বলেছিল, কিছু জমাচ্ছো-টমাচ্ছো, না অন্তভক্ষ করে ভবিষ্যতে…ছোটমেসো হেসেছিল।—সে কথা ভাবলেই ভয় হয়, তাই ওসব আর ভাবি না। যে ক'দিন চাকরি আছে ভোগ করে নিই।

সেইজন্যেই হয়তো অরুণের চোখে ছোটমেসো অনেক কাছের মানুষ। এখনই, এখনই। এখন না পেলে আর পেয়ে কি লাভ। এই তো, ঊর্মি দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে, ভাল আছে, অথচ অকারণ একটা ভয় এসে রুণুকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু…শালা মাইনিং এঞ্জিনিয়ার! ও ব্যাটাও হয়তো ভেবেছিল, এখনই, এখনই।

সকলেই তাই ভাবছে, কাকে দোষ দেবে অরুণ। আচ্ছা, ঊর্মিও তো ভয় পেয়েছিল, এখন ও কি আবার সেই পুরোনো ঊর্মি হতে পারবে? সেই রজনীগন্ধার ঝাড় হয়ে হাসির শরীরটা দুলিয়ে… মাইনিং এঞ্জিনিয়ারকে সে নিশ্চয় ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ঘৃণা করাই তো উচিত। কিন্তু ঊর্মির ওপর অরুণের রাগ হচ্ছে কেন।

—অত ভয় পাচ্ছো কেন? রুণু হাসতে হাসতে বলেছিল, ভয় নেই, মামীমা পুরুত রেডি করে রাখেন নি, গেলেই ধরে বিয়ে দিয়ে দেবেন না।

অরুণ অপ্রতিভ মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলেছিল, আরে দূর, ভয় কেন হবে।

আসলে ও অস্বস্তি বোধ করছিল। রুণু তো সরল মনে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে চায়, কিন্তু মামীমাটি কি আর বুঝবেন না! নাকি তাঁকে সবই বলেছে রুণু। নন্দিনীকে তো বলেছিল। ওদের কি কোন বিশ্বাস আছে নাকি। কিন্তু বিয়ের কথায় একটু বিব্রত বোধ করেছিল অরুণ। 'গেলেই ধরে বিয়ে দিয়ে দেবেন না।' তা হ'লে বিয়ের কথা ভাবছে নাকি রুণু?

তবু না গিয়েও পারে নি।

রুণুর মামীমা দেখেই হেসে উঠেছিলেন।—এই অরুণ? আমি ভেবেছিলাম···

হাসিটাকে এক পলকে সুইচ-অফ করে দিয়েছিলেন, পাছে অরুণ ভাবে তার বেলের মত মুড়োনো মাথা দেখে হাসছেন।

দেখা করার আগে অস্বস্তি ছিল অরুণের, কিন্তু গল্প করতে করতে কখন ভুলেই গিয়েছিল, ও এই প্রথম এসেছে।

নিজের ন্যাড়া মাথাটাব কথা মনেও ছিল না। আজকাল মনেই থাকে না।

মামীমা এক ফাঁকে চা করতে উঠে গেলেন, আর রুণু কাছ ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে বললে, তোমার পাশে না, আমার নিজেকে কেমন বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া লাগছে।

অরুণ হেসে ফেলে মাথায় হাত বোলালো। ধোপধুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবির ভাঁজ ঠিক করলো। ধুতি পরে হাঁটাচলায় অনভ্যাসের ছাপ পড়ে, অস্বস্তি হয়, তবু মামীমার কথাটা শুনে ওর মনে হলো, ভালই করেছে প্যান্ট পরে আসে নি।

চায়ের জল চাপিয়ে মামীমা ফিবে এলেন। মুখে করুণ বিষণ্ণ একটা ছাপ ফুটিয়ে বললেন, রুণুর তো খুব রাগ, কান্নাকাটি করছিল, তোমার মা মারা গেলেন, অথচ ওকে নাকি খবরই দাও নি।

কান্নাকাটি করছিল! অরুণ মনে মনে ভাবলো, দেখেছো, মামীমাকে তা হ'লে সবই বলেছে। ওর খুব অস্বস্তি লাগলো।

আবার মনে হলো, রুণু একটা স্টুপিড, কান্নাকাটি করলে তো মামীমা সবই বুঝে গেছেন।

—তোমার কথা এত বলে, আমি তো ভেবেছিলাম চোঙা প্যান্ট পরা আজকালকার ছেলেদের মত। মামীমা হাসি-হাসি মুখে বললেন, এসব যে মানো, সত্যি খুব ভাল লাগলো।

অরুণ হাসতে পারলো না। ভিতরে ভিতরে ওর নিজেকে খুব ছোট মনে হলো। মনে হলো ও যেন অন্যের ভূমিকা চুরি করেছে। নাম ভাঁড়িয়ে জাল মানুষ সেজেছে। এসব যে মানো! ও কি মানে নাকি! কিছু না, বড়মামার কাছে কথা শুনতে হবে, লোকে বলবে, বেঁচে থাকতে মাকে ভালবাসতো না, মারা গিয়েও একটু দুঃখ পেলো না, কিংবা নিজের মনের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই মাথা ন্যাড়া করেছে। নিয়ম মেনেছে। নিয়ম মানলেই হীরের টুকরো। ধুতি-পাঞ্জাবি ন্যাড়া মাথা—ব্যস, মামীমার চোখে অরুণের দাম বেড়ে গেছে।

—তোর বন্ধুটি বেশ ভাল রে রুণু, আজকালকার ছেলে বলে মনেই হয় না। রুণুর মামীমা চা নিয়ে এসে কাপটা টি-পয়ের ওপর নামাতে নামাতে আবার বললেন।

পোশাক, পোশাক। পোশাকটাই সব। পোশাকী ঢঙে একটু ফর্সা ভাষায় কথা বলো, 'চমৎকার ছেলে'। মামীমার কথা শুনে ঈষৎ লজ্জায় চোখ তুলে অরুণ একবার চোখাচোখি করলো রুণুর সঙ্গে, আর রুণু ফিক করে হাসলো। অর্থাৎ মামীমার চোখে খুব তো ধুলো দিচ্ছো!

টিকলু ঠিকই বলে।—ছাতার বাঁটের মত ঘাড় কাত করে কথা বলবি, কথায় পালিশ দিবি, আর হৃষীকেশবাবুদের পেন্নাম ঠুকবি, পিসিমা বলবে 'নক্ষী ছেলে'।

অনেকক্ষণ গল্প করে অরুণ উঠলো।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে মামীমা বললেন, আবার এসো যেন।

অরুণ ঘাড় নেড়ে রুণুর পাশে পাশে নামছিল।

রুণু ওকে নীচে অবধি এগিয়ে দিতে এলো।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন। সিঁড়ির জানলা দিয়ে দূরের অন্ধকারে লম্বা রাস্তাটার দু' ধারে দু' সারি আলো। সাদা সাদা চন্দ্রমল্লিকার মত ফুটে আছে। অরুণের মুখ খুশিতে ফুটন্ত ফুল হয়ে আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অরুণের মুখ ছাই হয়ে গেল।

ডাক্তার রুদ্রর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি।

বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠলো।

ডাঃ রুদ্র ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিলেন, অরুণের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই থেমে পড়লেন। আর অরুণ দ্রুতপায়ে তাঁকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। পিছনে পিছনে রুণুও তরতর করে নেমে এসেছে।

তারপর রুণু কি বলেছে, রুণু যাবার সময় হেসেছে কিনা, কথা বলেছে কিনা, অরুণ কিছুই জানে না। অরুণ কিভাবে বাকী পথ হেঁটে এসে বাস ধরেছে, কিভাবে বাড়ি ফিরেছে, কিছুই মনে পড়ে না। ও তখন একটা ভাঙা জাহাজ।

আচ্ছা, ডাক্তার রুদ্র কি ওকে চিনতে পেরেছেন? 'ডাঃ রুদ্র, মামাবাবুর কাছে আসেন', রুণু যেন একবার বলেছিল, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে। বাঃ, ওর তো তখন মাথায় চুল ছিল, পরনে প্যাণ্ট আর শার্ট। এক পলকে কখনো চেনা যায়! কিন্তু চেনা না গেলে উনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন কেন।

প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করা মাংসের হাড়গুলো কেমন নরম নরম হয়ে যায়। অরুণের শিরদাঁড়া, হাঁটুর হাড়, কাঁধ সব রবারের মত নুয়ে পড়ছে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই।

বাড়ি ঢুকেই ছোটমাসীর গলা শুনতে পেলো। বাবার সঙ্গে গল্প করছে, ছেলেকে দার্জিলিং কনভেণ্টে দিচ্ছি, এখানে শুধু স্ট্রাইক আর স্ট্রাইক। আজকাল ছোটমাসী মাঝে মাঝে আসে, গল্প করে। না এলে বাবা চুপচাপ একা। একা আর নিঃসঙ্গ। দিদির বাচ্চা

হবে, খুব মুটিয়েছে। অরুণ জানতো না, তাই ভেবেছিল খেয়ে ঘুমিয়ে মোটা হচ্ছে। দিদির বাচ্চাটা একটু বড় হলে এখানে এনে রাখবে, বাবা সঙ্গী পাবে। দূর, বাচ্চাটা তখন তো দিদিরও সঙ্গী, দিদি রাখতে চাইবে না।

অরুণ ভয়ে চোখ বুজলো রুণুর কথা মনে পড়তেই। মনে পড়বে কি, সিঁড়ির দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে সরাতেই পারছে না। এতক্ষণ নিশ্চয় সব জানাজানি হয়ে গেছে।

—দাদা, খাবি না? মিলু জিজ্ঞেস করলে।

অরুণ বললে, না রে, শরীরটা ভাল নেই।

মিলু একবার তাকালো দাদার দিকে। আহা, মা নেই বলে দাদার নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে। এখন তো ওর অসুখবিসুখের খবর নেবারও কেউ নেই।

মিলু এসে ওর কপালে হাত দিতে গেল, জ্বর হয়েছে কিনা। আর অরুণ ওর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, বিরক্ত করিস না মিলু, বিরক্ত করিস না।

অবিনাশকে তোর মনে আছে টিকলু? নিভাকে ভালবাসতো। কি জানি, ওরা ওটাকেই ভালবাসা বলতো। অবিনাশ চাকরি পেয়ে রাউরকেলা গেল, স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েছি। নিভাও গিয়েছিল। অবিনাশ বললে, নিভা তো ট্যাক্সিতে ফিরবে, তুইও একই রাস্তায়। ভাবলে হাসি পায়, জানিস টিকলু, টালিগঞ্জ যাবো, সাদার্ন অ্যাভেনিউ পার হলেই রাঙাকাকীমার বাড়ি, কে দেখে ফেলবে, ভাববে দিব্যি প্রেম করছি, ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, 'বাঁয়ে বাঁয়ে'— রাঙাকাকীমার বাড়িটা এড়িয়ে 'মেনকা'র পাশ দিয়ে ঘুরে যাবো ভাবছি, নিভা বলে উঠলো, 'এই না না, আজ না, আটটা বেজে গেছে।' তবু, জোর করেই মেনকার পাশ দিয়ে ঘুরে গেলাম।

বলতে পারলাম না, ওকে লেকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তা হ'লে? আমরা আসলে দু'জনে দু' ভাষায় কথা বললাম, কেউ কারো ভাষা বুঝলাম না। আমি ভাবলাম, নিভা খারাপ; নিভা ভাবলো, আমি।

টিকলু হেসে উঠেছিল।—ও তো রাজীই ছিল, আমার কাছে পার্সেল করে দিলি না কেন।

টিকলু জানে না, যে মুহূর্তে নিভাকে খারাপ মনে হয়েছে সেই মুহূর্তে তার উপস্থিতি অরুণের কাছে বিছুটি, বিছুটি।

এখন রুণুর কাছে অরুণও হয়তো তাই। খারাপ, খারাপ, ডঃ রুদ্র বলবেন, ছেলেটা খারাপ।

মামীমা চোখ কপালে তুলবেন।—সে কি, দেখে যে এত ভাল মনে হলো।

সব শুনে রুণু বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে।

টেম্পোরারি চাকরিটাই নয়, প্রেম সুখ অর্থ সুনাম—কোনটাই অরুণদের স্থায়ী নয়। সব অস্থায়ী। যখন যেটুকু পাও লুটে নাও।

বৃষ্টি, বৃষ্টি।—তোমার নতুন নাম বৃষ্টি। বৃষ্টির ঘর, ঘষা-কাঁচের বৃষ্টির ঘর একদিন অরুণের বুক ভরিয়ে দিয়েছিল। শুকনো ডালে কচি কচি পাতা এনেছিল। রোদ্দুরে আলোয় ঝরে পড়া রুপোর তারগুলো দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল, এখন অন্ধকার।

রুণু মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, খুব সুন্দর নাম। এমন সুন্দর নামে বোধ হয় কেউ কাউকে ডাকে নি।

এখন আর ও রুণুকে ফিরে পাবে না, রুণুর কাছ থেকে আর কিছুই পাবে না। এতদিন সব ভালো ছিল, এখন অরুণ খারাপ, খারাপ।

ঊর্মি অনেক দিন আগে একবার বলেছিল, দাদা-বউদি ভাবছে তাড়াতাড়ি বিয়ে করছি না কেন। কিন্তু বেচারী মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, তারই বা দোষ কি, তারও তো একটা প্ল্যান আছে···

জোর একটা পাপ করেছে, দু' দিন পরে উর্মিকে বিয়ে করে ফেললেই পাপ ধুয়ে যাবে। দু' দিন আগে করলেও পাপ ধুয়ে যেতো। পাপ যদি সত্যিই থাকে, তার বিচার হয় না। প্রত্যেক মানুষ নিজেই নিজের পাপের বিচার করে। অথচ অপরাধের বিচার হয়। অরুণ অপরাধী। কেন, না শুধুমাত্র একটা আইন আছে বলে। মানুষ মাত্রেই নাস্তিক। কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ভগবানের আইনকে কেউ মানে না, মানুষের আইনকে দামী মনে করে। তাই ভগবানকে কেউ ভয় পায় না, আইনকে ভয় পায়, মানুষের তৈরী নিয়মকে ভয় পায়। নিয়মে ঘেরা সমাজকে।

—দেখ অরুণ, নিয়মগুলো এমন, নিজেদের মনে হয় লোচ্চা, মনে হয় লোফার আমরা। সেজন্যেই হয়তো আরো লোচ্চামি করতে যাই। নিয়মগুলো বদলে দে, দেখবি আমরাও ভালো।

'তোমার মত ছেলেকে চাবুক মারতে হয়, তুমি এসো না, এসো না। ফোন ক'রো না। কে বলছেন আপনি? না না, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।' অরুণ যেন কানের কাছে শুনতে পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে রিসিভারটা ঝটাং করে নামিয়ে রেখে রুণু মামীমাকে বলছে, সেই স্কাউণ্ড্রেলটা।

—এই, একটা কথা বলবো, হাসবে না বলো। প্রেম কি—আমি জানতাম না, তুমিই শিখিয়েছো। রুণু একদিন বলেছিল।

আজ রুণু হয়তো মনে মনে বলছে, ঘৃণা কি—আমি জানতাম না, তুমিই ঘৃণা করতে শিখিয়েছো।

অরুণ কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। সুজিত কিংবা টিকলুই কি পারছে? কেউ না। কফি হাউসে আড্ডা জমে না। ওখানে এখন সব নতুন মুখ। আরো কম বয়সের ছেলেমেয়ে, উজ্জ্বল মুখ। ওদের সামনে এখনো অফুরন্ত আশা। ওরা হাসে, তর্ক করে, স্বপ্ন···স্বপ্ন দেখে। ওদের কাছে অরুণের নিজেকে বড় ম্লান বিমর্ষ মনে হয়।

—অরুণদা, কি করছেন এখন? একটি ছেলে ওকে একা একা বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন।—কফি খাওয়াতে হবে অরুণদা।

যেন অরুণদা বার্মা শেলের ডিরেকটার। নিজের কফির পয়সা জোটে না, কফি খাওয়ান! কি করছেন জিজ্ঞেস করলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে। এখন তো কিছুই করছে না, এর পর মাইনের অঙ্কটা কেবল গোপন করে বেড়াতে হবে। রাধানাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, দিব্যি বললে, আটশো টাকা মাইনে। ব্লাফ। কি জানি, সত্যি হতেও পারে, এক একজন তো পায়।

বয়কে তিনটে কফির অর্ডার দিলো। নির্ঘাত ছেলে দুটো প্ল্যান করে এসেছে, চল্ অরুণদাকে যখ দিয়ে আসি। খাবে, আবার বলবেও। ভদ্রতাকে কেউ দাম দেয় না। গোঁফওলা ইনটেলেকচুয়াল ছোকরাটা এখনো আসে, নিশ্চয় বেকার। উর্মি সেদিন তাকে ভদ্রতা দেখিয়েছে, ছেলেটা সেঁটে থাকতে চাইছিল। বোধহয় ভেবেছে, উর্মি ওর প্রেমে পড়ে গেছে। নিভা ভদ্রতা দেখিয়েছিল, হঠাৎ সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে ট্যাক্সি ঢুকতে দেখে, ভেবেছিল

মেকে বেড়াতে যেতে চায় অরুণ, তখন কি বলবে? রেগে যাবে? ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলবে চিৎকার করে উঠে? ভদ্রতা করে শুধু বলেছিল, এই না, না, আটটা বেজে গেছে। ব্যস, টিকলু শুনে বললে, ও তো সস্তা মেয়ে। অরুণ নিজেও ভাবলো, বোধ হয় খারাপ।

ভদ্রতার দাম দেয় না কেউ। হৃদয়ের আবেগকেই বা কে দাম দেয়। উর্মি দিলো না, রুণু দেবে না। টিকলু তো হাসে।

শুধু একটা জিনিসই পেয়িং—প্ল্যান। সব ব্যাপারে প্ল্যান করে এগিয়ে চলো। প্রেম কিংবা চাকরি, কিংবা সুনাম।

—আমরা গাছও নই রে, আমরা আগাছা। আমাদের কোনো প্ল্যান নেই। অরুণ বলেছিল।

টিকলু হেসে উঠেছিল।—সত্যেনকে মনে আছে? ইস্কুলের সত্যেন? ও বলতো, জীবনটাকে প্ল্যান করতে হয়। দিনরাত মুখস্থ করতো, বি. ই. পাস করলো। ছ'মাস হলো ছাঁটাই হয়ে গেছে।

রাধানাথ কি সত্যি আট শো টাকা মাইনে পায়? সুখেন, সুখেনও বলেছিল, ও অফিসার। আলোকও বিলেত চলে গেল, বড়লোকের ছেলে, ফরেন এক্সচেঞ্জ নাকি পাওয়া যায় না! শুনলেই নিজেকে ঘৃণা হয়, হিংসে করতে ইচ্ছে করে। একটা হাতবোমা নিয়ে যাকে হোক, যেখানে হোক ধাঁই করে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে হয় পৃথিবীটাকে লাট্টুর মত তুলে নিয়ে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে, কিংবা পৃথিবীটাকে ডিমের মত কারো মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে। ফেটে চৌচির হয়ে যাক, সেও শান্তি। আমি রিকশা টানবো সেও ভালো, তোমাকে সুখে ঘুমোতে দেবো না।

উর্মির জন্যে বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছিল অরুণ।

উর্মিকে এখন আর ওর ভাল লাগে না। উর্মি ওর প্রেম নষ্ট করে দিয়েছে বলে, কিংবা ও মনে মনে উর্মির যে ছবিটা এঁকে রেখেছিল, সেটাকেই উর্মি নষ্ট করে দিয়েছে বলে।

কিন্তু উর্মি কি-এমন ভুল করেছে? ওরা সকলেই তো জানে ওরা কিছু পাবে না, তাই সবকিছুর টুকরো টুকরো করে স্বাদ নিতে চায়। সবটুকু, সমগ্রভাবে, কখনো কোনদিন পাবো এই আশায় থাকতে চায় না। অল্প হোক, এখনই চাই, এখনই।

কফি হাউস হট্টগোলে ঝমঝম করছে। তর্ক না আলোচনা বোঝা যায় না। একটা কথাও বোঝা যায় না। অথচ সকলেই কথা বলছে, কথা বলছে, কথা বলছে। কিন্তু যে যা বলতে চায়, কেউ বলছে না; বলতে পারছে না।

কোথাও একটা খালি চেয়ার নেই। যে আসবে তারই মনে হবে সে যেন ফালতু।

এই ভ্যাপসা গরমে, এই হট্টগোলে অরুণরা কি করে এতদিন কাটালো। এখন তো নির্জনতাকে খুঁজছে। নিঃশব্দে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। রুণুর জন্যে, রুণুকে হারানোর জন্যে দুঃখ পেতে ইচ্ছে করছে।

কফি হাউসের দরজার সামনে একরাশ অচেনা ভিড়ের ফাঁকে উর্মির মুখ হেসে উঠলো। উর্মি এগিয়ে এলো। বেয়ারাটা ভাল টিপ্স্ পায়, ছোটাছুটি করে চেয়ার যোগাড় করে দিলো। ছেলেটা আর মেয়েটা মুখোমুখি, ওদিকের টেবিলে ফর্সা রোগা মেয়েটা ডিসপেপসিয়ার রুগীর মত প্লেটের পর প্লেট সাফ করছে। এদিকের টেবিলে কমলালেবুর কোয়ার মত রঙ মেয়েটাকে ঘিরে চারটে দামাল ছোকরা। মেয়েটার স্বল্প ঢাকা সর্বাঙ্গ শুধু লোভ দেখাচ্ছে।

অরুণদের পাশের টেবিল একেবারে ড্রাই, পাঁচটা জোয়ান ছেলে, একটা বেশ লম্বা, ঘন হয়ে বসে ঝগড়া করছে।

উর্মি চেয়ার টেনে বসেই তাদের দিকে তাকিয়ে বললে, ভেজিটেরিয়েন হয়ে গেলি নাকি?

অরুণ বললে, লম্বা ছেলেটা আছে, ভাবলাম তোর ভাল লাগবে।

উর্মি হাসলো, চাপা গলায় বললে, কাঁধটা সত্যি বেশ চওড়া।

তারপর চুপচাপ। হঠাৎ এলোমেলো সব কথা মনে পড়ে গেল অরুণের। ভিতর থেকে একটা জ্বালা আর রাগ। সেদিন তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল উর্মি। একটাও কথা শোনাতে পারে নি অরুণ।

—তুই অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। অরুণ বলে উঠলো।

উর্মির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও কিচ্ছু বললে না।

আর অরুণের মনে হলো এ কথাটা না বললেই হতো। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, এখন, ফিরে আসার পর, উর্মির দারুণ লজ্জা। উর্মি ভাবছে, ও অরুণের কাছে খুব ছোট হয়ে গেছে।

সেদিন তো অল্পক্ষণ ছিল, তারই মধ্যে রসিকতা করে হাল্কা হয়ে পুরোনো উর্মিতে ফিরে আসতে চেয়েছিল। পারে নি। ফিরে আসা যায় না।

আজও সমস্তক্ষণ উর্মি একবারও হাসলো না, উচ্ছল হলো না। ওর বুকের মধ্যে কি এক অসহ্য যন্ত্রণা চাপা আছে।

ফেরার পথে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে উর্মি আস্তে আস্তে বললে, তুই আমাকে ভীষণ ভালবাসিস, তাই না অরুণ?

অরুণ কোন কথা বললো না, অভিমানে ওর চোখের পাতা ভারী হলো।

উর্মি হঠাৎ বলে উঠলো, তুই আমাকে কোনদিন বলিস নি কেন অরুণ, বলিস নি কেন?

অরুণ চমকে চোখ তুলে তাকালো উর্মির দিকে। উর্মিকে কোন দিন অরুণ এমন বিচলিত দেখে নি।

প্রিন্সেপ ঘাটের থামের ছায়ায় বেঞ্চে বসে উর্মি একদিন বলেছিল, আমার কি মনে হয় জানিস অরুণ, যার যেখানে যত ব্যথা আছে, বুকের মধ্যে শূন্যতা, আমি তাদের ভরিয়ে দিই। সুখী করি।

—আমাকে ভালবেসে তুই সুখী হতিস? অরুণ বল, বল তুই।

অরুণ কোন কথা বললো না। চুপ করে রইলো।

ঊর্মি ধীরে ধীরে আবার বললে, তোর সই-করা কাগজটা যখন দেখলাম, ডাঃ রুদ্র দেখালেন, আমি জানতাম না অরুণ···

ঊর্মির গলার স্বর কান্নায় কেঁপে গেল।

আর অরুণ বলে উঠলো, তুই অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ।

ঊর্মি ধীরে ধীরে বললে, ভালবাসা কিছু না রে অরুণ, কিছু না। তুই যেন কোনদিন আমার কাছে ছোট হয়ে যাস না। তা হ'লে সমস্ত জীবন আমি বার বার কার কাছে ফিরে আসবো!

অরুণ ভাবতো ওকে কেউ ভালবাসে না। মা-বাবা-দিদি সকলের কাছ থেকে ও শুধু তাচ্ছিল্য কুড়িয়েছে। তাই কাউকে ওর ভালবাসতে ইচ্ছে করে নি। রুণুই ওকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

বাবা ডেকচেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে। এখন এক-একদিন ও কাছে গিয়ে বসে। কথা বলে।

—আর চাকরি করতে ভাল লাগে না রে। বাবা একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল।

অরুণের ইচ্ছে হয়েছিল ও যদি একটা ভাল চাকরি পেয়ে যায়, বলবে, বাবা, তুমি আর চাকরি করো না।

আজকাল দিদিকেও ভাল লাগে। দিদিকে যেদিন অক্ষয়দা নিয়ে গেল, ও সেই প্রথম বলেছিল, দিদি, আর ক'দিন থাকলে পারতিস। তুই থাকলে বাবার মন ভাল থাকে।

সত্যি, বাবার বড় কষ্ট। বাবাকে কেউ বুঝলো না। সবাই যে শুধু বাইরেটা দেখতে চায়। বড় বড় ডাক্তার, হাসপাতাল, নার্স, অজস্র টাকা খরচ—এইসব দেখলেই লোকে বলতো, যথেষ্ট করেছে। বলতো, ওর নিশ্চয় খুব দুঃখ। বাবা মাকে তাড়াতাড়ি কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে চাইলো, বাবার কষ্ট কেউ বুঝলো না।

—দাদা, দেখ দেখ, নিমগাছটায় ফলগুলো পেকে হলুদ। এক-

মুঠো পাকা নিমফল জলে ধুয়ে নিয়ে এলো মিলু।

অরুণ দেখলো, পাকা মহুয়ার মত। আরেকটু ছোট।

মুখে দুটো নিমফল পুরে দিয়ে মিলু আরামে চোখ বুজলো।—কি মিষ্টি!

নিমফুলও সুগন্ধ ছড়ায়, নিমের ফল মিষ্টি।

দুপুরে খাওয়ার পর ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল অরুণের। তবু বিছানায় গড়িয়ে নিতে পারলো না। ভয় হলো হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

প্রতিদিন দুপুরে টিকলুদের প্রেসের টেলিফোনের সামনে গিয়ে বসে থাকে। টিকলুর বাবা বাড়িতে খেতে যান, আর সেই সময়টুকু টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে থাকে ও, যেন ফোন বাজলে ও শুনতে পাবে না।

নিজে থেকে রুণুকে ফোন করতে একটুও সাহস হয় না।

প্রেসের সকলেই চেনা, কেউ কেউ কাজ করতে করতেই অরুণের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। হাতে কাজ না থাকলে কেউ বা কাছে এসে বসে, গল্প করে। অরুণ হাসে, সাড়া দেয়, হুঁ হাঁ করে, কিন্তু তাদের একটা কথাও ওর কানে যায় না। ওর মন শুধু টেলিফোনটার দিকে। কখন রিং রিং রিং করে বেজে ওঠে। আর মাঝে মাঝে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে, দেখে হতাশ হয়ে পড়ে।

এ এক অদ্ভুত জ্বালা। সমস্ত দুপুর, কখনো নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও অরুণ অপেক্ষা করে। মনে মনে প্রার্থনা করে, যেন টেলিফোন আসে।

—নাঃ, টেলিফোন আসবে না। দীর্ঘশ্বাসের স্বরে একবার অস্ফুটে উচ্চারণ করে ফেললো অরুণ। বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা বিশুদ্ধ যন্ত্রণায়।

আসবে না, আসবে না। সিঁড়ির মাঝখানে ডাঃ রুদ্রর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই বুকফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। পর পর কয়েকটা দিন ও ছুটতে

ছুটতে এসেছে, সব কাজ ভুলে, সব কাজ ফেলে রেখে। তারপর অপেক্ষা, অপেক্ষা। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে, টেলিফোনটার দিকে চোখ রেখে। কিন্তু রুণুর ডাক আসে নি, আসে নি।

এক-একদিন লোভ হয়েছে ও নিজেই ফোন করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়। কি জানি, রুণুর মামীমা হয়তো গলা শুনেই টেলিফোন কেটে দেবেন রাগে ঘৃণায়। 'ছি ছি, এই ছেলেটাকে ভালো ভেবেছিলাম!' কিংবা রুণু চিৎকার করে বলবে···

কি বলবে কিছুই জানে না অরুণ।

শেষ অবধি পারলো না। নিজেই ফোন করলো।

রুণুর গলা তেমনি মিষ্টি। ভরা কলসীর মত।

অরুণ যেন কিচ্ছু জানে না, ডাঃ রুদ্রকে চেনে না, ও কোন অন্যায় করে নি।—রুণু, আমি আর পারছি না, পারছি না।

—বাঃ, আমি তো যাবো। এখনই ফোন করতাম। আপনার আজ জন্মদিন। রুণু হাসি-হাসি গলায় বললে।

আঃ, এক বুক আনন্দ যেন ভোরবেলার রাস্তায় হোসপাইপের জল ছড়ালো।

জ্বর ছেড়ে গেল শরীর থেকে। ভয় ছেড়ে গেল। ডাঃ রুদ্র নিশ্চয় স্পষ্ট চিনতে পারেন নি। ও তো মা'র মৃত্যুতে মাথা কামিয়েছে। ও তো সেদিন ধুতিপাঞ্জাবি পরেছিল। কি আজেবাজে ভয় পেয়েছিল অরুণ। ও যদি অপরাধী হয়, ডাঃ রুদ্রও তো অপরাধী। উনি কোন্ মুখে বলবেন, অরুণ একটা স্কাউণ্ড্রেল! মন হাল্কা হতেই হেসে ফেললো অরুণ। ডাঃ রুদ্র নিশ্চয় ওকে স্কাউণ্ড্রেল ভেবেছেন। ভেবেছেন, উর্মির জন্যে অরুণই দায়ী।

—বাঃ, আমি তো যাবো···আপনার আজ জন্মদিন।

তা হ'লে মামীমা নিশ্চয় কাছেপিঠে আছেন। আপনি, আপনি, আপনি। অরুণের খুব মজা লাগে যখনই বাইরের কেউ সামনে থাকে, রুণু তখন 'আপনি' বলে, যেন ওদের মধ্যে কিচ্ছু নেই।

একদিন সুজিত ছিল, জোর করে সঙ্গে এসেছিল, আর রুণু বার বার ওকে 'আপনি' বলছিল।

সুজিত চলে যাবার পর কিন্তু রুণু হেসে উঠেছিল।—বাব্বা, দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ। এতক্ষণে 'তুমি' বলতে পাবো।

শুনে ভীষণ ভাল লেগেছিল। এখন সুজিত কিংবা অন্য কেউ থাকলেও ও 'তুমি' বলে। শুধু মামীমাকে···। 'আপনার আজ জন্মদিন—আপনার আজ জন্মদিন।' শুনে ভীষণ ভাল লাগলো।

সত্যি, অরুণ নিজেও ভুলে গিয়েছিল আজ ওর জন্মদিন। শুধু জন্মদিন! পৃথিবীটা যে আছে, চলছে, কলকাতা শহরটা, তাও যেন টের পায় নি। সেই পাটনা গিয়ে যেমন মনে হয়েছিল কলকাতা শহরটা ওকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, তেমনি। না, ঠিক তেমনি নয়! আগে মনে হতো, শুধু রুণু আছে, আর কিচ্ছু নেই। এখন—শুধু একটাই ক্ষোভ—হয়তো রুণু নেই। আর সব আছে! আছে বলেই বিরক্তি, রাগ। কেন আছে, কেন? রুণু না থাকলে আর সব কিছু কেন থাকবে?

—যাচ্ছি, এক্ষুনি যাচ্ছি।

মেট্রোর সামনে এসে দাঁড়ালো অরুণ। এখন দুপুর। চমৎকার ফিকে মেঘের ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা আর স্বচ্ছ, আলো-ঠিকরোনো কাঁচের আকাশ। ওপারে গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো একটা গাড়ির বনেটে বসে ভিখিরি মেয়েটা রেলিঙে বসা ভিখিরি ছেলেটার সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে কথা বলছে। দুটো রুক্ষু কাক উড়ে উড়ে ঝগড়া করছে।

রুণু এলো। কিন্তু প্রতিবারের মত ওর মুখ হাসিতে উচ্ছল হলো না। আরে দূর, অরুণের মনে শুধু সন্দেহ আর সন্দেহ। এই ভিড়ে, বাসে, গুমোট গরমে মেজাজ ঠিক থাকে না, রুণু কিনা হাসবে!

অরুণ বললে, দুটো টিকিট কেটে রেখেছি।

রুণু ঘাড় কাত করে সায় দিলো।

তারপর অরুণ অনেক কথা বললো। আনন্দে, খুশিতে। খেয়ালই করলো না, রুণু শুনছে কি শুনছে না।

সিনেমা হলে ঢুকতে গিয়ে রুণু নিঃশব্দে একটা সিগারেট লাইটার দিলো অরুণকে। ওপরে লাল রঙের চমৎকার একটা মনোগ্রাম।

হলের ভিতরে ঢুকে অরুণ লাইটারটা জ্বাললো, নেবালো। বললে, খুব সুন্দর। প্রথমবার জ্বাললাম, এর আলোয় তোমার মুখ দেখবো বলে।

রুণু হাসলো কিনা বোঝা গেল না।

আর পরমুহূর্তেই অরুণের মনে পড়ে গেল, ছেঁড়া টিকিট দুটো। সিনেমার টিকিটের বাকী অংশ দুটো এখনো ওর পকেটে।

ছবি শুরু হলো তখনো রুণু চেয়ে নিলো না। আহা বেচারী, বোধ হয় ভুলে গেছে। অরুণের জন্মদিনের আনন্দে, সিগারেট লাইটারটা অরুণের খুব পছন্দ হয়েছে এই আনন্দে টিকিট দুটো চেয়ে নিতে ভুলে গেছে। বাড়ি ফিরে যখন ওর দেরাজ খুলবে, রুণুর জীবনের টুকরো টুকরো সুখের দেরাজ, তখন নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে। ভুলে গিয়েছিল বলে তখন নিশ্চয় ওর মন খারাপ হয়ে যাবে।

অরুণ রুণুকে একটুও দুঃখ দিতে চায় না। অরুণের জন্যে রুণুর কখনো মন খারাপ হবে ভাবতে ভাল লাগে না।

অরুণ নিজেই তাই বললে, এই! টিকিট দুটো নেবে না?

বলে হাসলো অরুণ, টিকিট দুটো এগিয়ে দিলো।

রুণু অলস হাতে, যেন অনিচ্ছায় টিকিট দুটো নিলো, তারপর ধীরে ধীরে, যেন নিজের মনকেই বললে, রাখি না, আজকাল আর রাখি না।

অরুণের বুকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। মনে হলো রুণু যেন ওকে অপমান করার জন্যেই বললো কথাটা। যেন ঐ টুকরো কাগজের বা অরুণের উপস্থিতির আজ আর কোন দামই নেই। তা হ'লে কি···

—অয়নের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলো সেদিন। রুণু একসময় বললে।

আর অরুণের লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হলো।

—অয়নকে ঠিক এমনি একটা লাইটার দিয়েছি। রুণু আরেক সময় বললে।

অরুণের মনে হলো অয়নের নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে রুণু যেন জল-ভরা সোনার কলসী কণ্ঠস্বরে আরো একটু আন্তরিকতা ঢেলে দিলো।

অরুণের মনে হলো লাইটারটা অয়নকে দেবার সময় নিশ্চয় আন্তরিকতাও দিয়েছে রুণু। ওকে শুধুই একটা লাইটার।

বিদায় নেবার সময় অরুণ জিজ্ঞেস করলে, আবার কবে আসছো?

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে গেল রুণুর। বললে, কি জানি। বললে, জন্মদিন বলেই এলাম।

রুণুর বাসটা যতক্ষণ দেখা গেল, অরুণ সেদিকে তাকিয়ে দেখলো। বেশীক্ষণ দেখা গেল না। ব্যথায়, অপমানে অরুণের চোখ ঝাপসা হয়ে গেল।

'বৃষ্টি, আমার বড় ভয় করে। কেবলই মনে হয় তুমি আমার কাছে-কাছে থাকবে না।'

'বৃষ্টি, জানো, আমাকে কেউ কোনদিন ভালবাসে নি। এতদিন আমি নিজেকে ঘৃণা করতাম, এখন আমি নিজেকে ভালবাসি।'

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। রুণুর বুকের ভেতরটা তখনো রিমঝিম বৃষ্টির মত নাচছে।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রুণু একদৃষ্টে অরুণের চলে যাওয়া দেখছিল। গলির মোড় থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে অরুণ একবার ফিরে তাকালো। রুণু জানতো, অরুণ ফিরে তাকাবে। যদিও এত দূর থেকে ওরা পরস্পরের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাবে না, তবু রুণু একটু মিষ্টি হাসলো। অরুণও নিশ্চয় একটুখানি হেসেছিল।

বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ রেখে ফিরে আসার পর একদিন ওর ভাল শাড়িখানা ছেড়ে খাটের এক পাশে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। সাজপোশাক করে যাবার সময় শাড়িতে, কানের লতিতে, ব্লাউজে একটুখানি সেণ্ট লাগিয়েছিল, কিন্তু ফিরে আসার পর সেণ্টের গন্ধ আছে বলে মনেই হয় নি। অথচ সকালে ঘুম ভাঙতেই সেই সেণ্টের গন্ধটা আরো নরম হয়ে নাকে এসে লেগেছিল। বিয়েবাড়ির সমস্ত আনন্দ, উল্লাস এক ঝলকে মনে পড়ে গিয়েছিল। অরুণ চলে যাওয়ার পর তেমনি একটা বাসী সেণ্টের গন্ধে ওর সমস্ত মন উন্মনা হয়ে গেল।

অনেকগুলো টুকরো টুকরো ঘটনা ওর মনে পড়ে গেল। 'বৃষ্টি, তুমি কোনদিন যদি আমাকে ছেড়ে যাও আমি বাঁচবো না।' চোখের পাতায়, ঠোঁটে, কপালে যেন সেই বৃষ্টির দিনের উত্তাপটুকু এখনো

লেগে আছে। হাতের ঘড়িটা খুলে রাখার পরেও যেমন মনে হয় হাতে লেগে আছে, এও তেমনি। কিংবা কানের দুলের মত। ইস্কুলে পড়ার সময় একদিন একটা দুল কোথায় পড়ে গিয়েছিল, ও টের পায় নি। বাড়ি ফিরে মা'র কাছে ভীষণ বকুনি খেয়েছিল। দুল হারানোর জন্যে যত-না বকুনি, সোনা হারানোর জন্যে আরো বেশী। সোনা হারানো নাকি খুব ভয়ের। অলক্ষুনে কিছু ঘটবে, তার আভাস। শুনে রুণুর নিজেরও খুব ভয় হয়েছিল।

বাবা চিঠি লিখেছে, মা নাকি খুব ভুগছে, আর ভুগছে। লিখেছে, মায়ের সেই তিন ভরি সোনার হারটা পাশের বাড়ির মিনা-বউদি তার বোনের বিয়েতে যাবো বলে নিয়ে গিয়েছিল, এখন আর ফেরত দিচ্ছে না। মা'র ওপর রুণুর ভীষণ রাগ হলো, বাবা তো কতবার বলেছে, আজকালকার দিনে কাউকে অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই।

নন্দিনী একটা ক্যাবলা মেয়ে, বিরামকে বিশ্বাস করে ঠকেছে।

আজ সকালে, হ্যাঁ, আজ সকালেই তো রুণু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল রেলিঙে ভর দিয়ে। চোখ কিছু দেখছিল না। একটা উদাস বিষণ্ণতা কেন জানি ওর বুকের ওপর চেপে বসেছিল। ও লক্ষ্যই করে নি, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পরমদা হঠাৎ ডাকলেন, রুণু শুনছো! নন্দিনীকে নিয়ে এসেছি কাল, তুমি যেও একবার।

রুণুর মুখ এক নিমেষের জন্যে ঝকঝক করে উঠেই আবার নিবে গেল। ঘাড় নেড়ে বললে, আচ্ছা যাবো।

প্রথমটা ওর একটু অস্বস্তি লেগেছিল, কিন্তু পারলো না, তখনই চটি পায়ে গলিয়ে গিয়ে হাজির হলো।

দুটো লোক পাশাপাশি যেতে পারে এমনি সরু একটা ব্লাইণ্ড লেন, রাস্তার মাঝে মাঝে দু'-চারটে জল-ভরা গর্তে দু-চারখানা ইট জেগে আছে। শাড়ি বাঁচিয়ে চটি বাঁচিয়ে একতলার দরজার কড়া নাড়লো ও।

—এ কি চেহারা হয়েছে রে তোর। রুণু নন্দিনীকে দেখেই বলে

উঠলো। মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে আপনা থেকেই নন্দিনীর সিঁথিতে চোখ পড়লো। সিঁদুর আছে কি নেই বোঝা গেল না। সিঁদুর লুকিয়ে রাখা আজকাল অবশ্য মেয়েদের ফ্যাশন। দেখলে রুণুর বিচ্ছিরি লাগে। ওর বিয়ে হ'লে ও খুব চওড়া করে সিঁদুর দেবে, আর কপালে ডগডগে একটা সিঁদুরের টিপ পরবে।

কিন্তু নন্দিনীর ওটা ফ্যাশন নয় ও জানে। তাই নিওন-আলোর বিজ্ঞাপনগুলো দিনের আলোয় যেমন ম্যাটমেটে আর ফ্যাকাশে লাগে, নন্দিনীকে ঠিক তেমনি লাগলো।

রুণুকে দেখে নন্দিনী অনেক দিন পরে হাসবার চেষ্টা করলো।

নন্দিনীর বউদির মুখের হাসিটাও বেশ আদুরে আদুরে লাগলো। —এসো রুণু, তুমি তো আর আসোই না।

নন্দিনী অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।—আমি এখন কি করি বল তো রুণু।

রুণু সবই জানে, সবই শুনেছে। ও দুম করে বলে উঠলো, ডিভোর্স কর।

নন্দিনী একটুক্ষণ চুপ করে ধীরে ধীরে বললে, আমার জীবন তো নষ্ট হয়েছেই, ওর জীবনটা নষ্ট করে কি লাভ। গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে ডিভোর্স অনেক ভাল।

নন্দিনীর বউদি চুল খুলে চুলে তেল ঘষতে ঘষতে শিশিটা রাখতে এলেন। এসে শুনলেন কথাটা। রুণুর মনে পড়লো, নন্দিনীর চলে যাওয়ায় বউদির কি রাগ, কি রাগ! ওর ভয় হলো এখনই হয়তো চিৎকার করে বলবেন, যেমন দাদা-বউদির সম্মান রাখো নি, এখন বোঝো।

না, বউদি তা বললেন না। কাছে এসে বললেন, পাগল মেয়ে, ও নিয়ে মন খারাপ করতে নেই। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নন্দিনী আর কোন কথা বলে নি। আর রুণুর তখন মনে হয়েছিল, ওর যদি এমনি একটা বউদি থাকতো, ও তাকে অরুণ

সম্পর্কে সব—সব বলতো। তার ওপর নির্ভর করতো।

রুণুর অনেক কিছু বলার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু নন্দিনীকে নিজের সুখের কথা কিচ্ছু বলতে পারে নি। ভেবেছিল, ও বেচারার এখন শুনতে ভালোও লাগবে না।

অরুণ চলে যাওয়ার পর সকালের ঘটনাটা হঠাৎ একবার মনে পড়লো, ইচ্ছে হলো একবার পরমদার বাড়ি যায়। নন্দিনীকে গিয়ে বলে, অরুণ এসেছিল; গিয়ে বলে, মামীমা বলেছেন, ছেলেটি খুব ভাল রে।

কিন্তু সন্ধ্যের পর বের হলেই মামীমা বড় রাগ করেন। যেদিন অরুণের সঙ্গে দেখা করে, একটু দেরি হয়ে যায়, মামীমা বলেন, বোন দুটোকে পড়াতে যদি না পারো, বলো না, মাস্টার রেখে দিই।

আসলে রুণু জানে, অন্ধকারকে মামীমা বড় ভয় করেন।

একটা কথা মনে পড়তেই রুণুর হাসি পেলো। চোখের পাতায়, ঠোঁটে, কপালে ও যেন আরেকবার অরুণের উত্তাপ অনুভব করলো। পিঠের ওপর অরুণের দুটি হাত, আর বৃষ্টি, অঝোর বৃষ্টি। অরুণটা একটা বদ্ধ পাগল। পাগলের মত ওকে ভালবাসে। একদিন ওকে ঝড়ের মত ভালবেসেছিল। এখনো মাঝে মাঝে ও সুখ-সুখ আনন্দে বুকের মাঝখানের তিলচিহ্ন, ঠোঁট, কপাল, চোখের পাতা দুটি আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে।

চোখ পাকিয়ে অরুণের চোখের রাগটা নন্দিনীকে একবার না দেখাতে পারলে আনন্দ নেই। দেখিয়ে দু'জনে মিলে খুব হাসবে একদিন। কিন্তু রুণুই বা কি করবে। অরুণের কোন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে নাকি। তখনো ঝনঝনে রোদ, দূরে দূরে লোক রয়েছে, বললো কিনা 'কেউ দেখছে না। কেউ দেখছে না।' রুণু রেগে গিয়ে বলেছিল, তা হ'লে আর কোনদিন আসবো না। তারপর আরেক দিন, রুণু তখন

বাবার চিঠি পেয়েছে, অভাব—অভাব, মা'র অসুখ, ছোট ভাইটা ফেল করেছে। মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ। অরুণ ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসতেই ও কান্না গলায় বলেছিল, আজ কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ব্যস, তারপর থেকে অরুণ একদিনও কিছু চায় নি। একদিনও না। রুণু জানে, অরুণ ভিতরে ভিতরে রেগে আছে। সেজন্যে ওর কষ্ট হয়। আবার এক-একদিন ভয় হয়, অরুণ বোধহয় ওর কাছে কিছু চায় না। কে জানে, এর মধ্যে হয়তো অন্য কেউ কিংবা উর্মি···আচ্ছা, রুণু কিই বা করতে পারে। ও কি মুখ ফুটে বলবে নাকি। ওর অবশ্য এক-একদিন ইচ্ছে হয়, ভাবলে হাসি পায়, বাঃ রে, তা হোক না, কেই বা জানবে, ও সুযোগ পেলে ঝট করে একদিন অরুণকে নিজেই চুমু খেয়ে দেবে। ব্যস, তারপর দেখা যাবে কার কত রাগ থাকে।

'ছেলেটি বেশ ভাল, রুণু, একদম আজকালকার ছেলেদের মত নয়।' সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে একটু আগে বলা মামীমার কথাটা ওর কানে বাজলো। মাথা ন্যাড়া করলে কত লোককে তো কুচ্ছিত লাগে, অরুণকে খুব সুন্দর লাগছিল। তাও এখন তো একটু একটু চুল গজিয়েছে। এর আগে আরো সুন্দর ছিল।

—হ্যাল্লো রুণু, এসো না এদিকে একবার! রুণু সিঁড়ির মুখ থেকে নিজের ঘরের দিকে পালাতে যাবে, ডাঃ রুদ্র ডাক দিলেন।

মামাবাবু এখনো কল সেরে বাড়ি ফেরেন নি, যতক্ষণ না ফেরেন ওর বড় ভয় করে। আর মামীমা যেন কি, এত ভালমানুষ, কিছুই বোঝেন না। কেন, বলতে পারেন না, রুণুর এখন পড়ার সময়!

ডাঃ রুদ্রর ডাক শুনে একবার দেখা না দিলেই নয়। রুণু ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে ডাঃ রুদ্র প্রশ্ন করলেন, ছেলেটি কে?

এতক্ষণে রুণুর মনে পড়লো, অরুণের পিছনে পিছনে ও যখন

সিঁড়ি বেয়ে নামছিল, ডাঃ রুদ্র তখন উঠে আসছিলেন। দেখে বোধ হয় অবাক হয়েছেন, কিংবা হিংসায় জ্বলছেন।

ছেলেটি কে? কে তা জানার দরকার কি মশাই আপনার। মনে মনে ভাবলো রুণু, মজা পেলো, রাগ হলো। একবার ভাবলে গালে থাপ্পড় মারার মত করে বলে, আমি ওকে ভালবাসি, ও আমাকে ভালবাসে, ব্যস, আর কিছু জানতে চান? কিন্তু সত্যি সত্যি তা তো আর বলা যায় না। শুধু বললে, আমার বন্ধু।

পরমুহূর্তেই রুণু দেখলো, ডাঃ রুদ্র মাথা নীচু করে হাতে সদ্য-ধরানো সিগারেটটা অ্যাশ-ট্রের ওপর রাগ চাপার মত জোরে চেপে ধরে নিবিয়ে ফেলে দিলেন। ডাঃ রুদ্রর হাতটা তখন বোধ হয় একটু কেঁপে গিয়েছিল।

তা দেখে খুব হাসি পেলো রুণুর।

ডাঃ রুদ্র অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যাও, তোমার পড়ার সময় হয়েছে বোধ হয়।

রুণুর ভিতরটা তখন কুলকুল করে হাসছে।

রুণুর মনে হয়েছিল অরুণকে ও জানে। কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু জানে না।

প্রতিদিন দুপুরে, তখন তো রুণুদের কলেজ ছুটি, বার বার টেলিফোনটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মামীমা ওধারের ঘরে ঘুমোচ্ছেন; উঁকি দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে রুণু। আস্তে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা ছুঁয়েছে। আঃ, রিসিভারটা ছুঁলেও সুখ, বুকের জ্বালা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, রিসিভারটা যেন অরুণের হাত। কিন্তু পরক্ষণেই অভিমানে রাগে চোখ ঠেলে জল এসেছে। না, ফোন করবে না ও, দেখা করবে না আর। একদিন তো রিসিভার তুলে টিকলুদের প্রেসের নম্বরটা ডায়াল করে ফেলেছিল, কিন্তু রিং হওয়ার কর্‌র্‌র্‌ কর্‌র্‌র্‌ শব্দ

শুনেই ঝট করে নামিয়ে রেখেছিল।

প্রথম সেই বৃষ্টির বিকেলে যেদিন অরুণ ওকে ভালবাসার ছোঁয়া দিয়েছিল, সেদিন রুণু শুধুই রোমাঞ্চিত হয়েছিল, নতুন এক অভিজ্ঞতায় অবাক হয়েছিল। শরীর শরীরকে এমনভাবে আদর করতে জানে, শরীরে এত সুখ লুকিয়ে আছে জানতো না। রুণু যেন এক তাল কাদার মত ছিল, কুমোরের হাতে রাতারাতি প্রতিমা হয়ে গিয়েছিল। হাতের ঠোঁটের আবেগের স্বাদটুকু তখনো মনের মধ্যে রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি হয়ে নাচছে।

—এই, ছাখো তো চুল ঠিক আছে কিনা, টিপ?

আরেক দিন প্রিন্সেপ ঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থেমে পড়ে রুণু জিজ্ঞেস করেছিল। তারপর ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে একটু লাগিয়ে নিয়েছিল।

তখন অনেক স্বপ্ন ছিল রুণুর মনে।

কিন্তু অরুণের ওপর অবিচার করছে না তো! ডাঃ রুদ্রকেই বা বিশ্বাস কি। বাঃ, বিশ্বাস না করে উপায় আছে নাকি।

তখনো প্রচণ্ড রোদ্দুর। রুণুর সমস্ত শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছে। মুখ, গলা, বুকের ভিতরটা তেষ্টায় শুকিয়ে আছে। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই, কলেজ থেকে বেরিয়ে বাস-স্টপ অবধি এসেছে, আর যেন অপেক্ষা করতে পারছে না। পর পর কয়েকটা বাস এলো, ভিড়ে বোঝাই, একটাতেও উঠতে পারলো না ও। ওর সমস্ত মুখ তখন ঘামে ভিজে গেছে, ব্লাউজের পিঠ।

—রুণু চলে এসো। চলে এসো। ডাক শুনে চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখলো, ডাঃ রুদ্রর গাড়িটা ঠিক ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে।

হাত বাড়িয়ে ডাঃ রুদ্র দরজাটা খুলে দিতেই ও মুখে হাসি এনে গাড়িতে উঠে বসলো। একটুও ভয় করলো না। বরং এই অসহ্য রোদ্দুরে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে গাড়িটা অনেক

লোভনীয় মনে হলো।

না, সেদিন ডাঃ রুদ্রর গাড়িতে না উঠলে হয়তো এত কষ্ট পেতো না রুণু। এমন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যাওয়ার মত অসহ্য বেদনায় ভেঙে পড়তো না।

নিজের মনকে শক্ত করলো রুণু। কখনো না, কখনো না। যত লোভই হোক, রিসিভারটা ছোঁবে না। কোনদিন আর অরুণকে ফোন করবে না। ছি ছি। নিজের ভুলের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিলো।

রুণুর বুকের মধ্যে একটা ব্যথার কনকনানি পাঁজর থেকে পাঁজরে ঘুরে বেড়ালো। ওর মনে হলো যেন দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। আঃ, মৃত্যুর মত নির্ভাবনা আর আছে নাকি।

কিন্তু আজ ও যেন কিছুতেই নিজেকে শাসন করতে পারছে না। নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। এর আগেও যখনই অরুণকে একটা ফোন করার জন্যে ছটফট করেছে, অরুণের সঙ্গে দেখা করার জন্যে, তখনই ডাঃ রুদ্রর চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথাগুলো মনে পড়েছে। 'বিশ্বাস করো রুণু, তোমাকে কিছুই জানাবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু…'

চোখ ফেটে জল এসেছে সে কথা মনে পড়তেই। বালিশে মুখ ডুবিয়ে ও গুমরে গুমরে কেঁদেছে।

কিন্তু শেষ অবধি সব প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল, ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ যেতেই। অরুণ, অরুণ, আজ তোমার জন্মদিন।

—জন্মদিনে মাকে আমার অন্যরকম লাগে। জানো রুণু, ঐ একটা দিন বুঝতে পারি মা আমাকে কত ভালবাসে।

রুণুর হঠাৎ মনে হলো, এবার তো অরুণের মা নেই। ওকে কে কতখানি ভালবাসে, কেউ ওকে ভালবাসে কিনা, এবার আর ও জানতেও পারবে না।

কি বোকা রুণু! আরে, ডাঃ রুদ্রর দেখানো সই-করা কাগজটা

তো জাল হতে পারে। কিংবা অরুণের তো কিছু বলার থাকতে পারে। আমরা কতটুকুই বা বুঝি মানুষকে।

রুণু মনে মনে প্রার্থনা করেছে অরুণের কিছু যেন বলার থাকে। দোষ, অন্যায়—মানুষ কখন কি করে ফেলে। তারপর সারা জীবন ধরে শাস্তি পেতে হয়। না, অরুণ যদি···অরুণ হয়তো দেখা হলেই সব কথা বলবে, হয়তো···বাঃ, অরুণ ওকে এত তীব্রভাবে ভালবাসে, এত কষ্ট পায়, তার একটা অন্যায় ক্ষমা করতে পারবে না রুণু?

পর পর কয়েকটা দোকান ঘুরে সুন্দর দেখে একটা লাইটার কিনলো রুণু।

অয়নকেও ঠিক এমনি একটা লাইটার দিয়েছিল সেদিন। লাল মনোগ্রাম করা।

অয়ন খুব খুশী হয়েছিল। রুণু খুশী হয়েছিল। রুণুর মনে হয়েছিল অয়নকে ও আরো গভীরভাবে ভালবাসতে শুরু করেছে। অথচ তখন তো অরুণের ভালবাসায় ওর বুক ভরে ছিল।

এখন ওর কাছে অয়ন আবার তুচ্ছ হয়ে গেছে। অরুণের মত তুচ্ছ। কারণ, এখন অরুণের ওপর ওর আর কোন বিশ্বাস নেই। সব মিথ্যে, সব মিথ্যে অভিনয় শুধু।

তবু মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা, ডাঃ রুদ্রর সব অভিযোগ মিথ্যে। দেখা হওয়ার পর অরুণ নিশ্চয় কিছু বলবে। টেলিফোনে অরুণের গলার স্বর তা না হ'লে এমন বুক-ফাটা যন্ত্রণার মত শোনাবে কেন। অরুণ নিজেই ফোন করবে কেন?

কিন্তু অরুণের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সমস্ত শরীর রাগে তিক্ততায় বিষাক্ত হয়ে উঠলো। রুণু একটুও সহজ হতে পারলো না।

অরুণ ওকে দেখে এত অপ্রতিভ হলো কেন? অরুণ সহজ হতে পারছে না কেন? ও বলছে না কেন, ডাঃ রুদ্রকে আমি চিনি। কিংবা 'রুণু, আমি জীবনে একটা সাংঘাতিক অন্যায় করে ফেলেছিলাম।'

রুণু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, আজকের দিন, আজ অরুণের জন্মদিন, আজ ও অরুণকে কিছুই জানতে দেবে না। কোন অভিযোগ করবে না। ও নিজেই সরে যাবে, কষ্ট পাবে, তবু মুখ ফুটে কিছু বলবে না।

অরুণের উপস্থিতিটুকুও ও আজ সহ্য করতে পারছে না কেন। ঘৃণা? ঘৃণা হচ্ছে?

ডাক্তার রুদ্রকেও ওর ঘৃণা হয়েছিল। ভিলেন? না, লোকটার 'ভালবাসি' বলার ধরনটাই হয়তো ঐ রকম।

সিনেমা হলে পাশাপাশি বসেও রুণুর মনে হলো অরুণের কাছ থেকে ও যেন অনেক দূরে সরে গেছে। মনে হচ্ছে ওদের প্রেমের মৃত্যু হয়ে গেছে।

রুণুর দেওয়া লাইটারটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো অরুণ, খুশী-খুশী গলায় প্রশংসা করলো।

রুণু মনে মনে বললো, তোমার কোন প্রশংসা আর আমাকে ছুঁতে পারবে না।

লাইটার জেলে সেই আলোয় রুণুর মুখ দেখলো অরুণ।

আমার সেই ভালবাসার মুখ তুমি আর কোনদিন দেখতে পাবে না, রুণু ভাবলো।

আর সেই সময় সিনেমার টিকিট দুটো, ছেঁড়া টিকিট দুটো আগের মতই অরুণ এগিয়ে দিতে গেল রুণুকে।—এ দুটো নেবে না?

—কি হবে? শূন্যতার দীর্ঘশ্বাসের মত লাগলো কথাটা।

রুণু মনে মনে বললে, এ দুটোর এখন আর কোন দাম নেই, কোন দাম নেই।

অনিচ্ছার হাত বাড়িয়ে টিকিট দুটো নিয়েছে রুণু, কিন্তু ও জানে, ওর সুখের দেরাজে আর কোন নতুন সুখ নেই, স্মৃতি নেই।

এক তাল কাদা কুমোরের হাতের ছোঁয়া পেয়ে একদিন প্রতিমা হয়ে উঠেছিল, আজ সে বিসর্জনের প্রতিমার রূপ হারানো, সুখ

হারানো এক তাল কাদামাটি।

প্রথম যেদিন ডাঃ রুদ্রর কাছে সব শুনেছিল, সেদিন অরুণকে কি ভয় কি ভয়, ভয় এবং ঘৃণা, ঘৃণা এবং রাগ। তখন নির্বিকার, মৃত, প্রাণহীন।

ছবি শেষ হওয়ার পর যখন আলো জ্বলে উঠলো, রুণু হঠাৎ দেখতে পেলো টিকিটের ছিন্ন অংশ দুটো ও কখন নিজেরই অজান্তে ফেলে দিয়েছে। পায়ের কাছে তারা লুটোচ্ছে। ও দুটোর প্রতি ওর আর কোন আগ্রহ নেই। পায়ে ঠেলে টুকরো দুটোকে রুণু সরিয়ে দিলো।

ভাঙা জাহাজের মত, বিসর্জনের প্রতিমার মত রূপ হারানো, সুখ হারানো এক তাল মাটি হয়ে রুণু হল থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর সারাটা পথ বুকের মধ্যে ব্যথা, বুকের মধ্যে হতাশ যন্ত্রণা। প্রতিমা বিসর্জনের পর প্যাণ্ডেলের নীচে যেমন খাঁ খাঁ শূন্যতা, রুণুর বুকের মধ্যেও তেমনি।

সে সময় রুণুকে দেখলে মনে হতো ওর চোখ দৃষ্টি হারিয়েছে, ওর মন অনেক উঁচুতে আকাশে ডানা-ভাঙা শঙ্খচিল, ওর শরীর রেণু রেণু হয়ে ভেঙে পড়া অবয়বহীন বাতাস, ওর বুকের মধ্যে হতাশ শূন্যতা।

আমি হারিয়ে গেছি, আমার আর কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই।

যন্ত্রের মত অনুভূতিহীন শরীর টেনে টেনে ফিরে এসেছে রুণু। সমস্তক্ষণ ও কিভাবে কাটিয়েছে, কি কথা বলেছে, কিচ্ছু মনে নেই।

রুণুর কেবল ইচ্ছে হচ্ছিল নন্দিনীর কাছে ছুটে গিয়ে ও শব্দ করে কেঁদে ওঠে, ও দু' চোখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে বুকের পাথরটা হাল্কা করে। কিংবা···

যন্ত্রের মত রুণু ওর ব্যাগ ছুঁলো, যন্ত্রের মত কিছু না ভেবেই ওর টেবিলের দেরাজের চাবিটা বের করলো।

এক নিমেষের জন্যে কি যেন ভাবলো, তারপর চাবি লাগিয়ে ও

হঠাৎ ওর সুখের দেরাজ খুলে বসলো।

ওর এতদিনের টুকরো টুকরো সুখের দেরাজ। একটু একটু করে পাওয়া আনন্দের স্মৃতির দেরাজ। আমরা, একালের আমরা তো কোনদিনই পূর্ণতাকে পাবো না। আমি কিংবা অরুণ, নন্দিনী কিংবা বিরাম, কেউ না, কেউ না। আমাদের মধ্যে কোন আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। আমরা তো কিছুই পাবো না, শুধু কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলেছি। দিব্য কিংবা অয়ন কিংবা অরুণ। যা কিছু চেয়েছি, এখনই, এখনই। যা কিছু পাবো খণ্ড খণ্ড। রুণু ভেবেছিল, তা নিয়েই বুঝি বাঁচা যায়। সকলেই তাই ভাবছে, একালের সকলে।

সব ভুল, সব ভুল। টুকরো টুকরো সুখ নিয়ে বুক ভরে না। গোটা জীবনটাকে কোনদিনই আর ছুঁয়ে দেখা হয় না। জীবনকে অনুভব করা যায় না।

ধীরে ধীরে দেরাজটা—রুণুর টেবিলের সেই নিজস্ব দেরাজ—রোমাঞ্চের আনন্দের দেরাজ টেনে বের করলো ও।

অসংখ্য টুকরো টুকরো কাগজ, খামের চিঠি, রঙিন খাম, সেণ্টের গন্ধ, ছোট ছোট জিনিস, একটি একটি স্মৃতি, একটি একটি সুখ। সেগুলোর ওপর অন্ধের মত হাত বুলিয়ে গোটা জীবনটাকে অনুভব করতে চাইলো রুণু। মৃতপুত্রের শবদেহের ওপর শোকার্ত মায়ের হাতের মত রুণুর হাত থরথর করে কাঁপলো। কিন্তু কই···চোখ ঠেলে জল এলো···রুণু একজনকেও ছুঁতে পারছে না, একটি সুখকেও অনুভব করতে পারছে না। সমস্ত ভালবাসা মরে গেছে, সমস্ত সুখ হারিয়ে গেছে।

সেই চুলের রিবনটায় হাত ঠেকলো। কে দিয়েছিল, কোথায় পেয়েছিল, মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না ওর সঙ্গে কোন আনন্দ জড়িয়ে ছিল কিনা। সেই বোনার কাঁটা দুটো এখন শুধুই কাঁটা হয়ে গেছে। ইস্কুলের নিভা দিদিমণি ওকে ভালবাসতো! কেউ ভালবাসে না, ভালবাসে নি। অনুরাধার দাদার সেই বোকামি-ভরা

চিঠি, 'আমি তোমার চেয়ে সুন্দর দেখি নাই'—চিঠিটা অর্থহীন, রুণুর মধ্যে আজ আর কিছুই সুন্দর নেই। ও কোনদিন সুন্দর ছিল না। ভালবাসাই মানুষকে সুন্দর করে, রুণুকে কেউ কোনদিন ভালবাসে নি। অন্ধের মত ঝাপসা দেখছে রুণু, দু' চোখ জলে ভরা। অন্ধের মত সব টুকরো টুকরো সুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো। দিব্যর ছোট্ট চিঠি, অয়নের দু' লাইনের কবিতা, তারের ম্যাজিক একটা। সেই ছোটবেলায় রথের মেলায় কিনেছিল। তারের ম্যাজিকের মতই দুটি মানুষ বন্ধ দরজা দিয়েও ভেতরে ঢোকে। আগল দিয়েও আটকে রাখা যায় না। কিন্তু মানুষ তো মনের ঘর থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। তারের ম্যাজিক, রঙিন রিবন, বোনার কাঁটা এ-সবের আর কোন দাম নেই। চিঠি, কবিতা, রঙিন পালক···

যত্ন করে রাখা সেই রঙিন পালকের খাম, খামে ভরা সেই রঙিন পালকটা হাতে ঠেকলো। ঘন নীল আর আকাশী নীলে মেশামিশি সেই রঙিন পালকটা এর মধ্যে মুখ বুজে পড়ে থেকে থেকে বিবর্ণ হয়ে গেছে। রঙ হারিয়েছে।

আমাদের জীবনে কোন রঙ নেই, রুণু ভাবলো। রঙিন পালকটা বের করে ছুঁয়ে দেখলো। না, কোন অনুভূতি নেই। বালিশে আঙুল বুলিয়ে অরুণের নাম লিখে শুয়ে থেকেও মনে হবে অরুণ দূরে চলে গেছে।

অরুণের চিঠি, কত কত কান্না, প্রার্থনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো রুণু। কিন্তু অরুণকে আজ আর ছুঁতে পারলো না। সব রঙ মুছে গেছে, তার কান্না শুনতে পাচ্ছে না, তার ভালবাসাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

ডুকরে কেঁদে উঠলো রুণু। চোখ বেয়ে গাল বেয়ে নিঃস্বতার বিন্দুগুলো দুঃখের সমুদ্র হয়ে গেল। টুকরো টুকরো সুখ, একটি একটি আনন্দের স্মৃতি আজ রুণুর কাছে একটা বিরাট দুঃখ। একটি একটি সুখ কুড়িয়ে নিতে গিয়ে আমরা সকলেই হয়তো বিরাট দুঃখের মধ্যে ডুব দিচ্ছি।

দেরাজের সব টুকরো টুকরো জিনিস, কাগজের টুকরো, সযত্নে জমিয়ে রাখা খামে-ভরা সিনেমার টিকিটের ছিন্ন অংশগুলো—সব, সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলো রুণু। চিঠি—দিব্যর চিঠি, অয়নের চিঠি, অরুণের চিঠি, অনুরাধার দাদার স্তাবকতা—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলো।

রুণু সমস্ত সুখ, সমস্ত স্মৃতি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলো; তারপর বুকে চেপে বারান্দার রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়ালো। বারান্দার রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উড়ন্ত পাখির খসে-পড়া পালকের মত সেই টুকরো টুকরো স্মৃতিকে বিষাদের হাওয়ায়, রাত্রির আলো-জ্বলা অন্ধকারে উড়িয়ে দিলো। টুকরোগুলো পাখির পালকের মত আলোয়-অন্ধকারে ঝিকমিক ঝিকমিক করতে করতে উড়ে গেল।

—কি হয়েছে রুণু? কাঁদছো কেন? মামীমার স্নেহের হাত ওর পিঠে।

রুণু মুখ তুললো না। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ও কাঁদলো, কাঁদলো, কাঁদলো।

ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, আজ আপনারা যাঁর অভিনয় দেখতে এসেছেন, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তিনি আজ অনুপস্থিত। তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন নতুন একজন।

অরুণ সেই ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে, ও জানতেও পারে নি এ নাটকে ওর কোন ভূমিকা ছিল না।

—কখনো মিউজিক্যাল চেয়ার খেলেছিস টিকলু? আমরা সবাই গোল হয়ে ঘুরছি, ঘুরতে ঘুরতে একবার সুযোগ পেলেই বসে পড়ছি। তখনকার মত মনে হয় ঐ চেয়ারটাই বুঝি আমার। কিন্তু আমাদের জন্যে কোথাও কোন চেয়ার নেই, আমাদের জন্যে কোথাও কোন ভূমিকা নেই। আমরা সবাই ফালতু।

স্টেজের ওপর উঠতে পেয়েছিল অরুণ। স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে ও নাটকীয়ভাবে সংলাপ আউড়ে গেছে, কিন্তু কেউ ওর কথা বুঝতে পারে নি। কারণ, মানুষ কথা বলতে পারে না, কারো কথা বুঝতে পারে না। কিংবা প্রত্যেকেই এক একটা অদ্ভুত ল্যাংগুয়েজে কথা বলে।

অরুণের কথা কেউ বুঝতে পারে নি, অরুণকে কেউ বুঝতে পারে নি। তাই ওকে নেমে আসতে হয়েছে স্টেজ থেকে। অরুণ ফালতু হয়ে গেছে।

সংসারের কাছে বাবা। বাবাকে কেউ বুঝতে পারলো না। এখন বাবা চুপচাপ একা বসে থাকে, একা নিঃসঙ্গ। কেউ বড় একটা কথা বলে না, কারণ বাবার কথা কারো ভাল লাগে না। এ যুগের কোন কিছুই বাবার ভাল লাগে না। অরুণ এক-একদিন দেখেছে, বাবার দুঃখ অনুভব করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ও জানে

না, ও বাবার সঙ্গে কি কথা বলবে। বাবা চুপচাপ একা একা বসে থাকে। কোন-কোনদিন পুরানো কাগজের দলিল-দস্তাবেজের বাণ্ডিল খুলে বসে। কোন-কোনদিন আলমারি খুলে মা'র শাড়ি শাল জামাকাপড় বের করে রোদ্দুরে দেয়, তারপর আবার গুছিয়ে ন্যাপথলিন দিয়ে তুলে রাখে। এক-একদিন মাঝরাত্রে ঘুমের মধ্যে বাবা কেমন একটা শব্দ করে ওঠে। একটা চাপা কষ্ট শব্দ হয়ে বের হয়।

—আমরা সবাই ফালতু রে টিকলু, সবাই ফালতু।

টিকলু পলিটিক্স করতে গিয়েছিল, সেখানেও ফালতু হয়ে গেল। সুজিত পি. ফর্ম. পাসপোর্ট পেয়ে গেছে, দু' দিন বাদেই চলে যাবে। এখানে ওর জন্যে কোন চেয়ার নেই।

ওরা 'কোজি নুকে' বসে ছিল। এখনই আরো খদ্দের এলে এই চেয়ারগুলো ছেড়ে দিতে হবে। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ম দিতে গিয়ে এক-একদিন লিফটে জায়গা পায়। এক-একদিন লিফট্‌ম্যান বলে, ব্যস, ব্যস, আর জায়গা নেই। অরুণ এখন আর রাগ করে না, এখন অপেক্ষা করে।

কিন্তু রুণুর জন্যে অপেক্ষা করেও হয়তো আর লাভ নেই। অরুণ ভাবলো, ভেবেছিলুম একটু একটু করে অনেক কিছু পেয়েছি, পাবো। কিছুই পাই নি, কিছুই পাই নি। টুকরো টুকরো করে কিছুই পাওয়া যায় না। ভেবেছিলাম, যার কাছ থেকে যা পাওয়া যায়—রুণুর কাছ থেকে প্রেম, ঊর্মির কাছ থেকে বন্ধুত্ব···

টিকলু শরীরের মধ্যে ভালবাসা খোঁজে, অরুণ ভালবাসার মধ্যে শরীর চেয়েছিল।

বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট, তবু ফুটপাথের চলমান সুশ্রী মেয়েটির দিকে চোখ গেল, অদ্ভুত চটক আছে মেয়েটার মধ্যে। এক-একবার মনে হয়, অতৃপ্তি থেকে বাঁচবার একটাই উপায়, নতুন কোন অতৃপ্তিতে ডুবে যাওয়া।

সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় অরুণ দেখেছে, বাবা বারান্দায় শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে, সামনে একরাশ বাবলার বীজ। কোত্থেকে এক রাশ বাবলার বীজ কিনে আনিয়েছে, এখন বসে বসে ছুরি নিয়ে বীজগুলোকে পরিষ্কার করছে। এই বর্ষায় বিরাটির সেই জমির চারপাশে বাবলার বীজ পুঁতে দেবার ব্যবস্থা করেছে। চারপাশে বাবলার বেড়া দেবে, গাছ লাগাবে, গাছ।

আমরা সবাই গাছ, চারপাশে বাবলাকাঁটার বেড়া।

—ভাল লাগে না, বাড়িতে ভাল লাগে না। মনে হয় দমবন্ধ হয়ে মারা যাবো। বিরাম ক্ষোভের সঙ্গে বলল, বিয়ে হলো চার দেয়ালের ঘর।

—আর প্রেম সে-ঘরের জানলা নাকি রে? টিকলু রসিকতা করলে।

বিরাম সায় দিলো, যে ঘরে জানলা নেই সে-ঘরে বাঁচা যায় না।

টিকলু হেসে বললে, পটাপট জানলা খুলে নিলেই তো হলো। ও তো টাকার মামলা, টাকা থাকলেই পটাপট জানলা খুলে যাবে।

প্রেম কি—টিকলু তা জানে না। কিংবা জানে। অরুণের হঠাৎ মনে হলো, সেজন্যেই ও প্রেমের দিকে চোখ ফেরাতে চায় না। সেজন্যেই ওর প্রেম জানলা বন্ধ করে।

অরুণ ভাবলো, প্রেম পৃথিবীকে ভালবাসতে শেখায়। প্রেম এসেছিল বলেই ও বেখাপ্পা পৃথিবীকে শুধরে দিতে চেয়েছিল, সুন্দর করতে চেয়েছিল। ওকে কেউ রাস্তা বাতলে দিলো না। নেতারা শুধুই ওদের হাত তুলতে বলে, হাতছানি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ডাকে না। ডাকলে অরুণ নিশ্চয় এগিয়ে যেতো।

কিন্তু এখন ও আবার পৃথিবীটাকে ঘৃণা করতে শিখেছে। নিমগাছটায় এখন আর কোন রূপ নেই, রস নেই। নিমফুলের সুগন্ধ চলে গেছে, এখন শুধুই তিক্ততার পাতায় ভরে আছে গাছটা। অরুণ নিজে।

ধীরে ধীরে ও বিরামকে বললে, ঊর্মির বিয়ে, আসছে শনিবার।

টিকলু ক্ষোভের সঙ্গে বললে, শালা মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের ফুর্তি, আমাদের মাইরি খরচ। বিয়ে মানেই খরচ।

নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে একেবারে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল ঊর্মি।—ওর কি দোষ রে অরুণ, জীবনটাকে তো খাপছাড়া করে দেওয়া যায় না। পদে পদেই তো আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট। এছাড়া আর রাস্তা কোথায়, বল্। তারপর তৃপ্তিতে চোখ ছোট ছোট হয়ে গিয়েছিল ঊর্মির।—বিশ্বাস কর, মাইনিং এঞ্জিনিয়ার আমাকে ভীষণ ভালবাসে।

অরুণের মনে হয়েছিল, আসলে ঊর্মিই মাইনিং এঞ্জিনিয়ারকে ভীষণ ভালবাসে। রুণু ওকে একটুও ভালবাসতো না।

—ঊর্মিদি দারুণ সুইট রে দাদা, চেহারাটা লাভলি। ঊর্মি চলে যাওয়ার পর মিলু বলেছিল।

বাবা বলেছিল, মেয়েটি বেশ।

আসলে বাড়িটা এখন একদম বদলে যাচ্ছে। মা চলে যাওয়ার পর সব বেড়া ভেঙে গেছে। বাবা নতুন করে বেড়া দেবার চেষ্টা করলেও থাকবে না।

ঊর্মিকে ওদের ভাল লেগেছে, বাবার, মিলুর। সকলে বাইরেটাই দেখে। সব শুনলে আঁতকে উঠতো। অথচ অরুণ জানে, তারও আরেকটা ভিতর আছে, আতঙ্কের কিছু নেই।

এদিকে চাকরিতে জয়েন করার পর অরুণের আরেক লজ্জা। সব সময়ে সঙ্কোচ। এতদিন বেকার বলতে লজ্জা ছিল, এখন মাইনের অঙ্কটা। টিকলু-সুজিতদেরও বাড়িয়ে বলেছে, অনেক বাড়িয়ে।

টিকলু বলেছিল, সত্যেনকে মনে আছে? ওর বাবা প্ল্যান করে ছেলেকে মানুষ করেছেন। বি. ই. পাস করে চাকরি পেলো, এখন ছাঁটাই হয়ে গেছে। এখন ও ফালতু।

রুণুর কাছেও অরুণ ফালতু। কারণ রুণু হয়তো অরুণের মধ্যে অয়নকেই খুঁজেছিল।

অরুণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।—টিকলু যাবি?

রুণুর কথা মনে পড়লেই অরুণের বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট হয়। রুণু ওকে বার বার অপমান করেছে। রুণুর কাছে ওর এখন আর কোন দাম নেই।

টিকলু হঠাৎ বললে, প্রেসটা কিছুতেই দেখাশোনা করতে দিচ্ছে না, দিলে বাবার চেয়ে ভাল চালাতাম। বাবা মাইরি আমাকে একটুও বিশ্বাস করে না। আমি যেন বাইরের লোক।

অরুণ আপিসে নতুন ঢুকেছে, সেখানেও ও যেন স্ট্রেঞ্জার। একটা ফালতু লোক হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। মিউজিক্যাল চেয়ারের একটা খালি পেয়ে বসে পড়েছে। কেউ ওকে আপন ভাবে না। যেন বাইরের লোক, ওর কোন যোগ্যতা নেই।

আজ ছুটির দিন। আজ নিশ্চয় রুণু বাড়ি আছে। সব অপমান সহ্য করে আজ আবার একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

অরুণ বললে, টিকলু যাবি?

—কোথায়?

অরুণ দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বললে, যদি ফোন আসে।

টিকলু বললে, আমার কি ফয়দা, আমাকে তো কেউ ফোন করে না।

অরুণের ইচ্ছে হলো বলে, আমাকেও না। কিন্তু বলতে পারলো না। বলতে পারছে না, সেও তো যন্ত্রণা। ওরা রসিকতা করে, ওরা কথায় হিংসে ফোটায়। অথচ নিত্যদিন সুজিত আর টিকলুর কাছে ভাব দেখাতে হয়, অরুণ ঠিক আগের মতই স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

সেই যেদিন—শেষ দিন—সিনেমার ছেঁড়া টিকিট দুটো রুণুকে দিতে গেল, আর রুণু বললে 'কি হবে!' সেইদিনই প্রেম মরে গেছে। তবু প্রেমের সেই শবদেহটার মায়া ছাড়তে পারছে না অরুণ। ও জানতো না, কখন নিজেরই অজান্তে অয়নের সীটে

বসে পড়েছিল। আপিসেও স্বস্তিতে বসতে পারে না, কেবলই মনে হয় কেউ এসে বলবে, এই ওঠ্, ওঠ্, এটা তোর চেয়ার নয়।

না, বহুদিন থেকেই ওর ভয়, ওর অবিশ্বাস। যেদিন প্রথম 'অয়ন' নামটা শুনেছিল।

ডাঃ রুদ্র কি চিনতে পেরেছিলেন? কিছু বলেছেন? বাঃ, তা হ'লে জন্মদিনে এলো কেন রুণু, এসেও কিছু জিজ্ঞেস করলো না কেন।

এতই অবিশ্বাস যদি, তা হ'লে আর ভালবাসা কিসের। যদি সত্যিই ঊর্মির সঙ্গে ওর প্রেম ভালবাসা থাকতো…তুমি সদাসর্বদা অয়নকে মনের মধ্যে রাখো নি? তুমি সরল হাসি দিয়ে বলো, 'অয়নের সঙ্গে দেখা হলো'। যেন ওর মধ্যে কোন অন্যায় নেই। যেন অরুণ কিছুই বোঝে না, ও একটা নির্বোধ।

ভাবতে গেলেই সমস্ত শরীর রাগ হয়ে যায়। আবার এক এক সময় মনে হয়, আমাদের যুগটাই তো এই। পুরোনো ধ্যানধারণা ছাড়তে পারছি না, নতুন সংস্কার গড়ে উঠতে চাইছে। অতীত আর ভবিষ্যৎ যেন গামছার মত নিঙড়ে দিচ্ছে বুকটাকে। অরুণের একটুও ইচ্ছে করে না রুণু অন্য কারো সঙ্গে বন্ধু হয়ে যায়, কারো সঙ্গে হেসে কথা বলে। ও চেয়েছিল, রুণু ওর একার থাক। অথচ, বাঃ রে, ওর নিজেরও তো ঊর্মি বন্ধু, যে-কোন একটা মেয়ে এগিয়ে এসে আলাপ করলে, ও খুশী হয়ে উঠবে। তবে?

রুণু ঊর্মিকে সহ্য করতে পারে নি, অরুণ সহ্য করতে পারছে না অয়নকে। অথচ ওরা আজকের জীবনে এসে গেছে, সরিয়ে দেবার উপায় নেই।

অরুণের এক-একদিন অসহ্য শূন্যতার মুহূর্তে মনে হয় রুণুকে সব বলে ফেলে বুক হাল্কা করে নেবে।

ওর মুখ দেখে টিকলু একদিন বলেছিল, কি রে, কেটে গেছে নাকি? রুণু কি ভোকাট্টা হয়ে গেছে?

সুজিত হেসেছিল।—ভাল করে আরেক দিন আলাপও করালি না। আগলে আগলে রেখে লাভ হয় না গুরু, কোথাও না কোথাও নেপো একজন আছেই।

টিকলু বলেছিল, গোলি মারো রুণুয়াকে, নতুন একটা ধর। ও থাকে না রে, থাকে না।

অরুণ কি আর করবে, বুকের মধ্যে কষ্ট চেপে মুখের ওপর হাসি ছড়িয়েছে।

দিনের পর দিন আশায় আশায় কাটিয়েছে টিকলুদের প্রেসে টেলিফোনটার কাছে বসে। যদি ফোন আসে, যদি ফোন আসে। আসে নি। নিজে ফোন করবে ভেবেছে কখনো, পরক্ষণেই ভয় এসে ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। যদি ডাঃ রুদ্র কিছু বলে থাকেন!

দুপুরে ফোনটার কাছে গিয়ে বসলেই কম্পোজিটারদের কেউ এসে গল্প জুড়ে দেয়। সারা গা চিড়বিড় করে, বিরক্ত হয় অরুণ। কিন্তু বলতে পারে না। দুঃখের মধ্যে ও একা হতে চাইছে, কেউ একা থাকতে দেবে না।

একদিন টিকলু ছিল। ফোন না আসার যন্ত্রণা, তার ওপর টিকলুর সামনে আরেক লজ্জা। ও হয়তো ভাববে, রুণু ওকে ছেঁটে দিয়েছে, ও নিজেই শুধু জ্বলে মরছে রুণুর জন্যে। টিকলু ভাববে, অরুণ একটা পাগল, রুণুর কাছে অরুণের কানাকড়িও দাম নেই।

মাঝে মাঝেই অরুণের ইচ্ছে হয়েছে ও নিজেই ফোন করবে। বলবে। সব কথা বুঝিয়ে বললে কি আর···একবারটি শুধু দেখা করতে চায় ও। একবার।

শেষ অবধি নিজেই ডায়াল করলো অরুণ। রুণুর গলা চিনতে পেরেই অরুণের মুখ উজ্জ্বল হলো, পরক্ষণেই পোড়া কাগজের মত কালো। অরুণের গলা চিনতে পেরেই রিসিভার নামিয়ে দিলো রুণু।

—কি রে, কি হলো? অরুণের মুখ দেখে টিকলু জিজ্ঞেস করলো।

—কেটে গেল।

আর কিছু বলতে পারে নি অরুণ। ওর সমস্ত মুখ তখন লজ্জায় আত্মহত্যার মত বিবর্ণ।

আরেক দিন বাসে যেতে যেতে হঠাৎ দোতলার সীট থেকে নীচে রাস্তায় রুণুকে দেখতে পেলো অরুণ। কলেজ স্ট্রীট থেকে ইউনিভার্সিটির পাশের গলি-রাস্তাটায়। প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট না কি যেন—ঢুকছে রুণু। সঙ্গে কে একটি চটপটে চেহারার ছোকরা। অয়ন বোধ হয়। কিংবা অন্য কেউ।

হুড়মুড় করে বাস থেকে নেমে পড়লো অরুণ। বিভ্রান্তের মত ও তাকিয়ে রইলো, দেখলো দিব্যি হাসাহাসি করতে করতে ওরা হেঁটে চলেছে। একবার বুঝি ছেলেটি রুণুর পিঠে হাত দিয়ে ফুটপাথের দিকে সরিয়ে দিলো।

অরুণ কাগজে পড়েছে, ওর মনে হলো ঠিক তেমনি করে ওর সমস্ত শরীরে পেট্রোল ঢেলে কেউ একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিলো, এমনি জ্বালা।

উদ্‌ভ্রান্তের মত অরুণ ওদের পিছনে পিছনে হেঁটে চললো, ঈষৎ দূরত্ব রেখে। চোখ ঠেলে জল আসা কান্নায় ও প্রার্থনা করলে, রুণু, তোমাকে আমি সমগ্রভাবে চাই না। আমাকে ঈর্ষা নিয়ে, টুকরো টুকরো সুখ নিয়ে, তোমার ভালবাসার একটুখানি অংশ নিয়ে আমাকে বাঁচতে দাও। আমি অয়নকে সহ্য করবো, দিব্যকে সহ্য করবো, সহ্য করতে করতে জ্বলবো আর জ্বলবো, তুমি আমাকে একটু সহ্য করো।

অরুণ কি এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াবে, ডাকবে, কথা বলবে!

হঠাৎ রুণু তাকালো। অরুণকে দেখলো। কয়েক পা হেঁটে আবার ফিরে তাকালো, আর সে চোখে অরুণ দেখলো শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা। অরুণ যেন একটা ভয়ঙ্কর দস্যু, একটা বীভৎসতা, এমনি ভয়ের

ছাপ ফুটে উঠলো রুণুর চোখেমুখে। ফিসফিস করে পাশের ছেলেটিকে কি যেন বললো। সেও ফিরে তাকালো, প্রতিবাদের চেহারা নিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো।

অরুণ, তুই খুব ন্যাকি!

তাড়াতাড়ি বাঁ দিকেই ইউনিভার্সিটির গেট দেখতে পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো অরুণ। একরাশ লজ্জার মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। ওর দু' চোখ তখন জলে ভরে গেছে। বেদনায়, অপমানে। একটা তক্ষক তখন ওর ফুসফুস পাঁজর হৃৎপিণ্ড কণ্ঠনালী সব কুরুর কুরুর করে চিবিয়ে খাচ্ছে।

রুণুকে, এই রুণুকে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হলো অরুণের। অরুণও রুণুর কাছে বোধ হয় অচেনা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, আমরা গাছ। কিংবা গাছও নই, আগাছা। কথা বলতে পারি না, যা বলতে চাই বলতে পারি না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। বনের মত, ঝোপের মত। এক হতে পারি না। আমরা কাছাকাছি থেকেও পরস্পরের অচেনা। কেউ কাউকে বুঝি না। লোকে বলে, সমাজ সংসার প্রেম বিবাহ। সব মিথ্যে। আমরা সব সময়েই একা, প্রতিটি মুহূর্ত।

মানুষ সব সময়ে একা, মানুষ শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

সেদিনের কথা মনে পড়তেই দেয়ালে টাঙানো মা'র ছবিটার দিকে তাকালো অরুণ। মা, আমার বুকের ওপর তুমি একটু হাত বুলিয়ে দাও। মা'র ছবিটায় আজ কে একটা মালা পরিয়ে দিয়েছে। হয়তো মিলু। রুণুর মামীমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন রুণুকে অরুণ জুঁইফুলের বেশ বড় একটা মালা দিয়েছিল। বাড়ির গলিতে ঢোকার আগে রুণু খোঁপা থেকে মালাটা খুলে হাতে রেখেছিল। তারপর কখন সেটা হাত থেকে টুপ করে ফেলে দিয়েছিল। নোংরা ড্রেনের মধ্যে।

জুঁইফুলের সেই মিষ্টি গন্ধটা যেন এতদিন বাদে আবার নাকে এসে লাগলো।

—দাদা, কে তোকে ডাকছে। একটা মেয়ে। মিলু ছুটতে ছুটতে এলো। হাসতে হাসতে বললে, তোর কত মেয়ে বন্ধু রে দাদা!

অরুণ চমকে উঠলো। কে আর হবে, ঊর্মি বোধ হয়। ওর তো বিয়ে আর দিন কয়েক পরেই। কিংবা নন্দিনী। ওকে অরুণ বহুকাল দেখে নি। অরুণের হঠাৎ ইচ্ছে হলো, যেন নন্দিনী, নন্দিনীই হয়। নন্দিনীর মধ্যে কোথাও যেন রুণু মিশে আছে।

অরুণ দরজার কাছে এসে এক মুহূর্তেই ফুল-ফোটানো তুবড়ি হয়ে গেল। অন্ধকারে হাজার হাজার রুপোলী তারার মত।

দিদি নেই, বসবার ঘরখানা খালি।

রুণু দাঁড়িয়ে ছিল।

রুণুর দু'চোখে তখন পোখরাজ জ্বলছে। অরুণের চোখ তা দেখতে পেলো না। রুণুর মুখ তখন ওর কাছে ঝাপসা হয়ে গেছে।

—পারলাম না, আমি পারলাম না। বুকফাটা আর্তনাদের মত রুণুর মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

অরুণ ধীরে ধীরে বললে, বলবো, সব বলবো।

রুণু হাসলো, গভীর কষ্টের হাসি। বললে, সব জানি, আমি সব জানি। তবু, সব জেনেও···ধরা গলায় বলে উঠলো, পারলাম না, আমি পারলাম না।

কথা হারিয়ে গেল অরুণের। ও কোন কিছুই বলতে পারলো না। তুমি কিছুই জানো না, রুণু, আমরা কেউ কিছুই জানি না; অরুণের বলতে ইচ্ছে হলো, আমরা কেউ কাউকে চিনি না, জানি না। আমরা শুধু পাশাপাশি থাকি, কথা বলতে পারি না।

বনের মধ্যে দুটি নিঃসঙ্গ গাছের মত ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। পাশাপাশি, কাছাকাছি। কিন্তু কেউ কোন কথা বলবে না, বলতে পারবে না। কেউ কারো ভাষা বুঝবে না। ওরা শুধু

নিজের সঙ্গে কথা বলবে। সুখে দুঃখে ব্যথায় বঞ্চনায়। কখনো হয়তো একজনের শিকড় আরেকজনের শিকড় ছোঁবে।

বনের মধ্যে অনেক গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ, নিঃশব্দ। ঝড় উঠলে মনে হয় তারা কথা বলছে। শুধু কথা। 'কোজি মুকে'র হট্টগোলের মত শুধুই আওয়াজ। কান পেতে শুনলে একটা কথাও বোঝা যায় না।

—